ডাইনী বিরোধী আন্দোলন

লক্ষ্মীন্দ্রকুমার সরকার

পাইওনীয়ার পাবলিশার্স
২০৬, বিধান সরণি, রুম নং-৯১ • কলিকাতা-৭০০০০৬

প্রথম প্রকাশ : ১৯৬৫

প্রচ্ছদ : দেবব্রত ঘোষ

প্রচ্ছদ প্রিন্টিং ও প্রসেসিং

PROCESSICA

৪৮৮ রবীন্দ্র সরণী, কলিকাতা-৫

ভেতরের ছবি : লক্ষ্মীন্দ্র কুমার সরকার, অশোক চন্দ্র

প্রকাশক : মৃত্যুঞ্জয় ভট্টাচার্য
পাইওনীয়ার পাবলিশার্স
২ ৬ বিধান সরণি, রুম নং-১৭
কলিকাতা-৭০০০০৬
(শ্রীমানী মার্কেটের উপরে)

মুদ্রণ : ডি. বি প্রেস
৮২ কেশবচন্দ্র সেন স্ট্রীট
কলিকাতা-৯

উৎসর্গ

সমাজ সচেতক ও বিদ্রোহী নেতা

শিক্ষক ও কবি সারদাপ্রসাদ কিসকুকে—

আমার শ্রদ্ধার্ঘ

চিত্র সূচী

উনিশ—	বিচার সভা। সারদাবাবুর পুকুর পাড়ে।
কুড়ি—	ডাইনীবিরোধী আন্দোলনকারীদের নেতা ও সম্পাদক—মহাদেব হাঁসদা।
একুশ—	সুধীর ও মিলন টুডু।
বাইশ—	সুধীর ও স্ত্রী নীলমণি টুডু।
তেইশ—	মহেশ্বর বেশরা ও তাঁর স্ত্রী।
চব্বিশ—	বালিশ্বর সরেন।
পঁচিশ—	মহেশ্বর বেশরা।
ছাব্বিশ—	মনোহর কিসকু।
সাতাশ—	কলেন্দ্র মাণ্ডি ও রূপচাঁদ হাঁসদা।
আটাশ—	মহল গিরা ডাক দিচ্ছেন বিরোধী নেতারা।
উনত্রিশ—	ঠিক এইভাবে নদী পেরিয়ে সংবাদ সংগ্রহ করতে যেতে হয়।
ত্রিশ—	জামতোড়িয়া ফাঁড়ি (ফাঁড়ি না গুদাম ঘর)।
একত্রিশ—	বীণু সখা ডাইনী ধরছে। কালনাবেড়ার মোড়ে
বত্রিশ—	লিলু সখা সাকরেদদের নিয়ে বসে।
তেত্রিশ—	লিলু সখা। (বর্তমানে মারা গেছেন)
চৌত্রিশ—	বাঁকুড়ার আর এক ওঝা ডাইনী ধরছে।
পঁয়ত্রিশ—	নীলমণি টুডু—বরদহি (একে ডাইনী করা হয়েছিল)।
ছত্রিশ—	নীলমণি কিসকু, ঢাকিবাইদ (একে ডাইনী করা হয়েছিল)।
সাঁইত্রিশ—	চুনুমণি হাঁসদা—দাঁড়িকাডোবা (ত্রিশবছর আগে একে ডাইনী করা হয়েছিল)।
আটত্রিশ—	লম্বোদর ও তাঁর স্ত্রী—টিপ্‌ডি (এদেরও ডাইনি করা হয়েছিল।
উনচল্লিশ—	রবি মুর্মু ও রসমণি মুর্মু, কুলাম (এদেরও ডাইনী করা হয়েছিল)।
চল্লিশ—	লালমোহন মাণ্ডি ও স্ত্রী চুনুমণি। মাণ্ডি বড়কদম (এদেরও ডাইনী করা হয়েছিল)।
একচল্লিশ—	সারদাপ্রসাদ কিসকুকে নিয়ে 'আজকাল' পত্রিকার
বিয়াল্লিশ—	রবিবাসরে একটা পাতা করা হয়। এটা সেই পাতা।

তেতাল্লিশ— সাধুরাম চাঁদ মুর্মুর জন্মজয়ন্তী অনুষ্ঠান, জামতোড়িয়া হাট মাঠে। এদের মধ্যে বাঁদিক থেকে চতুর্থজন জাগরন সরেন। এপ্রিল মাসের ১৬ তারিখে ছবিটি তুলি, ঠিক এক মাস পরে ২০মে ১৯৯৬ জাগরনবাবুকে মেরে ফেলা হয়।

চুয়াল্লিশ— কোর্ট থেকে ছাড়া পাওয়ার পর আদালত প্রাঙ্গণে উকিল অরূপ ভট্টাচার্য এবং সহকারী উকিল নন্দলাল সিংহনিয়ার সঙ্গে সুধীর ও মিলন এবং যারা ওদের দুজনকে গ্রামে নিয়ে যেতে এসেছিল তাঁরা।

পঁয়তাল্লিশ— পশ্চিমবঙ্গ সরকার কর্তৃক মুদ্রিত ও প্রচারিত ডাইনীর উপর পোস্টার।

ছচল্লিশ— সুধীরের মা—ডাইনী বিরোধী আন্দোলনের আর এক যোদ্ধানী।

সাতচল্লিশ— সাঁওতাল পুরুষদের সামাজিক দৈনন্দিন জীবন।

আটচল্লিশ— সাঁওতাল মেয়েদের দৈনন্দিন জীবন।

উনপঞ্চাশ— শিকার উৎসবে শিকার খরগোশ।

পঞ্চাশ— শিকার থেকে ফেরার পর শিকারীদের অভ্যর্থনা।

একান্ন হরিণ শিকার করে ফিরছে শিকারীরা।







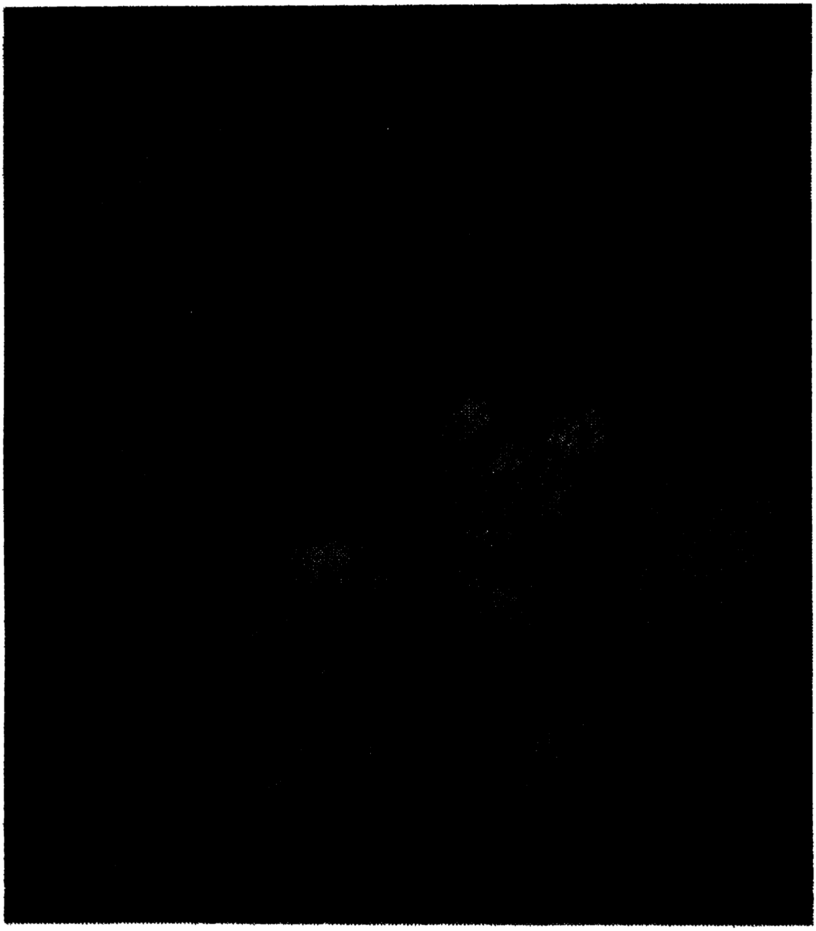






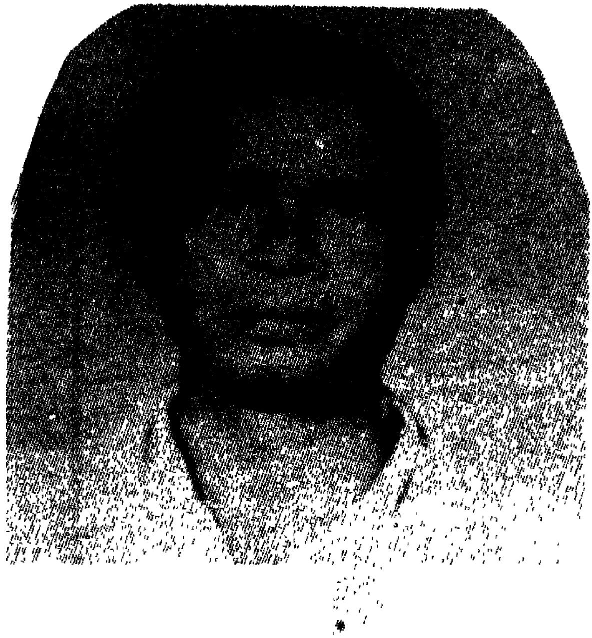








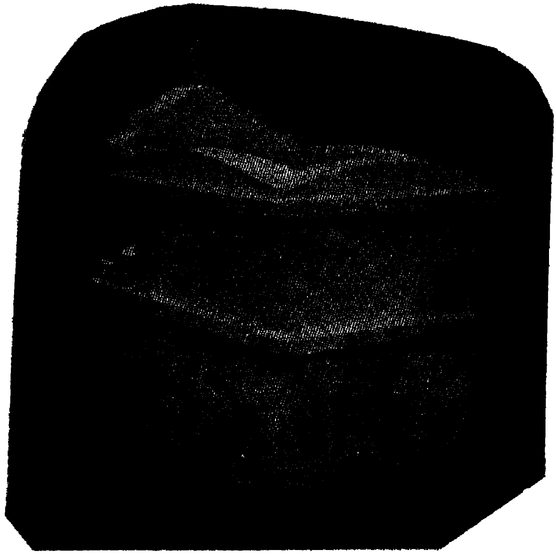










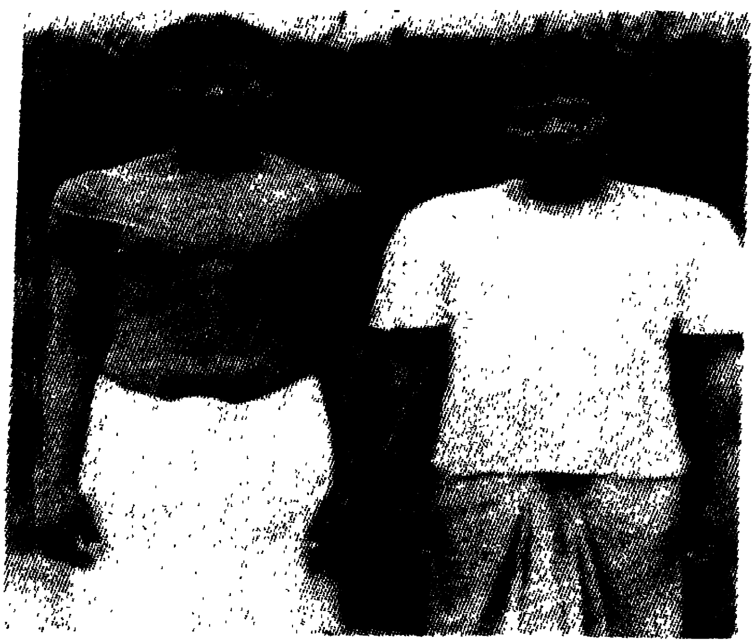






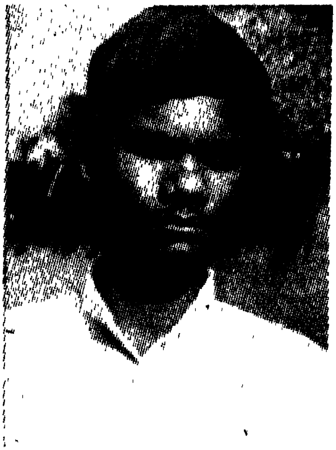


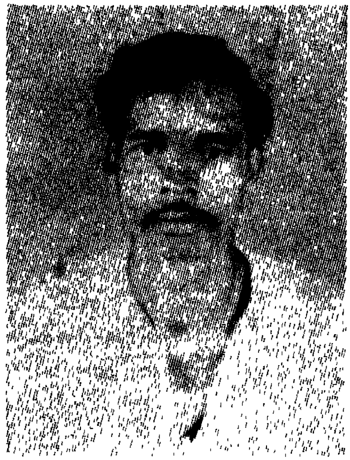




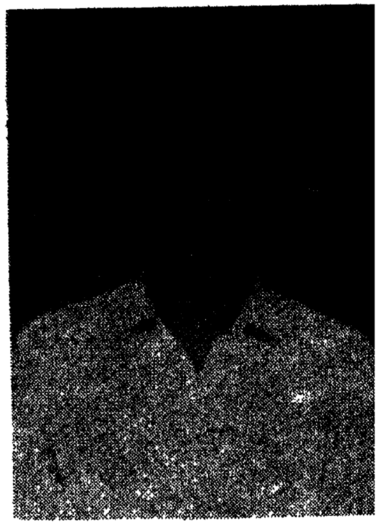










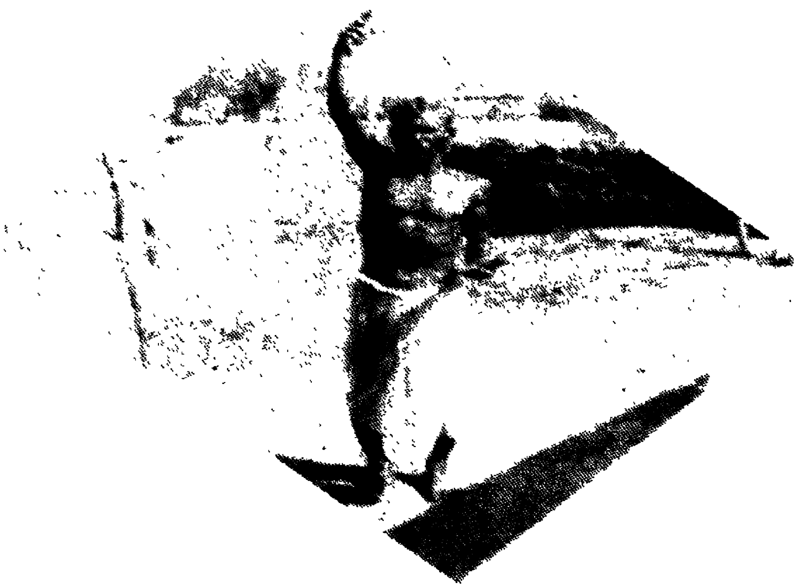
















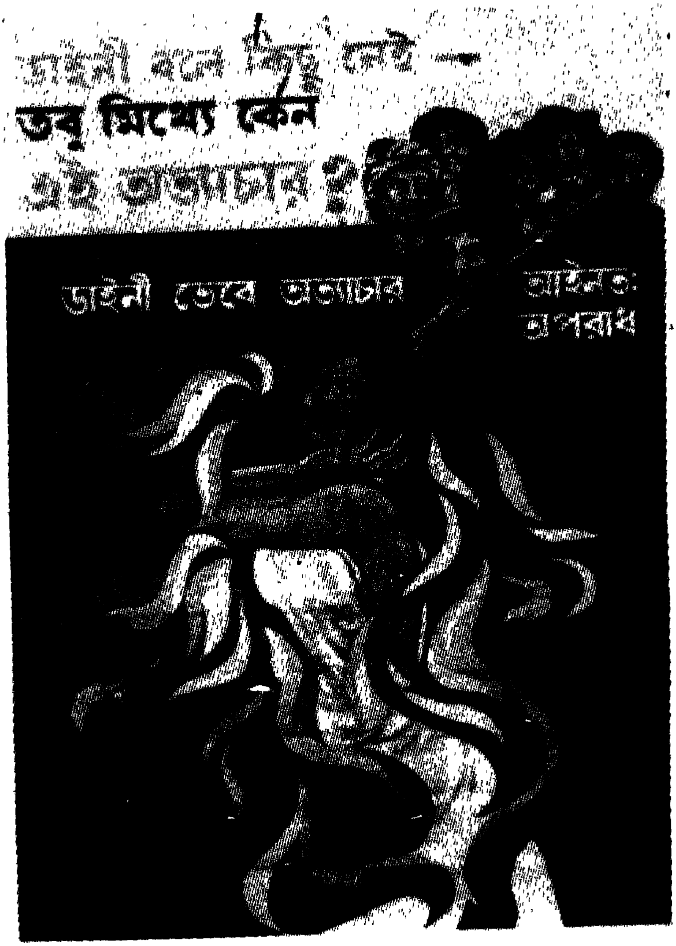


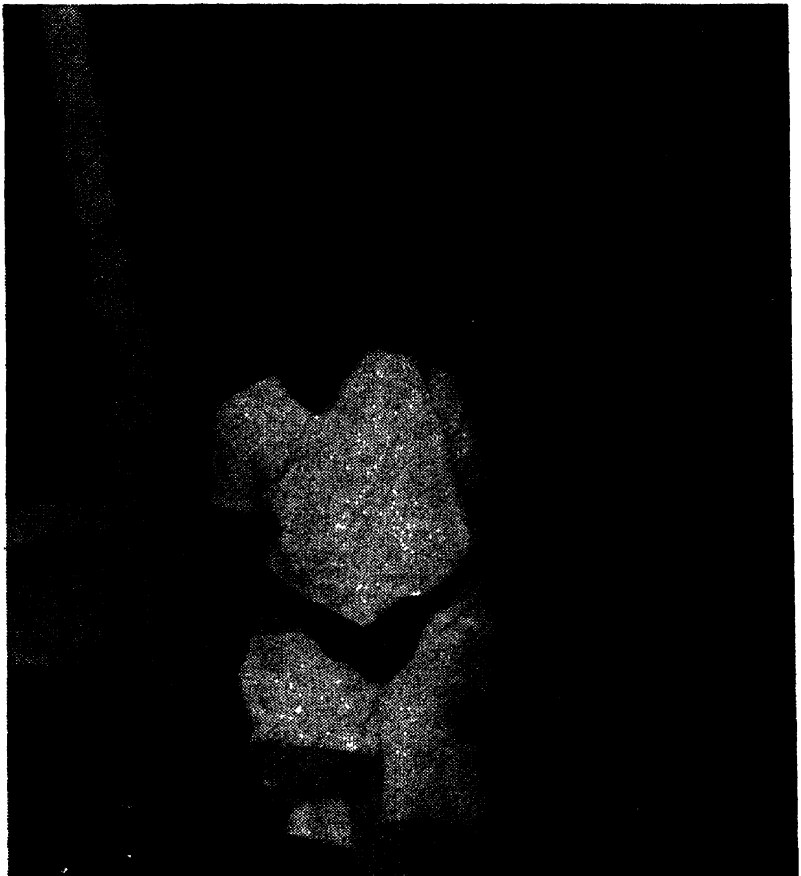


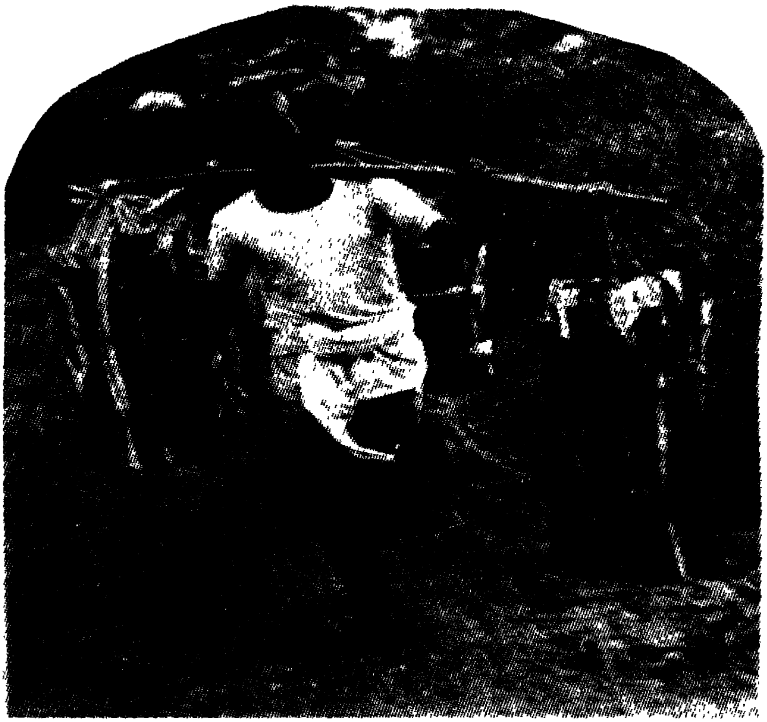







ডাইনী বলে কিছু নেই —
তবু মিথ্যে কেন
এই অত্যাচার?
ডাইনী ডেকে অত্যাচার
আইনত:
অপরাধ













ডাইনি বিরোধী আন্দোলন

সংখ্যাতত্ত্বে ভারতের আদিবাসী কারা?

১৯৫০ সালে সংবিধানের ৩৪২ ধারার পরিপ্রেক্ষিতে রাষ্ট্রপতি যে তালিকা প্রচার করেন (Scheduled Tribes Order, 1950) তাতে পশ্চিমবঙ্গে মাত্র ৭ টি আদিবাসী গোষ্ঠীর নাম ছিল। এরা হলেন সাঁওতাল, মুণ্ডা, ওঁরাও, লেপচা, ভুটিয়া, মেচ এবং ম্রু। 'ব্যাকওয়ার্ড ক্লাসেস কমিশনের' সুপারিশ অনুযায়ী 'দি সিডিউল্ড কাস্ট অ্যাণ্ড সিডিউল্ড ট্রাইবস্ অর্ডার (অ্যামেণ্ডমেণ্ট) অ্যাক্ট ১৯৫৬' প্রবর্তন করা হয়। এই আইনে পূর্বেকার ৭টি আদিবাসী গোষ্ঠী ছাড়া আরও ১২টি আদিবাসী গোষ্ঠীর নাম তফশিলভুক্ত করা হয়। এঁরা হলেন হো, কোড়া, লোধা, খেরিয়া বা খাড়িয়া, মাল পাহাড়িয়া, ভূমিজ, চাকমা, গারো, হাজং, মগ, মাহালি, নাগেসিয়া এবং রাভা। ১৯৫৬ সালে ভাষাভিত্তিক রাজ্য পুনর্গঠনের পর 'সিডিউল্ড ট্রাইবস্ (মডিফিকেশন) অর্ডার' প্রবর্তন করা হয়। এতে আরও ২২টি আদিবাসী তফশিলভুক্ত করা হয়। বিহারের যে সব অঞ্চল পশ্চিমবঙ্গে অন্তর্ভুক্ত হয়, সে সব অঞ্চলের আদিবাসীদেরও এই অর্ডার অনুযায়ী তালিকাভুক্ত করা হয়। ফলে পশ্চিমবঙ্গে আদিবাসী তালিকায় ৪১টি আদিবাসী গোষ্ঠী স্থান পায়। সবশেষে ১৯৫৬ সালের 'দি সিডিউল্ড কাস্টস্ অ্যাণ্ড সিডিউল্ড ট্রাইবস্ অর্ডার (অ্যামেণ্ডমেণ্ট) অ্যাক্ট' অনুযায়ী পশ্চিমবঙ্গে ৩৮টি আদিবাসী গোষ্ঠীকে তালিকাভুক্ত করা হয়। এঁরা হলেন সাঁওতাল (১৩, ৭৬, ৯৮০), ওঁড়াও (২, ৯১, ১৭৩,) মুণ্ডা (১, ৯৮, ৭০১,) ভূমিজ (১,৬৯,৪২৯,) কোড়া (৯৩, ৫৮৬,) মাহালী (৪৭, ২৪৭,) লোধা, খেড়িয়া (৫৫, ০৬), ভুটিয়া (৩৩, ৯১২), মাল পাহাড়িয়া (৩১, ০১৮), লেপচা (১৪, ৫৮৮), মেচ (১০,৮৬২), শবর (৪,৯৮৬), বেদিয়া (৩,৩৩৯), মগ (৩,২৫৭), চাকমা (২,২২৭), গারো (২,৬২৩), নাগেসিয়া (২,৫১৯), রাভা (২,৪৬৬), লোহাড়া (২,৩৮৪), চিকবারাইক (১,৬২৭), হো (১,০৩৬), মাহালী (৯৯৮), ম্রু (৮৩৯), কিষান (৭.৬), অসুর (৬১১), গোরাইত (৪৩১), হাজং (২৪৪) চেরো (১৭৫), সওরিয়া পাহাড়িয়া (১৫৮), থারওয়ার (১৩৪), পার হাইয়া (১০৮), করমালী (৯৪), খোণ্ড (৪৬), বিরজিয়া (১৬), [বাইগা, বীরহোড়, খোণ্ড]।

উপরোক্ত সম্প্রদায়গুলির মধ্যে মাত্র ৯ টি সম্প্রদায়ই আদিবাসী জনসংখ্যার ৯০.৫০ শতাংশ। সাঁওতাল (৫৪.৩৫ শতাংশ), ওঁড়াও (১১.৫৯), মুণ্ডা (৭.৮৫), ভূমিজ

(৬.৬৯), কোড়া (৫.৬১), মাহালী (১.৮১), লোধা (১.৮), ভুমিজ (২.৩৩), মালপাহাড়িয়া (১.২২ শতাংশ)।

পশ্চিমবঙ্গের ১৬টি জেলার মধ্যে নিম্নলিখিত ৬টি জেলায় মোট আদিবাসী জনসংখ্যার প্রায় ৩ শতাংশ বসবাস করেন :—

মেদিনীপুর (৪,৪২,৯৬৩=১৭.৪৯ শতাংশ), জলপাইগুড়ি (৪,২৮,৫৯১= ১৬.৯২ শতাংশ), পুরুলিয়া (৩, ১৩ ৭৯৩=১২.৩৯ শতাংশ), বর্ধমান (২, ০৮, ০৫ =৯.০১ শতাংশ), পশ্চিম দিনাজপুর (২, ২১, ৩১৭=৮.৭৪ শতাংশ) এবং বাঁকুড়া (২, ০০, ০৩৫=৮.২৪ শতাংশ)।

বাকি ১০ টি জেলার আদিবাসী জনসংখ্যা হল ২৪ পরগনা (উঃ ও দঃ) (১, ৩০, ১৯৭=৫.৪২ শতাংশ) মালদহ (১, ৩০, ৭১৫=৫.১৬ শতাংশ) বীরভূম (১, ২৫, ২৫০=৪.৯৪ শতাংশ) দার্জিলিং (১,০৮,৫৮৬=৪.২৯ শতাংশ) হুগলী (১, ০০, ০৮৪=৩.৯৫ শতাংশ), মুর্শিদাবাদ (৩৮,৯৪৭=১.৫৪ শতাংশ), নদীয়া (৩১, ৭৯৯=১.২৬ শতাংশ, কোচবিহার (১০, ৬১১=০.৪২ শতাংশ), হাওড়া (৩. ৩৬৪= ০.১৩ শতাংশ) এবং কলিকাতা (২, ৬০৮=০.০১ শতাংশ)।

(পশ্চিমবঙ্গের আদিবাসী জনজীবন—ডঃ অমলকুমার দাস, স্বপন কুমার দে; ধনধান্যে-১৬ জানুঃ - ১৫ ফেব্রঃ, ১৯৮০)।

সাঁওতাল জাতির উৎপত্তি ও দেশান্তর গমন

সংখ্যাতত্ত্ব এবং জনগোষ্ঠীর দিক থেকে বিচার করলে ভারতের মোট আদিবাসী জনসংখ্যার প্রায় ৮০ ভাগই সাঁওতাল সম্প্রদায়। এই সম্প্রদায় যেমন সংখ্যাগরিষ্ঠ, তেমনি সুবৃহৎ জনজাতি। এরা যেমন শিক্ষিত, তেমনি এদের সংগঠন শক্তিও প্রবল। পশ্চিমবঙ্গের ১৭টা জেলাতেই এদের সন্ধান পাওয়া যায়। ফলে এলাকার ও পরিবেশের স্বতন্ত্রতার জন্য এদের মধ্যেও স্বতন্ত্রভাব গড়ে উঠেছে। অঞ্চলভেদে এদের সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যেরও বৈচিত্র্য ঘটেছে। আঞ্চলিক সাংস্কৃতিক বিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে এরাও ক্রমশ মিশে যাচ্ছে। সাঁওতালরা নিজেদের 'হড়' বলে চিহ্নিত করে, পরিচয়ও দেয়। 'হড়' কথাটির মানে হল মানুষ। স্যার জি. এ. গ্রিয়ারসন সাহেব তাঁর 'Linguistic Survey of India' বইতে সাঁওতাল, মুণ্ডা, হো, ভূমিজ, কোড়া প্রভৃতি গোষ্ঠীর ভাষাকে খেরওয়াড়ি ভাষা বলে অভিহিত করেছেন। তাঁর মতে সাঁওতালী, মুণ্ডারি, ভূমিজ, কোড়া, হো, টুরি, আসুরি এবং কোরওয়া একই ভাষার বিভিন্ন রূপ। সাঁওতালী কিংবদন্তী অনুযায়ী এই সব আদিবাসীদের একই উৎস এবং এক সময় এদের সকলকেই 'খেরওয়াড়' বা খারওয়াড় বলা হত।[১]

'সাঁন্তাল', 'সাঁওতাল' ওরফে 'সাঁওতার' হ'ল এক বৃহৎ দ্রাবীড়িয় উপজাতি গোষ্ঠী, ভাষাগত কারণে যারা 'কোলারিয়ান' শ্রেণীভুক্ত। বাংলার পশ্চিমাঞ্চল, ওড়িশার উত্তরাঞ্চল, ভাগলপুর এবং সাঁওতাল পরগনায় এদের দেখতে পাওয়া যায়। প্রখ্যাত জাতিতত্ত্ববিদ্ 'Mr. Skrefsrud'-এর মতে 'সাঁওতাল' হ'ল 'সাঁওতার'-এর অপভ্রংশ নাম। মেদিনীপুরের 'সাঁওন্ত' নামক স্থানে বেশ কয়েক পুরুষ ধরে বসবাস করার সুবাদে সাঁওতালরা বহুপূর্বেই ঐ অপভ্রংশ নামটি ধারণ করে। কিন্তু সাঁওন্তে বসবাস করারও আগে তাদের বলা হত 'খাড়োয়ার' যার ব্যুৎপত্তি স্থল হল 'খাড়'। এই 'খাড়' কথাটি আবার একজন মানুষের নাম 'হড়'-এর ইতরবিশেষ মাত্র।[২]

এক সময় কোন সাঁওতালকে যদি জিজ্ঞাসা করা হত যে সে কোন জাতি গোষ্ঠীর লোক, তার উত্তর হত 'মাঝি'। এরপরেও যদি জানতে চাওয়া হয়, তখন সে উত্তর দেবে সাঁওতাল মাঝি। কিন্তু বর্তমান প্রজন্ম এসব কিছুই বলতে পারবে না। অবাক হয়ে তাকিয়ে থাকবে। ভাষাচার্য সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় কিন্তু অন্য কথা বলেন। তিনি বলেন সাঁওতাল শব্দটি এসেছে সম্ভবত সংস্কৃত 'সামন্তপাল' কথা থেকে। সামন্ত-পাল বা সীমান্তরক্ষক। মধ্যযুগে এই 'সামন্তপাল', 'সামন্তআল' এবং পরে 'সাওন্তাল'। এবং শেষে সাঁওতাল-এ এসে দাঁড়িয়েছে?[৩] কেউ কেউ বলেন, 'সাঁওতাল' শব্দটি অ-সাঁওতালদের দেওয়া। কিন্তু এসব বক্তব্যই 'সম্ভবত'র উপরেই থেকে গেছে। জোর দিয়ে কেউ বলতে পারেন নি।

শারীরিক বৈশিষ্টের নিরীখে বিচার করতে গেলে বলতে হয় যে সাঁওতালরা হল শুদ্ধ দ্রাবীড় জাতির এক বিশেষ দৃষ্টান্ত। এদের গায়ের রঙ গভীর কালচিটে বাদামী থেকে পোড়া কয়লার মত অদ্ভুত রকমের কালো কালো। নাকের গঠন হিন্দুদের মত নয়। নাকের অগ্রভাগ চ্যাপ্টা, নিগ্রোদের মত, নাকের শিরদাঁড়া অনুন্নত ও ভগ্ন। মুখ বড়, ঠোঁট পুরু এবং প্রক্ষিপ্ত। কেশ অনিষ্ট কাল এবং কুঞ্চিত।[৪]

সাঁওতালদের 'খেরওয়াড়' বা 'খারওয়াড়' কেন বলা হয়—এ সম্পর্কে একটি প্রচলিত লোকশ্রুতি আছে। প্রাচীনকালে রীতি ছিল যে বিবাহিতা স্ত্রীর মৃত্যু হলে মৃতদেহ আগুনে পোড়ানোর পর তার অস্থি-ভস্মের অর্ধেক স্বামীর গ্রামে সমাহিত করা হত। এবং বাকি অর্ধেক জন্মস্থানে সমাহিত করার জন্য, পিত্রালয়ে মেয়ের বাবা বেঁচে থাকলে তাঁকে অথবা ভাইয়ের হাতে তুলে দেওয়া হত। একবার একটা ঘটনা ঘটে। এক ব্যক্তি তার মৃতা স্ত্রীর অস্থি-ভস্ম তার পিত্রালয়ে দিতে যায়। ঐ দিনই গ্রামে একটি বিবাহ অনুষ্ঠান ছিল। অস্থি-ভস্ম গ্রহন করলেই সমস্ত গ্রাম অপবিত্র হবে এবং বিবাহ অনুষ্ঠান আটকে থাকবে বলে গ্রামের কিছু লোক মেয়ের বাবাকে সেদিন অস্থি-ভস্ম গ্রহণ করতে

নিষেধ করল। মেয়ের বাবা তাদের কথামত অস্থি-ভস্ম না নিয়ে জামাইকে অন্য একদিন আবার আসতে বলল। জামাই এতে অপমানিত বোধ করল এবং মেয়ের বাড়ীর লোকজনের সঙ্গে তার কথা কাটাকাটি শুরু হল। শেষে সে রাগ করে সেখানেই অস্থি-ভস্ম রেখে নিজের গ্রামে ফিরে গেল। মেয়ের বাবা ও ভাইরাও রেগে অস্থি-ভস্মের আধারটা পাশের নদীতে ছুড়ে ফেলে দিল। ব্যাপারটা কিন্তু এইখানেই মিটে গেল না। গ্রামে দুটো দল দেখা দিল। কিছু লোক মেয়ের বাবাকে আর কিছু লোক জামাইকে সমর্থন জানাতে লাগল। একদল বলতে লাগল যে, অস্থি-ভস্ম গ্রহণে বাধ্য করে গ্রামবাসীদের অপমান করার অধিকার জামাইয়ের নেই। অন্যদল বলতে লাগল, অস্থি-ভস্ম গ্রহণ না করে মেয়ের বাবা নীতি বিরুদ্ধ কাজ করেছে। শেষে দুদলের মধ্যে প্রচণ্ড ঝগড়া হয়। সংবাদটা দেশের আদিবাসী রাজা সান্তারের কানে গিয়ে পেঁছল। খেরওয়াল রাজা সান্তা বিরোধ মেটাবার জন্য নদীর ধারে এক বিরাট সভার আয়োজন করে সমস্ত খেরওয়াল গোষ্ঠীকে সেই সভায় ডাকলেন। রাজা সান্তা সেই সভায় বললেন যে, অস্থি-ভস্ম সমাহিত করার অনুষ্ঠান (জাঙতপা) নিয়ে সারা দেশে প্রবল অশান্তি দেখা দিয়াছে, সেজন্য তিনি এটা অবিলম্বে মিটিয়ে ফেলতে চান। সঙ্গে সঙ্গে আরো কয়েকটি সমস্যারও সমাধান করতে চান। এক, বিবাহের পনের টাকা খুসিমত নেওয়া হচ্ছে বলে অনেকেই অসন্তোষ প্রকাশ করছে। এমন কি এই পনের টাকা নিয়ে প্রায় ঝগড়াঝাঁটি হচ্ছে। দুই, জাঙতপা অনুষ্ঠানে কোন আত্মীয় যদি কোন কারণ-বশত উপস্থিত হতে না পারে, তাহলে তার প্রতি নানারকম অশালীন মন্তব্য করা হয়। এ নিয়েও প্রায় কলহ বিবাদ দেখা দিচ্ছে। তাই তিনি পুরাতন রীতি-নীতির বদলে নতুন কয়েকটি নিয়ম সমাজে চালু করতে চান। সেগুলি হল বিবাহের পনের টাকা নির্দিষ্ট করা হবে। বিবাহিতা স্ত্রীর মৃত্যুর পর সৎকার একমাত্র স্বামীর পরিবারই করবে। আর জাঙতপা অনুষ্ঠান বলে কোন অনুষ্ঠান থাকবে না। অস্থি-ভস্ম দামোদরে বিসর্জন দেওয়া হবে। কিন্তু অনেকেই পুরাতন প্রথা তুলে দিয়ে নতুন প্রথা চালু করতে রাজী হল না। রাজা তখন ভোট নিতে চাইলেন। এদিকে দুপুর পেরিয়ে গেছে, প্রত্যেকের বেশ খিদে পেয়েছে। এ অবস্থায় ভোট নেওয়া সম্ভব নয়। রাজা সান্তা বললেন, যাঁরা তাঁর নতুন বিধান গ্রহণ করতে চায় তারা শালপাতায় (সারজম সাকাম) এবং অন্যরা শিয়াড় পাতায় (লাড় সাকাম) খাবার খাবে। খেরওয়ালরা দুদলে বিভক্ত হয়ে খাওয়া দাওয়া শুরু করল। দেখা গেল দুদলই সমান। সুতরাং নতুন বিধান জোর করে চাপানো গেল না। কিন্তু খেরওয়াল সমাজ দুভাগে বিভক্ত হয়ে গেল। যারা সান্তার নতুন বিধান মানতে লাগল তারা সান্তাড় বা সান্তাল নামে পরিচিত হল। অন্যরা

লাড় পাতায় খাবার খেয়েছিল বলে 'লাড়কা' আখ্যা পেল। এই লাড়কাদেরই 'হো' বলা হয়। পরবর্তীকালে লাড়কাদের সঙ্গে সাঁওতালদের বহুদিন যুদ্ধ হয়েছিল। ৫

সৃষ্টির পৌরাণিক কাহিনী

সাঁওতাল সমাজে সৃষ্টি নিয়ে একটি পৌরাণিক কাহিনী প্রচলিত বহুভাবে। আদিতে পৃথিবী জলমগ্ন ছিল। ফলে গোটা পৃথিবীটা ছিল অন্ধকারে আচ্ছন্ন। বিশাল জলরাশির মধ্যে 'ঠাকুর জীউ' বিরাজ করতেন বলে সাঁওতালদের বিশ্বাস। 'জীউ'ই সৃষ্টিকর্তা, জগদীশ্বর। তিনিই প্রথম অনন্ত জলরাশির মধ্যে রাঘব বোয়াড় হাকো (বোয়াল মাছ), হর-অ (কূর্ম), খিরি কাটকম (পাথর কাঁকড়া), ল্যাণ্ডেং (কেঁচো), সলে, ইচাক্‌ হাকো (চিংড়ি মাছ), তায়ান (কুম্ভীর), মাঙ্গাড় (মকর) প্রভৃতি জলচর প্রাণী সৃষ্টি করলেন। এসব প্রাণী সৃষ্টি করার পর মানুষ সৃষ্টি করার কথা তিনি ভাবলেন। তিনি মাটি দিয়ে দুটি মূর্তি তৈরী করলেন। মূর্তি গড়ার কাজ প্রায় শেষ ঠিক সেই সময় এক দিব্য ঘোড়া (সিঞ সাদাম) এসে মূর্তি দুটিকে চূর্ণ বিচূর্ণ করে দিয়ে চলে যায়। এতে ঠাকুর জীউ খুবই দুঃখ পেলেন। ঠিক করলেন পাখি তৈরী করবেন। নিজের বুকের অংশ দিয়ে দুটি পাখি (একটি পুরুষ ও একটি স্ত্রী) তৈরী করলেন। পাখি দুটির নাম দিলেন হাঁস ও হাঁসালি। ফুঁ দিয়ে জীউ ওদের প্রাণ দিলেন। মনের আনন্দে প্রাণ পেয়ে পাখি দুটি উড়ে বেড়াতে লাগল। কিন্তু কোথাও বসার জায়গা না পেয়ে তারা ঠাকুরের হাতের উপর এসে বসল। সে সময় স্বর্গপুরী থেকে দিব্যঘোড়া (সিঞ সাদাম) আবার জল খেতে পৃথিবীতে নেমে এল। জল খেতে খেতে তার মুখ দিয়ে ফেনা বের হল এবং সেই ফেনা সমুদ্রের জলে ভাসতে লাগল। জীউ পাখিদুটিকে সেই ফেনার উপর আশ্রয় নিতে বললেন। পাখি দুটি ফেনার উপর আশ্রয় নিল এবং সমুদ্রে ভেসে বেড়াতে লাগল। কিন্তু খাবে কি? খাবার জোটে না। পাখি দুটি আবার স্মরণাপন্ন হল। ঠাকুর তার সৃষ্ঠ জীবগুলির মধ্যে বোয়াল মাছ, কুমীর, চিংড়ি মাছ ও কাঁকড় কে জলমগ্ন পৃথিবী থেকে মাটি তুলবার আদেশ দিলেন কিন্তু কেউ মাটি তুলতে পারল না। মাটি তুলবার সময়ে সমস্ত মাটি গলে গেল। শেষে ঠাকুর কেঁচোকে মাটি তুলবার আদেশ দিলেন। কেঁচো বলল যে, যদি কচ্ছপ জলের উপর ভেসে থাকে, তবে সে জলের নীচ থেকে মাটি তুলতে পারবে। কেঁচোর পরামর্শ অনুযায়ী ঠাকুর কচ্ছপকে বলল। কেঁচো কচ্ছপের পিঠের উপর লেজ রাখল এবং জলের নীচে গিয়ে মাটি খেতে লাগল এবং সেই মাটি কচ্ছপের পিঠে বের করে দিতে লাগল। এভাবে মাটি তুলতে পৃথিবী ভরে গেল। তারপর সে থামল। ঠাকুর তখন মই দিয়ে মাটি সমান করে দিলেন। সমান

করতে করতে যে অংশ উচু হয়ে থাকল, তা পাহাড় হল। ঠাকুর এবার মাটিতে ঘাসের বীজ বুনলেন ও কদর শাল, মহুয়া প্রভৃতি নানারকমের গাছপালা সৃষ্টি করলেন। পাখি তুটি ঘাসের বনে বাসা বাঁধাল, ডিম পাড়ল। নির্দিষ্ট সময়ে সেই ডিম থেকে তুটি মানব শিশু জন্মলাভ করল। একটি ছেলে একটি মেয়ে হল।

সাঁওতালদের মতে এরাই পিলচু হাড়াম ও পিলুচি বুড়হি, অর্থাৎ মানুষের আদি পিতা ও আদি মাতা। ৬

সাঁওতাল সমাজের আদি পিতা-মাতা পিলচু হাড়াম ও পিলচু বুড়হির মিলনে ৭টি সন্তান জন্মায়। এদের সাতটি গোত্রে ভাগ করা হয়। যেমন, কিস্কু, হাঁসদা, মুর্মু হেমব্রম, মাণ্ডি, সরেন ও টুডু। পরবর্তীকালে আরও ৫টি গোত্রের সৃষ্টি করা হল। এরা হল বাসকে, বেশরা, চঁড়ে, পাঁওরিয়া ও বেদিয়া। এই বারটি গোত্রের মধ্যে ১১টির অস্তিত্ব এখন আছে। বাকি ১টি অর্থাৎ বেদিয়া গোষ্ঠীর লোকেরা অন্য সম্প্রদায়ের সঙ্গে মিশে গেছে। না হয় একেবারে বিলুপ্ত হয়ে গেছে। যার কোন হদিস আজও কেউ দিতে পারে নি।

সাঁওতালদের সৃষ্টিতত্ত্ব ও সাঁওতালদের সাংস্কৃতিক ক্রমবিবর্তনের ইতিহাস 'কারাম বিন্তী' বা 'জমসিম বিন্তী' ও 'ছাটিয়রৈ বিন্তী' থেকে পাওয়া যায়। জানা যায় যে, কোল বা সাঁওতাল জাতি ভারতের উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত থেকে ভারতে প্রবেশ করেছিল এবং তিব্বত আসাম হয়ে বিহার ও বাংলাদেশে প্রবেশ করেছিল। তাদের একটি গানে এই কথা উল্লেখ আছে।

হিহিড়ি-পিপিড়ের বোন জানামলেন,
খজ কামানরেবোন খজলেন
হারাতা বুরুরেবোন হারালেন
সাসাঙবে ভারোবোন জাতে না গো।

এর মানে হল—(কোল বা হড়জাতি) হিহিড়ি-পিপিড়িতে জন্মেছি, খোজ কামানে আমরা মিলিত হয়েছিলাম, হারাতা পর্বতে আমরা লালিত-পালিত হয়েছি এবং সাসাঙ-বেড়তে আমাদের গোত্র বিভাজন হয়েছিল। ৭

ভাষাচার্য সুনীতি চ্যাটার্জি বলেন—"The Kol Probably came in to India from Indo-china through Asam and Bengal" (Selected Papers—Vol—1)। ৮

Risley-র The Tribes and castes in Bengal বই থেকে পাই যে আদি-বাসীদের আদিবাসভূমি ছিল, 'হিহিড়ি' এবং 'আহিড়ি পিপিড়ি' তে। এই শব্দগুলির

অন্তর্নিহিত অর্থ অর্থাৎ 'হিড়' যার মানে হল পরগনাকে সূচিত করতে পারে। আহিড়ি হাজারিবাগে অবস্থিত। এখান থেকে পরবর্তীকালে সাঁওতালরা পশ্চিমাভিমুখে যাত্রা করে এবং 'খোঁজ কামান' নামে এক পাহাড়ি এলাকায় বসবাস শুরু করে। একসময় এই এলাকায় মহা প্রলয় এবং আগ্নেয়গিরি আবির্ভূত হওয়ায় সাতটি গোষ্ঠীর সমস্ত সাঁওতাল ধ্বংস হয়ে যায়। কেবল এক দম্পতি 'হারা' নামে এক পাহাড়ের ফাটলের মধ্যে ঢুকে পরে কোনরকমে জীবন বাঁচাতে সক্ষম হয়।

আগ্নেয়গিরির দাপট কমলে এই দম্পতি 'হারা' পাহাড় থেকে বেরিয়ে এসে ঐ জায়গায় আর থাকে না। যাত্রা শুরু করে। একসময় একটি বড় নদীর প্রান্তদেশের এক সমতলভূমিতে এসে জড়ো হয়। ঐ সমতলভূমির নাম 'সাসাংবেড়া'। এখানেও চিরকাল তারা থাকে না। পরে তারা আবার সাসাংবেড়া থেকে জার্পি নামে একটি জায়গায় যায়। এখানে দেখা যায় 'মারাংবুরু' নামে একটি খাঁড়া পাহাড়। এই পাহাড় ডিঙিয়ে যাওয়ার মত কোন গিরি সঙ্কট তারা দেখতে না পেয়ে নিরুপায় হয়ে ঐ দম্পত্তি পাহাড়ের উপাসনা শুরু করে এবং তাদের পথ ছেড়ে দেবার প্রার্থনা জানায়। এই প্রার্থনার অব্যবহিত পরেই তারা দেখতে পায় পাহাড়ের গাঁ ঘেঁসে সংকীর্ণভাবে চলে গেছে একটি আঁকাবাকা পথ যা ধরে চলতে চলতে তারা উপনীত হতে পারে 'আহিড়ি' নামে একটি ছোট্ট গ্রামে। কিছুদিন তারা এই গ্রামে অবস্থানও করে। এরপর তারা গ্রাম ত্যাগ করে চলে যায়। 'কেন্দিচাই' নামক এক জায়গায় এবং অবশেষে 'চম্পা' নামক গ্রামে তারা চূড়ান্তভাবে বসবাস শুরু করে। চম্পায় তারা কয়েক পুরুষ ধরে বাস করে। এর ফলে এখানে গড়ে ওঠে বিভিন্ন আদিবাসী প্রতিষ্ঠান যা আজও রয়েছে বর্তমান। ৯ কান্দাহার বা গান্ধার দেশে সাঁওতালরা বসবাস এবং রাজত্ব করেছিল। রাজ্যের নাম দিয়েছিল চাম্পা বা চম্পা। এখানে ৭ গোষ্ঠীর লোক ৭ রকম কাজ করত। কিস্কুরা রাজত্ব করত, টুডুরা লোহার কাজ করত, মাণ্ডিরা ব্যবসা বাণিজ্য করত, মুর্মুরা পুজাপার্বন করত। এঁরা ঠাকুর হিসাবে পরিচিত ছিল। হেমব্রমরা কুমার বা দেওয়ালের কাজ করত, হাঁসদা বা হাঁসদাঃক্‌রা চাষ আবাদ করত এবং সরেনরা ক্ষত্রিয়দের মত দেশের রক্ষণাবেক্ষণ করত। একদিন প্রচণ্ড বৃষ্টি ও আগ্নেয়গিরির অগ্নুৎপাতের ফলে চম্পা রাজ্য মাটির নিচে তলিয়ে যায়।

ইতিহাসের পাতা খুললে মহেঞ্জোদড়োর বিবরণীতে আমরা দেখতে পাই যে যখন মহেঞ্জোদড়োর শহরটি ধ্বংস প্রাপ্ত হল তখন ভগ্নাবশেষ শহরটি সাতটি ব্লকে বিভক্ত ছিল। সাঁওতাল জাতির ৭টি গোত্র (যা আগে উল্লেখ করেছি)-র আলাদা করে গাড় বা ব্লক ছিল। যেমন কিস্কুদের কঁয়ড়া গাড়, মাণ্ডিদের বাদলিগাড়, হেমব্রমদের খায়রীগাড়, টুডুদের সিমাগাড়, মুর্মুদের চাম্পাগাড়, কোকেয়া গাড়, সিরগাড়, নিকার গাড় এবং

কায়ো প্রভৃতি গাছের উল্লেখ পাওয়া যায়। অনুমান করা হচ্ছে যে মহেঞ্জোদড়োতে যে সাতটি ব্লকের উল্লেখ ছিল তা প্রাচীন হড়, অনার্য বা অসুর জাতির গাড়। কান্দার বা গান্ধার দেশের দিক থেকে আগেই বর্বর আর্যদের সঙ্গে সুসভ্য হড়, অনার্য বা অসুর বা সাঁওতাল জাতির যুদ্ধ হয়েছিল। আর্যরা যাযাবর জাতি হিসাব সেই সময় পরিচিত। তারা চাষ আবাদে অজ্ঞ ছিল। সব সময় চেষ্টা করত সাঁওতাল বা অনার্য বা অ.রদের সম্পত্তি, গরু, মোষ ইত্যাদি লুণ্ঠন করে নিতে।

আর্যদের কাছে পরাজিত হয়ে সাঁওতালরা বিতাড়িত হয়ে ছড়িয়ে ছিটিয়ে পড়ে। গান্ধার দেশ থেকে বিতাড়িত হয়ে তারা পাঞ্জাবে এসে নয়া চম্পাগাড় বা চম্পা রাজ্য প্রতিষ্ঠা করে। পাঞ্জাব থেকে তারা উত্তর দিকে অগ্রসর হয়ে তিব্বত ও লাসার মাঝামাঝি জায়গায় চম্পা রাজ্য প্রতিষ্ঠা করে। ১০

Robert Shafer তাঁর Ethnography of Ancient India বইয়ে বলেছেন—"A large area in approximetely the Geographical Centre of Tibet is called Hor or Hor Province on modern maps, "for some Unknown reason' remarked F. W. thomas who has probab'y investigated the ethncgraphy of ancient Tibet more than any other scholar in recent times, about 500 miles South East of Hor province, and 1C0 miles North cf Lhasa in the Tengri nor (G Nam MTS' 50) where Jutchke said People live who are now called Hor. And Rockhill noted that a region north of his lake is known as Nat Hor west 2 Hor until we know mcre of the Origin of the terms and People who Live or lived there our history of the Hurnu will be incomplete". ১১

হড়প্পা ও মহেঞ্জোদড়োর শিল্প ও সংস্কৃতির সঙ্গে সাঁওতাল সংস্কৃতির পরিচয় পাওয়া যায়। হরপ্পা শব্দকে হিন্দী ভাষায় হড়প্পা উচ্চারণ করা হয়। হরপ্পা বা হড়প্পা শব্দের অর্থ 'মৃতের সমাধি' হড়প্পা শব্দটিকে ভাঙলে দাঁড়ায় হড়+তপা ; সাঁওতালী ভাষায় হড় শব্দের অর্থ 'মানুষ' এবং তপা শব্দের অর্থ 'সমাধি' অর্থাৎ মানুষের সমাধি বা মৃতের সমাধি। মহেঞ্জোদড়ো শব্দকে ভাঙলে দাঁড়ায় মহে+এন+জ+দড়ো ; সাঁওতালী ভাষায় 'মহে' শব্দের অর্থ প্রস্ফুটিত হওয়া মোহন=মহে+এন=মহেয়েন (প্রস্ফুটিত হয়েছে এমন) ; 'জ' শব্দের অর্থ ফল এবং 'দড়ে' শব্দটি সাঁওতালী 'দারে' বা মুণ্ডারী 'দারু' থেকে এসেছে ; দারে বা দারু শব্দের অর্থ বৃক্ষ ; অর্থাৎ মহেঞ্জোদড়ো শব্দের অর্থ

প্রস্ফুটিত ফুল ফলদায়িনী বৃক্ষ। 'হরপ্পা ও মহেঞ্জোদড়োর সংস্কৃতি থেকে আরও জানা যায় যে, সেখানে মৃত মানুষকে যখন পোড়ানো বা কবর দেওয়া হয় তখন একটি মুরগির ছানাকে গ্রথিত করে রাখা হত। এই সংস্কৃতির সঙ্গে বর্তমান সাঁওতাল সংস্কৃতির হুবহু সাদৃশ্য দেখা যায়। বর্তমানে সাঁওতালরা মৃত মানুষকে কবরও দেয়, দাহও করে। ডঃ সুনীতি চ্যাটার্জী বলেছেন, "আর্যরা দেহ-ভূপ্রোথিত করিত, দাহও করিত কিন্তু তাদের মধ্যে সমাধি পূজার রীতি ছিলনা। মোটামুটি ভাবে বোঝা যাচ্ছে যে, বৈদিক আর্যধর্মের বাইরে যে পৌরাণিক ও তান্ত্রিক ধর্ম মিলে যে কর্মবাদ, জন্মান্তর বাদ যোগদর্শন ও যোগের নির্দিষ্ট সাধনা, আদ্যাশক্তির আরাধনা ও শিব শক্তিবাদ, বিষ্ণুর আরাধনা প্রভৃতি লইয়া হিন্দু ধর্মের বৈশিষ্ট, সে সমস্ত জিনিষ মুখ্যত অনার্য ধর্মজগৎ হইতেই গৃহীত।" (সংস্কৃতি, সাহিত্য, ইতিহাস) ১২।

হাজারীবাগের রামগড়ে শেষ চম্পা রাজ্য প্রতিষ্ঠা করে জাতির অস্তিত্ব ক্রমশ বিলুপ্ত হতে থাকে। বিভিন্ন সম্প্রদায়ে তারা বিভক্ত হয়ে যায়। যেমন—হো, মুণ্ডা, কোড়া, মাহলী, বীড়হর প্রভৃতি নতুন নতুন সম্প্রদায়। সম্রাট অশোকের সময় পাটুলিপুত্রের আগের নাম ছিল চম্পা। পঞ্জাবের চাম্পা রাজ্য থেকে হড়রা এখানে এসে বসবাস করে ওখান থেকে আবার ওদের বিতাড়িত করা হলে চম্পা নামকে পাল্টে পুনরায় পাটুলিপুত্র রাখা হয়। পাটুলিপুত্র থেকে সাঁওতালরা দক্ষিণ পূর্বদিকে চলে আসে। কিছু চলে যায় নেপাল ও আসামের দিকে। বিহারের ভাগলপুর থেকে ৪ মাইল পশ্চিমে চম্পা রাজ্য প্রতিষ্ঠিত করে। এরপরে দক্ষিণে হাজারিবাগের রামগড়ে চম্পা রাজ্য পুনঃ প্রতিষ্ঠা করে। সাঁওতালদের যাযাবর জীবন এবং তাদের দ্বারা প্রতিষ্ঠিত হয়ে ছিল চম্পা রাজ্য। রাজাও ছিল সেখানে। সাঁওতালী ইতিহাস (যা মুখে মুখে চলে আসছে) থেকে জানা যায় ১৩৪০ খৃষ্টাব্দে হাজারিবাগের চম্পাতে সাঁওতালদের যে রাজা ছিলেন তিনি সম্রাট মহম্মদ বিন তুঘলকের সেনাপতি সৈয়দ ইব্রাহিম আলি বা মালিক বের নেতৃত্বে মুসলমান সৈন্যদের অতর্কিত আক্রমণের সংবাদে ভীত সন্ত্রস্ত হয়ে পরাজিত বা আত্মসমর্পণের গ্লানির কথা ভেবে গোটা রাজ পরিবারকে ধ্বংশ করে নিজেও আত্মাহুতি দেন। ১১

H. H. Risley তাঁর 'The Tribes and Castes of Bengal' বইয়ে একথা উল্লেখ করেছেন। G. A. Grierson-ও Risley-র উক্তি উদ্ধৃতি করে তাঁর Linguistic Survey of India Vol-IV-এ বলেছেন—"According to Mr. Risely it is clear that a large and important santal colcny was once settled in parganas chai and champa in hazirabagh. The authority

further remarks, "A tradition is noticed by colonel of an old fort in chai accompanied by gaura, a Santal Raja, who destroyed himself and his family on hearing the approach of a Mahammedan army under Sayyid Ibrahim Alais Malik Boya, a General of Mahammad Tugluks who died 1453 (A D). This tradition so far as it refers to the existence of a Santal fort in Chai Champa it is some extent corroborated by the following passages from the legends of the southern Santals collected by the Rev. J. Philips and published in Appendix G to the Annals of Rural ed. 1868. Dwelling there (in Chai Champa) they generally multiplied. There are two gates. The Ahiri gate and Bahini gate, to the fort of Chai Champa."১৭

চাই চম্পাতে সাঁওতালরা সমাজ পুনর্গঠন করেছিল। এখন যে সমস্ত অনুষ্ঠান সাঁওতাল সমাজের মধ্যে দেখা যায় তা অনেক আগে চম্পাতেই ঠিক হয়েছিল। এই চম্পাতে সাঁওতালরা দীর্ঘদিন ছিল। এরপর বাধা আসে হিন্দুদের কাছ থেকে। হিন্দুদের চাপে তারা মানভূমে চলে আসে। তৎকালীন রাজা হিন্দুদের কাছে বশ্যতা স্বীকার করে হিন্দুধর্মে দীক্ষা নিয়ে রাজপুত বলে পরিচিত হলেন। সাঁওতালরা রাজার এই ব্যবহারে ক্ষুব্ধ হয়ে রাজাকে পরিত্যাগ করে বিহারের ছোটনাগপুর অঞ্চলের সাঁওতাল পরগনায় চলে আসে। সাঁওতাল পরগনা নাম হয়, সাঁওতালরা বাস করার পর থেকে। বিহারের হাজারিবাগ, পালামৌ, সিংভূম এবং পাশাপাশি পশ্চিমবঙ্গের মেদিনীপুর, বাঁকুড়া, পুরুলিয়া, বীরভূম জেলায় অধিক সংখ্যক সাঁওতালরা ছড়িয়ে পড়ে। বাসও করছে। তবে সাঁওতাল পরগণায় যতটা সংখ্যাধিক্য ছিল যুগের ও সময়ের পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে সংখ্যাধিক্যের ঘনত্ব ক্রমশ ফিকে হয়ে যাচ্ছে। কারণ এক, হিন্দুদের আধিপত্য, দুই, চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত। ১৫

সাঁওতালরা ক্রমাগত স্থান পরিবর্তন করে যেখানে সেখানে বসবাস শুরু করল। তার যে সমস্ত নাম আমরা শুনি, ডব্লিউ. বি. হান্টার কিন্তু সেসব জায়গা সম্পর্কে সন্দিহান। তিনি তাঁর বিখ্যাত বই The Annals of rural Bengal বইতে বলেছেন 'সাঁওতাল দের বর্তমান বাসভূমিতে আসার পথে তারা যে বিভিন্ন অঞ্চল অতিক্রম করেছে বলে থাকে, আমি সেইগুলির নাম উল্লেখ এই আশায় করছি যে, অন্যান্য গবেষকরা সেইগুলি সনাক্ত করে চূড়ান্তভাবে সাঁওতালদের সেদিনের যাত্রাপথে চিহ্নিত করতে পারবেন—আমি নিজে এইগুলি থেকে খুব একটা তথ্য আহরণে সক্ষম হব না। হিহিড়ি

পিপিড়ি কোথায়, আর চাই চম্পা শিলদাই বা কোথায়, তা আমি নিশ্চিতরূপে জানি না, কিন্তু একথা উল্লেখযোগ্য যে সাঁওতালী ভাষায় পিপিড়ি আম শব্দের অর্থ প্রজাপতি এবং হিহিড়ি এরই দ্বিত্ববোধক শব্দ বিশেষ। হিহিড়ি-পিপিড়ির অর্থ প্রজাপতি দেশ হলে সেইটির অবস্থিতি নাতিশীতোষ্ণ মণ্ডলে হওয়া উচিত। সংস্কৃত, বাংলা, হিন্দী বা উর্দু ভাষায় হিহিড়ি বা পিপিড়ি শব্দ দুইটির কোনটিই নেই। দ্বিতীয় দেশ চাই চম্পা এখানে সাঁওতালদের সর্বপ্রথম সংখ্যাবৃদ্ধি ঘটে। চম্পা এক প্রকার ফুল গাছের নাম হওয়ায় এবং চাই চম্পা সেইটিরই দ্বিত্ববোধক বহুবচন হওয়ায় এই পদের অর্থ দাঁড়ায় ফুলগাছের দেশ। ব্রহ্মপুত্রের উত্তর উপত্যকায় এর অবস্থিতি সম্ভব ছিল। তালিকার চতুর্থ নাম শিকার এই অনুমান প্রথম নির্ভরতা বেড়ে আমরা বাস্তব তথ্যের সাক্ষাৎ পাই। এই দামোদরের তীরে প্রায় প্রাচীন বীরভূম জেলার মধ্যে অবস্থিত এবং বর্তমানে এই জাতির অন্যতম প্রধান তীর্থস্থান। একদিকে দামোদরের দক্ষিণ তীরের সাঁওতালরা নিজেদের উত্তরাগত বলে, অন্যদিকে উত্তর পরবর্তীরা নিজেদের দক্ষিণাগত বলে দাবি করে। অনুমান করা যায় যে, উত্তর বা দক্ষিণা তীরের সাঁওতালরা নিজেদের উত্তরাগত বলে অন্যদিকে উত্তর তীরবর্তীরা নিজেদের দক্ষিণাগত বলে দাবি করে। সুতরাং, অনুমান করা যায় যে উত্তর বা দক্ষিণ হতে নয়, বরং পূর্ব বা পশ্চিম হতে তারা ঐ নদী উপত্যকায় উপস্থিত হয়। যেহেতু ইতিহাসকালের মধ্যে তারা শিকার করতে নাগপুরে পশ্চিম অভিমুখে যায়, তাই একমাত্র পূর্বদিক থেকেই তাদের আসা সম্ভব। হিন্দুদের অগ্রগতির চাপে ক্রমশ তারা সমতলভূমি ছেড়ে পার্বত্য অঞ্চলে সরে আসে। এইটাই যে ছিল তাদের সাধারণ যাত্রাপথ, তা তাদের জীবনযাপন প্রণালী ও অভ্যাস পরীক্ষা করলে সন্দেহাতীতভাবে প্রতিপন্ন হয়।' ১৬

বাঘারাইয়ের বিবরণ

ডালটন তাঁর 'Descriptive Ethology of Bengal' বইয়ে বাঘারাইয়ের একটি বিবরণ উল্লেখ করেছেন। বিবরণ অতি মূল্যবান। সাঁওতাল সমাজের আরও একটি অজানা তথ্য পাঠক জানতে পারবেন।

"একদিন একটা বুনো রাজহাঁস রহস্যজনক ভাবে মহাসমুদ্র থেকে উঠে এল। অবতরন করল আহিহিড়ি পিহিড়ি নামক স্থানে। এখানে সে পেড়ে দিয়ে গেল দুটি ডিম। এই ডিমদুটি থেকে বেরিয়ে এলো দুটি মানব শিশু—একজন পুরুষ এবং

অপর জন নারী। এরাই সান্তাল জাতির জনক জননী বলে অভিহিত হয়ে আসছেন। আমাদের এই আদিপুরুষেরা পরবর্তীকালে আহিড়ি পিহিড়ি ত্যাগ করে হাড়া ডাট্টি (Hara Duthe) নামে কোন এক স্থানে বসবাস শুরু করেন। এখানে তাঁরা যথেষ্ট পরিমাণে বংশবিস্তার করেন। তখন এঁদের পদবী হয় 'খাড়োয়ার'। কালক্রমে এই খাড়োয়ার জাতি খৈরাগড় হাড়েদগাড় প্রভৃতি বিভিন্ন স্থানে ভ্রমন করতে করতে অবশেষে চূড়ান্তভাবে হাজারিবাগ জেলার চাই চম্পা নামক অঞ্চলে বসতি স্থাপন করেন এবং এখানে এরা বেশ কয়েক পুরুষ ধরে বাস করতে থাকেন।''

''চাই চম্পা অঞ্চলে তখন বাস করত বহুসংখ্যক বীরহর জাতি (এখনও এদের এতদঞ্চলে দেখা যায়)। এই নীচ জাতির জনৈক পুরুষ একদিন এক সান্তাল কিশোরীর সতীত্ব নষ্ট করে। এর ফলে ঐ কিশোরী জন্ম দেয় এক অবৈধ সন্তানের যাকে জন্মক্ষনেই ফেলে দেওয়া হয় একটি সারের গাদায় (পশু বিষ্ঠার স্তূপে)। জনৈক পারাণিক ও জগমাঝি এই শিশুটিকে দেখতে পেয়ে কুড়িয়ে নিয়ে যায় এবং লালন পালন করতে থাকে। এই শিশু বড় হয়ে পরিণত হয় এক মহাশক্তিশালী পুরুষে যার সঙ্গে পেরে ওঠা কারো পক্ষে সম্ভব হত না। এই শক্তিশালী পুরুষটিকে সবাই একটি হিন্দু নাম 'মধু সিং' বলে ডাকত। এই মধু সিং দাবী করে বসে যে একটি সাঁওতাল মেয়েকে তার সঙ্গে বিয়ে দিতে হবে। কিন্তু একজন বীরহর সন্তানের সঙ্গে কোন সাঁওতাল কিশোরীই বিয়ে করতে রাজি হয় না। এতে ঐ শক্তিশালী পুরুষ ক্রোধোন্মত্ত হয়ে ঘোষণা করল যে, কোন সাঁওতাল মেয়ে তাকে বিয়ে করতে রাজী না হলে তার পরিণাম সব সাঁওতাল কিশোরীর পক্ষেই হবে ভয়ঙ্কর। সাঁওতাল সম্প্রদায় ছিল তাদের কিশোরীদের পবিত্রতার বিষয়ে বিশেষ স্পর্শকাতর। মধু সিং-এর ভীতি প্রদর্শনের ফলে তারা যথেষ্ট আশঙ্কিত হয়ে সিদ্ধান্ত নিল যে তারা চাই চম্পা ত্যাগ করবে এবং সেইমত রাতের অন্ধকারে তারা সকলে নিজ নিজ পুত্র-পরিবার, পরিজন তথা গবাদি পশু ও ধন সম্পদ নিয়ে চাই চম্পা থেকে পালিয়ে গিয়ে আশ্রয় নিয়েছিল ছোটনাগপুরে। ছোটনাগপুর ছিল মুণ্ডা অধ্যুষিত অঞ্চল। সাঁওতালরা হাজির হয়েছিল ছোটনাগপুরের 'মারাংবুরু' নামে একটি বিশাল পর্বতের পাদদেশে। মারাংবুরু পর্বত ছিল মুণ্ডাদের আরাধ্য দেবতা। সাঁওতালরা এখানে এসে এই পর্বতদেবতার কাছে সকাতর প্রার্থনা জানাল যেন মধু সিং কিংবা বীরহর জাতির কেউ যেন তাদের নাগাল না পায়। উল্লেখ, ওরা সাঁওতালদের পশ্চাৎধাবন করছিল। যাইহোক, মারাং বুরু কিন্তু সাঁওতালদের এই কাতর আবেদনে সাড়া দিয়েছিল এবং তার অভ্যন্তর দেশে প্রবেশ করিয়ে নিয়ে আশ্রয় দিয়েছিল এই মহান সাঁওতাল জাতিকে। এই পর্বত তার উত্তর থেকে দক্ষিণের অঞ্চল ঘিরে একটি

সঞ্চার ঘটিয়ে সাঁওতালদের পশ্চাৎধাবনকারীদের বাধা সৃষ্টি করে রক্ষা করেছিল এই জাতির অস্তিত্ব। সেই থেকে সাঁওতালরা মারাং বুরু পাহাড়কে তাদের আরাধ্য দেবতার আসনে বসায় এবং ছাগবলি ইত্যাদির মাধ্যমে পুজো করে তাকে। একটি পবিত্র কুঞ্জবীথির মধ্যে তারা এই দেবতার আসন পেতে থাকে। এই স্থানের নাম জাহের এরা ও মনিকা। কিন্তু আমাদের উক্ত পূর্বপুরুষেরা নাগপুরে স্থায়ীভাবে বসবাস করেন নি। তারা ঝালদায় গিয়ে উপস্থিত হন। ঝালদাও তখন ছিল 'মুণ্ডা' দের দখলে। এখন অবশ্য এই অঞ্চলে বসবাস করছে কুর্মীরা। এরপর তাঁরা গিয়ে হাজির হন পাতকুম নামক স্থানে। কিন্তু সেখানে ভূমিজ সম্প্রদায়ের মধ্যে তারা বসবাস যোগ্য পরিবেশ খুঁজে না পাওয়ায় অবশেষে সাঁওন্ত নামক স্থানে এসে উপনীত হন। এই স্থানটি ছিল যথেষ্ট বন সম্পদে সমৃদ্ধ এবং তাঁদের পক্ষে বসবাসের উপযোগী। সুতরাং এখানে তারা শুরু করে স্থায়ীভাবে বসবাস। এখানে সুন্দর সুন্দর ঘরবাড়ি নির্মান করে নিজ প্রথা অনুসারে গান বাজনা নৃত্য খেলাধুলা ইত্যাদির মাধ্যমে জীবনকে সুন্দরভাবে উপভোগ করতে থাকে।

একদিন সাঁওতের রাজা সাঁওতাল কুমারীদের নৃত্যরতা দেখে কামাবিষ্ট হয়ে আমাদের যেকোন একটি কুমারীকে ভোগ করার দাবী করে প্রত্যাখাত হন। এর ফলে রাজার কোপ গিয়ে পড়ে সমগ্র সাঁওতাল সম্প্রদায়ের ওপর। সুতরাং তাদের ছাড়তে হয় সাঁওতের বাসভূমি। সাঁওতে এরা দীর্ঘকাল বসবাস করার ফলে সাঁওতাল নামে অভিহিত হন। যাইহোক, সাঁওতা ত্যাগ করে তাঁরা উপস্থিত হন 'সিখার' নামে একটি জায়গায়। সাঁওতে বাস করার আগে আমরা খাড়োয়ার নামেই পরিচিত ছিলাম, ক্রমান্বয়ে আমরা গড়ে তুলি অসংখ্য গ্রাম। সেই সমস্ত গ্রাম আজও মানভূম জেলার পূর্বাংশে প্রতীয়মান রয়েছে। এরপর থেকে আমরা সংখ্যায় যত বেড়েছি বনাঞ্চল হ্রাস পেয়েছে ঠিক সেই হারে। ফলে আমাদের কলোনীগুলি ক্রমশঃ পশ্চিমে সরে সরে পড়েছে। এবং পরিব্যাপ্ত হয়েছে গোলা পরগনার (হাজারিবাগ জেলা) সোনাবাড়ি ও গুটিয়াড়িতে তথা সিখাড়ে যেখান দিয়ে বহে চলেছে দামোদর। আমার পূর্বপুরুষেরা ছিল সোনাবাড়ি কলোনীতে বসবাসকারী সাঁওতালদের নেতা। তৎকালে ছিল খাড়োয়ার রাজা। এই রাজাদের একজন গোলাতে প্রতিষ্ঠিত হন যাকে আমার পূর্বসূরীরা দিত কর। আমার পিতামহের আমলে, কাজাল পরগনিত নামে একটি খাটোয়ালি প্রথা প্রবর্তিত হয় (এর ফলে তাদের রাস্তা, সড়ক ইত্যাদি রক্ষণাবেক্ষণ করতে হত)। সেই আমলেই আমাদের দেশে প্রথম দেখা দিয়েছিল ইংরেজ সাহেবদের। এদের মধ্যে একজন একটি লাল রঙের ছড়ি (তখন বলা হ'ত

লাঠি) নিয়ে প্রবেশ করেছিল সোনাবাড়িতে।

এই ইংরেজটির পিছনে পিছনে আর যারা এসেছিল তাদের বুকে লাগানো ছিল পিতলের খোদাই করা একটি প্লেট। এদের সঙ্গে ছিল দুটি অদ্ভুত ধরনের কুকুর। সেই লোকটি গ্রামে প্রবেশ করেই খোঁজ করেছিল গ্রাম প্রধানের এবং আমার পিতামহ তার কাছে উপস্থিত হলে তাকে ঘিরে ধরে আদেশ দেওয়া হয়েছিল একটা বাংলো তৈরী হতে পারে এমন জায়গা দেখাতে। আমার পিতামহ তার একটা জমি দেখানোর পর তাঁকে মুক্তি দেওয়া হয়। এই অঞ্চলে ছিল যথেষ্ট পরিমানে লৌহ আকরিক। সুতরাং 'লাট-লাথি' অনতিবিলম্বে লোহা থেকে আকরিক পৃথক করার কাজে নিযুক্ত করলেন লোকজন। তারা এই সব লোহা এবং আকরিক সংগ্রহ করে পাঠিয়ে দিতে লাগল সারা দেশে।"

এইভাবে 'বাঘারাই' সংক্ষেপে এবং দক্ষতার সঙ্গে তার দৃষ্টি ভঙ্গি অনুযায়ী সাঁওতাল সম্প্রদায়ের ইতিবৃত্ত বর্ণনা করেছেন যা তাদের সৃষ্টির উৎস থেকে শুরু করে বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদ পত্তন পর্যন্ত পরিব্যাপ্ত। গ্রামে প্রথম বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদের পদক্ষেপ সম্পর্কে যে বাস্তবধর্মী ও উৎসাহ ব্যঞ্জক বর্ণনা তিনি পেশ করেছেন তা এককথায় জীবন্ত। লাট লাথি বিষয়ে যে ব্যাখ্যা তিনি রাখতে চেয়েছেন তা বোধ হয় 'বিলাতি' কথাটির একটি সাঁওতালি টিকা ছাড়া আর কিছুই নয় যা বিদেশী ইংরেজ এর অর্থবহ। সাঁওতাল জাতির উৎপত্তি ধারা সম্পর্কে বাঘারাই —এর দেওয়া বিবরণ আনুপূর্বিক সত্য বলেই দৃষ্ট হয় যদিও মিষ্টার হাণ্টার—এর 'রুর‍্যাল বেঙ্গল' নামক পুস্তকে কিংবা মিঃ মান-এর গবেষণামূলক কাজে কিছু কিছু ক্ষেত্রে বিভিন্নতা পরিলক্ষিত হয়েছে। এটা যেহেতু অসম্ভব নয় যে সাঁওতালরা জুড়িয়াতে আসতে গিয়ে বঙ্গোপসাগর অতিক্রম করেছিল, সুতরাং বর্ণিত বুনো হাঁস হতে পারে সেই সাদা পাল তোলা নৌকা যা বহন করে এনেছিল এদের। এই পৌরাণিক গাথার বিশদ ব্যাখ্যা অবশ্যই ব্রাহ্মনির সূত্র থেকে পূরণ করা হয়ে থাকবে। ইদানিং কালেও সাঁওতালরা দামোদরকেই তাদের সমুদ্র বলে মানে এবং এদের মধ্যে কেউ মারা গেলে মৃত দেহের ভস্মাবশেষ যতক্ষণ পর্যন্ত না তারা দামোদরের স্রোতে বিসর্জন দিতে পারে ততক্ষণ পর্যন্ত তারা তৃপ্তি পায় না এবং মৃতের আত্মাও শান্তি পায় না বলে বিশ্বাস করে থাকে।

'আহিড়ি-পিহিড়ি'-কে চিহ্নিত করতে আমি অসমর্থ। তবে, এটা জানা কথা যে যে খৈড়াগড় এবং চাই চম্পা হাজারিবাগ বা রামগড় জেলার অন্তর্ভুক্ত এবং এই চম্পার কথা এবং সংশ্লিষ্ট জেলার প্রত্যন্ত গ্রামের সাঁওতালদের কথাই আলোচ্য অংশে প্রায়শঃই উল্লেখ করা হয়েছে।

চাই নামক স্থানে ছিল একটি দুর্গ যার দেওয়াল ছিল মাটি ও পাথর দিয়ে তৈরী। এই দুর্গের সীমানার পরিধি ছিল প্রায় পাঁচ একর। এটির ঐতিহ্য ছিল এই যে, জুংড়া নামে এক সাঁওতাল রাজা এই দুর্গে সপরিবারে বসবাস করতেন যিনি মুসলমান সেনাপতি সৈয়দ ইব্রাহিম আলি ওরফে মালিক বে-র নেতৃত্বে একদল মুসলমান সৈনিকের আক্রমণ বার্তা পাওয়া মাত্র ঐ দুর্গে সপরিবারে আত্মহনন করেছিলেন (যা আগেই উল্লেখ করেছি)। এই রাজা এইভাবে সপরিবারে মৃত্যু বরণ করার পর হজরত ফত্ থাঁ দুয়ালা নামে একজন মুসলমান সৈন্যাধ্যক্ষকে উক্ত দুর্গের ভার দেওয়া হয়। এই সৈন্যাধ্যক্ষের মৃত্যুর পর চাই গড়ে তার কবরের পাশে নির্মিত হয় একটি 'দর্গা'।

ভই-এর থেকে চার মাইল দূরবর্তী মানগড় নামক স্থানেও ছিল আর একটি দুর্গ বা গড়। এটিও মান সিং নামে এক সাঁওতাল প্রধানের বসবাস স্থল হিসাবে ছিল ঐতিহ্য মণ্ডিত। মুসলমান আক্রমণের কারনেই তাকেও দুর্গ ছেড়ে পালাতে হয়। আরও জানা যায় যে চাই-এর মতই পূর্বে ছিলেন ছয়জন সাঁওতাল প্রধান। এদের মধ্যে তিন জন বিহারে এবং বাকী তিনজন হাজারিবাগ জেলায় বসবাস করতেন।১৭ বিভিন্ন জায়গা থেকে বিতাড়িত হতে হতে সাঁওতালদের মধ্যে গড়ে উঠেছিল ক্ষোভ, দুঃখ, ঘৃণা। গড়ে উঠে ছিল জাতির মধ্যে নেতা। অর্থাৎ একজন ব্যক্তিকে মেনে তার নিয়ম নীতির পথ অনুসরণ করে সংঘবদ্ধ জাতিতে পরিণত হল তারা। তাদের মধ্যে নেতা কারা এ সম্পর্কে এবার আলোচনা করা হচ্ছে।

গ্রাম প্রধান

জনসাধারণের প্রতিনিধি বা নেতা নির্বাচনের পদ্ধতিটা আজকের নয়। সাঁওতাল সমাজে বহু যুগ যুগ ধরে এর সূত্রপাত ঘটে। বলা যেতে পারে, আমাদের বর্তমান বিচার পদ্ধতি, বা গ্রাম নেতৃত্ব সাঁওতাল সমাজের প্রাচীন পদ্ধতি থেকে এসেছে। সাঁওতাল সমাজ চিরকালই সমাজবদ্ধভাবে বাস করতে আগ্রহী। আর এই কারণে সমাজ নিয়েই তাদের সমস্ত রকম কাজ, আন্দোলন। সাঁওতালরাও সংসদীয় গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে তাঁদের নেতা নির্বাচিত করেন। তবে তা ব্যালট বাক্সের মাধ্যমে হয় না, হয় প্রকাশ্যে, জনসভায়, জাহের থানে। গ্রামের মানুষ এক সঙ্গে মিলিত হয়ে একজায়গায় বসে তাদের মধ্যে থেকে নেতা নির্বাচন করেন। সবার মিলিত প্রচেষ্টায় গড়ে ওঠে সমাজ।

অর্থাৎ 'সমাজ' কথাটি একটি শব্দ। 'সমাজ'কে ভাঙলে দাঁড়ায় স+মাজ! 'স' বা 'মা' হচ্ছে সাঁওতালী উপসর্গ। 'মাজ' বা মাঞ্জ শব্দের অর্থ মাহাজ, মাঝ বা মধ্য। সাঁওতালী ভাষায় মাজ বা মাঞ্জ কোন জিনিসের মধ্যকার অংশটুকু বোঝায়। তালগাছের অংশটুকু যেমন 'স' অর্থাৎ সমানভাবে জমাট বেধে বেড়ে বেড়ে ওঠে, শক্ত হয় এবং তার কঠিন শক্তি যেমন উপলব্ধি করা যায় তেমনি আদিবাসী সমাজ লোহার শক্ত, কঠিন, দৃঢ়।

মাঝি—সাঁওতাল সমাজের যিনি নেতা নির্বাচিত হন তাঁকে 'মাঝি' বলে। আবার একে মাঝি হারাম বা মাঞ্জহি বা গ্রাম প্রধান বলেও ডাকা হয়। অর্থাৎ ইনি গ্রাম পরিচালনার সর্বময় কর্তা। 'মাঞ্জহি' শব্দটিও 'মাজ' বা 'মাঞ্জ' থেকে হয়েছে। 'মাজ+হি বা মাঞ্জ'+হি=মাঞ্জহি; হি একটি প্রত্যয় মোড়ল বলেও মাঝির পরিচিত আছে। সমস্ত রকম ব্যাপারে তার মতামত থাকতে হবে। এবং তার গোচরে বিষয়টা জানাতে হবে। তার উপস্থিতিও সবরকম কাজে থাকতে হবে। গ্রামের হয়ে বলার লোক হচ্ছেন এই মাঝি। 'মাঝি'র আর্থিক অবস্থাও অন্যান্যদের তুলনায় ভাল হতে হবে। যে কোন ব্যক্তি ব্যক্তিগতভাবে কারুর বিরুদ্ধে অভিযোগ মাঝির কাছে জানাতে পারে। কেননা গ্রাম প্রধান বা মাঝির হাতে ক্ষমতা প্রচুর। তার নির্দেশ সবাইকে মেনে চলতেই হবে। তার উপদেশও সবাইকে শুনতে হবে। যদি কখনও প্রয়োজন হয়, মাঝি গ্রাম্য সভা বা village council ডাকতে পারেন। যেখানে সে সভায় সবার মত নিয়ে মতামত প্রকাশ করতে পারে। নিজস্ব ধর্মের রীতি নীতি ও নিয়মকানুন অনুযায়ী বিচার ব্যবস্থা চলছে কিনা তার দিকে নজর রাখাও মাঝির কাজ। গ্রাম্য সভায় যদি কারুর বিরুদ্ধে কোন জরিমানা ধার্য করা হয় তা সংগ্রহ করাও মাঝি বা হেডম্যানের কাজ। অবশ্য বিচার ব্যবস্থায় মাঝির হাতে তেমন কোন বলিষ্ঠ ক্ষমতা নেই। সে পারে না চরম শাস্তি দিতে কাউকে। গ্রাম্য সভা ছাড়া তার এ ব্যাপারে নিজস্ব কোন মতামত খাটে না। বিবাহ, উৎসব, পার্বনে এবং কারুর মৃত্যু হলে সে প্রধান ভূমিকা নেবে। উৎসব পার্বনে যে নাচের অনুষ্ঠান থাকে তা শুরু করতে হয় 'মাঝি'র বাড়ি থেকে। তার বাড়িতে আগে সবাইকে যেতে হবে। বিয়ের ব্যাপারে ছেলের বাবাকে মেয়ের গ্রামের 'মাঝি'র সঙ্গে আগে যোগাযোগ করতে হবে। দেখা করে বলতে হবে অমুক বাড়ির মেয়েকে তার পছন্দ। 'মাঝি'র মধ্যস্থতায় বিয়ের যোগাযোগ হবে। নচেৎ নয়। জরিমানা যদি কারুর

উপর ধার্য করা হয়। তার শেয়ারও 'মাঝি'র প্রাপ্য। সুতরাং, মাঝি নির্বাচন করার আগে খুব ভালভাবে বিচার করে দেখা হয় তার এই সমস্ত দায়িত্ব পালন করার ক্ষমতা আছে কিনা। 'মাঝি' নির্বাচিত হলে তাঁর জন্য জমি দেওয়া হয়। সাঁওতাল পরগণায় এখনও এই নিয়ম চালু আছে।

জগমাঝি—মাঝির পর যিনি থাকেন ডেপুটি পদে (এখন যেমন উপ-মন্ত্রী) তিনি জগমাঝি বা জগমাঞ্জহি। এর দায়িত্ব গ্রামের যুবক-যুবতীদের নেতৃত্ব দেওয়া বা পরিচালনা করা। এর প্রধান দায়িত্ব গ্রামকে অপসংস্কৃতি থেকে রক্ষা করা। যৌন উশৃঙ্খলা যাতে যুবক-যুবতীদের মধ্যে ছড়িয়ে পড়তে না পারে সে সম্পর্কে কড়া নজর দেওয়া। এর মধ্যেও যদি কেউ কোন কুকর্ম করে ফেলে তাহলে তাকে গ্রামের পাঁচ-জনের সামনে হেনস্থা করে মাঝির গোয়াল ঘরে নিয়ে গিয়ে উত্তম মধ্যম শাস্তি দেওয়া হয় এবং জরিমানা ধার্য করা হয়। জগমাঝির নির্দেশ ছাড়া কোন যুবক-যুবতী উৎসবানুষ্ঠানে যোগ দিতে পারে না। নৃত্যগীতির অনুষ্ঠানের পরিচালনার ভার এর উপর থাকে। জগমাঝি নির্বাচন করে তাকে কিছু 'মান' জমি দেওয়া হয়।

পারাণিক—মাঝির প্রধান সহকর্মী হচ্ছেন পারাণিক। সচিবের মত তার কাজ-কর্ম। মাঝির অনুপস্থিতিতে পারাণিকই সব কিছু পরিচালনা করেন। মাঝি যদি তার পদ থেকে ইস্তফা বা পদত্যাগ করেন কিংবা মারা যান এবং যদি তার কোন ভাই বা বংশধর না থাকে তাহলে পারাণিকই মাঝির পদ পান। মাঝির মত এও জমি পায়।

জগ পারাণিক—জগমাঝিকে সাহায্য করার জন্য একে নির্বাচিত করা হয়। জগমাঝির অবর্তমানে সমস্ত দায় দায়িত্ব এর উপর বর্তায়।

গডেত বা দূত—ইনি মাঝির দূত। মাঝির আদেশে তিনি গ্রামের লোককে সমবেত করেন। পূজো-পার্বন, জন্ম-মৃত্যু, সহরায়, সাকরাত প্রভৃতি উৎসবানুষ্ঠানের অগ্রভাগে এর ভূমিকা থাকে। গডেত যা বলবে তা সবাইকে মানতে হবে। আদিবাসীরা গডেতকে সাক্ষী হিসাবেই মানে। পূর্ব-পুরুষদের মতে আদিবাসী সাঁওতালদের দেবতা মারাংবুরু ছিলেন ঠাকুরের গডেত। গডেতের চরিত্র হয় চালাকচতুর, চটপটে এবং লোভী। অনেক সময় দেখা গেছে গডেত মাঝিকে সরিয়ে তার জায়গায় বসেছে। এমনকি পারগাণাকেও সরিয়ে দিয়ে নিজে সেই জায়গায় অধিকার করে বসেন।

নায়কে—এ পূজারী ব্রাহ্মণ। সার্বজনীন পূজোর পুরোহিত। যাবতীয় উৎসব অনুষ্ঠানে নায়কেই পূজা করেন। এছাড়া তাঁর অন্য কোন কাজ নেই।

কুডাম নায়কে—ইনি নায়কের সহকারী। নায়কে যতবার বলি দিয়ে পূজা পাঠ করেন, কুডাম নায়কে ততবারই 'বুল-মায়াম' অর্থাৎ কাঁটা দিয়ে অণ্ডকোষের রক্ত বার

করে পূজা করে পারগাণা বঙ্গা ও সীমা দেবতার নামে। জাম্বাড় পূজায় পারগাণা দেবতার নামে সে শুয়র বলি দেয়। শিকারের সময় কুডাম নায়কে পারগানা দেবতার ও সীমা দেবতাকে পূজা করেন।

পারগাণা—দেশ কয়েকটি পরগণায় বিভক্ত থাকে। পরগণার শাসন কর্তাকে পারগাণা বলা হয়। কোন গ্রামে মাঝি বিচার করতে না পারলে পারগাণাকে আমন্ত্রন জানান হয়। পারগাণা অনুসন্ধান করে বিচারের মীমাংসা করেন।

দেশমাঝি—প্রত্যেকটি পরগণায় একটি করে দেশমাঝি থাকে। সমগ্র পরগণা বা দেশের কথা দেশ মাঝি ভেবে থাকেন। তিনি সমাজের সর্বময় কর্তা। কোন গ্রাম বা পরগণার বিচার ঠিকমত না হলে দেশ মাঝির কাছে বিচার ব্যবস্থার দায়িত্ব অর্পিত হয়।

দিহরি—জাতীয় শিকারে যাঁরা নেতৃত্ব দেন তাঁদেরকে 'দিহরি' বলে। প্রত্যেক এলাকায় একটি করে 'দিহরি' থাকেন। ইনি শুধুমাত্র জাতীয় শিকারের সর্বময় কর্তা। 'ল-বির-বাহসি' (সাঁওতাল সুপ্রীম কোর্ট) দিহরির দ্বারা পরিচালিত হয়।

দিহরির ভূমিকা ও শিকার উৎসব

বনে, জঙ্গলে, পাহাড়-পর্বতে, গিরিখন্দরে থাকতে থাকতে সাঁওতালদের শিকার করার প্রয়োজনীয়তা দেখা দিয়েছিল। অন্ততপক্ষে জীবন ধারণের পক্ষে বন্যজন্তু শিকার করে খাওয়া ছিল তাদের একমাত্র পথ। আরণ্যক পরিবেশে থাকার ফলে বন্যজন্তু শিকার করাটা তাদের কাছে জাতীয় উৎসবে পরিণত হয়েছে। কতকগুলো নিয়ম নীতির মাধ্যমে তারা এই শিকার উৎসব পালন করত। দিহরির ভূমিকা এখানে প্রধান। প্রাচীনকালে শিকারের আগে পাতার নিশান ঘোরানো হত। গ্রাম্য শাসন ব্যবস্থার জন্য যেমন মাঝি, পারাণিক ইত্যাদি থাকে। সেরকম শিকার পরিচালনা করার জন্য এক এক অঞ্চলে একটি করে 'দিহরি' বা শিকার পরিচালক নিযুক্ত হত। দিহরি চড়ক পূজার সময়ে পাতার নিশান ঘুরিয়ে বেড়ায়। দেশের মানুষ তাকে জিজ্ঞাসা করে 'কোন বন শিকারের জন্য ডাক দিচ্ছ দিহরি বাবা'? দিহরি তখন বনের নাম বলে দেয়, দিনক্ষণ ও সমবেত হওয়ার জায়গা সকলকে জানিয়ে দেয়। থাকা ও শোবার জায়গাও তাদের বলে দেয়। চড়ক পূজা থেকে ফিরে সবাই শিকারের খবর নিজ নিজ গ্রামে প্রচার করে দেয়। এরপরেই শিকার যাবার মানসিক প্রস্তুতি নিজেরাই করে ফেলে এবং সঙ্গে সঙ্গে শিকারের সাজ-সরঞ্জাম ঠিক করা হয়। তীর-ধনুক নতুন সাজে সাজানো হয়। তীরের ফলা, তরবারি, টাঙ্গি, বল্লম ইত্যাদি পাথরে ঘষে, চকচকে

করা হয়। খাবারের জন্য চালের পুঁটুলি বাধা হয়। শিকারের জন্য গ্রামের মাঝিহিকে পাঁচ পাই চাল দিতে হয়। তাকে 'মাণ্ডিলী' বলে। মাঝাহি মশাইকে 'মাণ্ডিলী' ছাড়াও পাতা দিয়ে পুঁটুলি করা এক পুঁটুলি মহুয়া দিতে হয়। শিকারে গিয়ে সেগুলি খাওয়া হয়। যদি কোন গরীব শিকারী খাবারের জন্য চাল না নিয়ে যায় সেগুলি তাকেও দেওয়া হয়। শিকারের নামে গ্রামের ব্রাহ্মণ 'নায়কে' পাঁচটি মুরগির বাচ্চা বলি দিয়ে পূজো করে।

শিকারের দিন এলেই ভোর রাতে অর্থাৎ যখন ভোরে মুরগি ডাকে তখন দু-একজন লোক গ্রামের বাইরে ময়দানে চলে যায়। তাদের দেখে তাড়াতাড়ি সকলে প্রস্তুত হয়ে সেখানে গিয়ে উপস্থিত হয়। সঙ্গে নিয়ে যায় নাগড়া (টামাক), বাঁশী ও শিঙা (সাকওয়া)। যতক্ষণ পর্যন্ত গ্রামের লোক সেখানে উপস্থিত না হয় ততক্ষণ পর্যন্ত নাগড়া, বাঁশী ও শিঙা বাজানো হয়।

আর যুবকেরা অশ্লীল ভাষায় গান করে। সকলে এসে উপস্থিত হলে একসঙ্গে স্লোগান তুলে আস্তে আস্তে বনের দিকে এগিয়ে যায়। বনে পৌঁছে গেলে সেখানে বসার জায়গা নির্দিষ্ট থাকে, তাকে বলা হয় 'দুপুডুঃপটাণ্ডি'। দুপুডুঃপটাণ্ডিতে রান্নাবান্না ও খাওয়া-দাওয়া করে বিশ্রাম নেয়।

দিহুরি 'দুপুডুঃপটাণ্ডি'তে ভোর রাত থেকেই থাকে। শিকারের দিনক্ষণ স্থির হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে দিহুরি অতি সাবধানতার সঙ্গে চতুর্দিকে লক্ষ্য রাখে। তার স্ত্রী একটি লোটায় জল নিয়ে এসে বাড়ীর ভিতরে রাখে এবং দিনে অন্তত দুবার জল পরীক্ষা করে শিকারে কোন বিপদ ঘটবে কিনা। দিহুরি এবং তার স্ত্রী দুজনে মেঝেতে ঘুমায়। তারা সঙ্গম করে না এবং রাত্রি না হলে তারা কিছুই খায় না। শিকারের পূর্বরাত্রে দিহুরি দুটি শালের পাতা নিয়ে আসে এবং লোটায় জলে রাখে। লোটার পাশে আড়াআড়িভাবে দুটো বাতি জ্বালায় এবং পরের দিন ভোরে পরীক্ষা করে শিকারে কোন বিপদ আপদ ঘটবে কিনা। যদি শালের পাতা পরিষ্কার ও সবুজ থাকে তাহলে বোঝা যাবে কোন মেয়ে (ডাইনী) কোন কুকর্ম করবে না। সে রাত্রে দিহুরি ও তার স্ত্রী কোন খাদ্য গ্রহণ করে না এবং একসঙ্গে শয়ন করে না। পরের দিন ভোর রাতে দিহুরির স্ত্রী কোমরে দড়ি বা ডোর দিয়ে বেশ আঁটসাঁট করে বাঁধে এবং কোমরের বাঁধন আলগা করার জন্য তার বাহু পর্যন্ত একটি দড়ি লাগানো থাকে। পাতার টুপি দিয়ে তার সমগ্র মুখমণ্ডল ঢেকে রাখা হয় কারণ জীবজন্তুরা যাতে শিকারীদের না দেখতে পায় ও যাতে পালাতে না পারে। শিকার থেকে ফিরে আসা অবধি দিহুরি এই অবস্থায় থাকে। দিহুরির স্ত্রীর পা আলগাভাবে পিছ মোড়া করে বাঁধা হয়। মহিলাটি ভারী

উবু হয়ে ঘরের দরজার সামনে বসে পড়ে। তার সামনে এক ঘটি জল আনা হয় এবং সে নড়াচাড়া না করে সারাদিন ঘটির জল পরীক্ষা নিরীক্ষা করে। যদি ঘটির জল কিছু পরিমাণে নোংরা হয় তখন সে বুঝবে যে ছোট জন্তু বা পাখি শিকারে আসবে। কিন্তু যদি ঘটির জলে রক্ত দেখা দেয় তাহলে শিকারীরা চিতাবাঘ, শুকর ইত্যাদি শিকার পায়। যদি জল একেবারে ঘোলাটে হয়ে যায় কিংবা ঘটিশুদ্ধ জলটাই রক্ত হয়ে যায় তখন সে পরীক্ষা-নিরীক্ষা শেষ করে দেয় এবং উপবাস থেকে নিবৃত্ত হয়। যতক্ষণ পর্যন্ত জলে এই লক্ষণগুলো দেখা না যাচ্ছে ততক্ষণ পর্যন্ত সে উৎসাহ বোধ করে না। পরীক্ষা-নিরীক্ষার সময় সে উপলব্ধি করে—যদি তার আচরণ বিধি পবিত্র হয় তখন তার ফললাভ নিশ্চিত। জলের কোন লক্ষণ দেখা দেওয়ার পূর্বে সে যদি উঠে যায় তাহলে শিকার ভেস্তে যায়।

'ডুম্বুড়ুঃপটাণ্ডিতে' দেশের শিকারীর দল এসে জমায়েত হবার আগে দিহরি 'খাড়ি কোঠি চালায়। বনের কোন এক প্রান্তে বিঘ্ন ঘটবে এটা যদি খাড়ি কাঠিতে বোঝা যায় তাহলে সমগ্র দেশের শিকারীদের এক জায়গায় সবাইকে ডেকে জিজ্ঞাসাবাদ করে বলে বনের অমুক (দিক্ উল্লেখ করে) প্রান্তের কোন কোন গ্রামের লোক এখানে এসে পৌঁছিয়েছে? একের পর এক শিকারীর দল তাদের গ্রামের নাম দিহরীকে বলে দেয়। দিহুরি তখন প্রত্যেক গ্রামের জন্য 'তেলপাঠ' করে। যদি সে কোন গ্রামের নাম উল্লেখ করে বলে যে অমুক গ্রামের লোককে চিতাবাঘে আক্রমণ করবে। সেই গ্রামের শিকারীদের উপদেশ দিয়ে বলে তোমরা তাহলে প্রতিরোধের জন্য ব্যবস্থাদি গ্রহণ কর, আর না হয় ফিরে যাও। তখন সেই গ্রামের শিকারী দল দিহুরিকে বলে দিহুরিবাবা, তুমি প্রতিরোধের ব্যবস্থা কর যাতে আমাদের কোন রকম ক্ষতি না হয়। দিহুরি তখন সেই গ্রামের লোককে পৃথক করে বসায়। তাদের নামে একটি মুরগি বলি দিয়ে পুজো দেয় এবং তাদের বাধাবিঘ্ন যাতে না ঘটে, তারজন্য "বেড়" কাটে। তখন সে মন্ত্র পড়ে, তোমাকে জোহার দিই, হে আমাদের সূর্যদেব, জাতির জন্য তোমার বিস্তার অকল্পনীয়। 'কিয়ী' ফুলের মত তুমি আকড়ে রয়েছ, চতুর্দিকে তোমার বিস্তার, যদি কোন বিধবা রমনী বিঘ্ন ঘটায়, যদি কেউ বাধা সৃষ্টি করে, তখনই যেন তার প্রথম সন্তানকে সিংহে খেয়ে ফেলে, আমার লোকজন, যাদের বাধাবিঘ্ন ঘটবার সম্ভাবনা আছে তাদেরকে বন থেকে বার করে দাও, আমার বাপু ঠাকুরগো। দিহুরি এবার পাঁচটি মুরগীর ছানাকে বলি দেবে। একটি মুরগীর ছানা দিহুরি দেবতার উদ্দেশ্যে ও অপর চারটি ছানাকে বনদেবতার উদ্দেশ্যে বলি দেয়। দিহরি কাঁটা দিয়ে তার নিজের অণ্ডকোষে মেরে রক্ত বার করে সেই রক্ত চালের উপরে ফেলে, আর সেই

রক্তমাখা চাল দেবতার উদ্দেশ্যে ভোগ দেয়। বলি দেওয়া মুরগীর ছানাকে শুদ্ধ চালের সঙ্গে খিঁচুড়ি করা হয়। ঐ পাঁচটি মুরগীর বাচ্চা কোন্ কোন্ গ্রাম থেকে দেওয়া হয়েছে কেবলমাত্র সেই গ্রামের লোকের মধ্যে খিঁচুড়ি ভাগ হয়। বাকি মুরগির ছানাকে বলি দেওয়া হয় যে যে প্রান্তে বিঘ্ন ঘটার সম্ভাবনা রয়েছে সেই প্রান্তের বনদেবতার উদ্দেশ্যে সমস্ত শিকারীদের দাঁড়িয়ে রেখে বলি দেওয়া হয়। বিঘ্ন স্থানে যতক্ষণ পর্যন্ত দিহরি বলি না দিচ্ছে ততক্ষণ পর্যন্ত কোনও শিকারী দলকে সেইস্থান অতিক্রম করতে দেওয়া হয় না।

'তুপুড়ুঃপটাণ্ডি'তে শিকারীর দল রান্নাবান্না করে খেয়ে নেয়। বনের ভিতরে কোথাও জল আছে কিনা দিহরি তার সন্ধান শিকারী দলকে বলে দেয়। যতক্ষণ পর্যন্ত শিকারী দল কোন জীব হত্যা না করছে ততক্ষণ পর্যন্ত সে কোন কিছু খায় না। পূজো শেষ করেই দিহরি মাটিতে লুটিয়ে পড়ে। দু-একজন তার সর্বাঙ্গ মালিশ করে, কেউ কেউ দিহরিকে গলা কাটার ভান করে। তখনই সবাই মিলে চেঁচিয়ে ওঠে—ফালি ফালি, বড় 'সটল' মারা পড়েছে। দিহরি নিজের বাঁধন খুলে ফেলে। দিহরি যেখানে যেখানে বনদেবতার পূজা দিয়েছে সেখানেই অনুরূপ ক্রিয়া করে।

পূজো দেওয়া সত্বেও যদি কোন শিকারীর বিঘ্ন ঘটে কিংবা বাঘ-সিংহের দ্বারা আক্রান্ত হয় বা মারা যায় তখন দিহরিকে গালিগালাজ, ভৎর্সনা করা হয়। তরবারি উচিয়ে ধরা হয়। তখন শিকারী-দল রেগে চেঁচিয়ে ওঠে—মার, মার ব্যাটাকে মার। দেশের মানুষের ক্ষতি করার জন্য তুমি আমাদের এখানে নিয়ে এসেছ। তখন দিহুরি চুপ হয়ে যায়। তার আর কিছুই বলার থাকে না।

দিহুরি শিকারী দলকে পরিচালনা করে। নাগড়া না বাজিয়েই চুপিচুপি শিকারীরা বনের ভিতরে প্রবেশ করে যাতে শিকার পালিয়ে না যায়। কোন কোন শিকারীর দল 'নাগড়া' না বাজিয়েই শেষ প্রান্ত অবধি শিকার করে। শিকারীরা বনের জীবজন্তুদের তাড়া করতে থাকে, নাগড়া বাজায়, তখন জীবজন্তুরা প্রাণভয়ে অন্য বনে পালানোর চেষ্টা করে। সেই সময় বনপ্রান্তে যারা লুকিয়ে থাকে তারা একে একে বিভিন্ন কায়দায় শিকার ধরে।

ময়ুর, খরগোস ও অন্যান্য জীবজন্তুকে তীরবিদ্ধ করলে যে প্রাণীকে তীরবিদ্ধ করা হয়েছে সেই প্রাণীর নাম ধরে 'জারিহারি' বলে শিকারী দল চেঁচিয়ে ওঠে। বড় জন্তুকে তীরবিদ্ধ করলে গ্রামের নামে 'হারি' করা হয়। কোন জন্তুকে তীরবিদ্ধ করে মারলে তার কালি শিকারীরা নিয়ে নেয়। ছোট ছোট প্রাণীকে মারা হলে সামনের

পা 'ফালি' ছাড়িয়ে দেওয়া হয়। 'সেরম' কেটে রাখা হয়। 'সেরম' এর মাংস চার আঙুলের মাপে কেটে দিহরিকে দেওয়া হয়। খরগোস, ময়ূর ও ছোট ছোট পাখি শিকার হলে কেবল সামনের একটি পায়ের ফালি শিকারী ছাড়িয়ে দেয়। এদের কোন অংশ দিহরি পায় না। আবার কোন শিকারী যদি হরিণ তীরবিদ্ধ করে, হরিণ যেদিকে পলায়ন করে সেদিকের পদচিহ্ন পাতা দিয়ে ঢেকে দেওয়া হয় ও পাতাটাকে পাথর দিয়ে চেপে রাখা হয়। তারপর শিকারীরা 'হাঁরি', 'হাঁরি' ধ্বনি তুলে হরিণের পদচিহ্নকে মিটিয়ে দেয়, যতক্ষণ না হরিণ ভূলুণ্ঠিত না হয়। হরিণ ভূলুণ্ঠিত হলে সেখানকার শিকারী দল সামঞ্জস্য করে হরিণের ফালি ভাগ করে নিয়ে নেয়। যদি কোন শিকারী জন্তুকে তীরবিদ্ধ করে এবং অপর একজন শিকারীর তীরে হরিণটি মারা যায়, তাহলে যার তীরে হরিণ মারা পড়েছে সেই শিকারী কেবল 'টটা' ফালি পেয়ে থাকে। আর যে শিকারী প্রথম হরিণটিকে তীরবিদ্ধ করেছিল সে সমস্ত মাংসটাই পায়। তা থেকেই সমস্ত শিকারী 'সেরম' ফালি পায়। সিংহ কিংবা ভাল্লুক শিকারীদের চোখে পড়লে, শিকারীরা পরস্পর ফিসফিস করে বলাবলি করে, এবং তাদের এড়িয়ে চলে। এড়িয়ে চলার সময় কেউ আক্রান্ত হলে নাগড়ার বাদ্য কেবল তিনবার 'ডুগডুগ' করে আওয়াজ তোলা হয়। এটা বিপদ সংকেত। শিকারীরা শোনামাত্র চতুর্দিক থেকে সেখানে জড়ো হয়। তখন সিংহ বা ভালুক ভয়ে শিকারীটিকে ছেড়ে দেয়, না ছাড়লে শিকারীরা সিংহ বা ভালুকটিকে সেখানেই শেষ করে দেয়। শিকারী আক্রান্ত হলে আঘাত লাগলে সঙ্গে সঙ্গেই ওষুধ লাগানো হয়। তারপর আবার শিকার চলে। কোন কোন সময়ে শিকারীরা ভালুক পেয়ে থাকলে লোকজন ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকে বলে তীর ছুড়তে অসুবিধে হয়, তখন তারা ভালুকটিকে লাঠি পেটা করে মারে। অনেক সময় ভালুকটিকে তীরবিদ্ধ করতে না পারলে ভালুকটি শিকারীদের ভিড়ের দিকে গর্জন করতে করতে অগ্রসর হয়, শিকারীকে ভালুক কামড়ালে শিকারীর ভাই বা দাদা কিংবা শিকারীর পরমবন্ধু নিজের জীবন বিপন্ন করে আক্রান্ত শিকারীকে বাঁচায়। এমনও হতে পারে যে শিকারীকে ছেড়ে ভালুক সবাইকে আক্রমণ করতে পারে।

সন্ধ্যা ঘনিয়ে এলে সমস্ত শিকারী 'গিপিতিঃচ্ টাঁণ্ডি' অর্থাৎ তাদের জন্য নির্দিষ্ট শোবার জায়গায় ফিরে আসে। সেখানে শিকারীরা মহুয়ার তৈরি নাড়ু একত্রিত করে সবাই মিলে ভাগ বাটোয়ারা করে খায়। এ সম্পর্কে একটি প্রচলিত কাহিনী আছে। এক গরিব শিকারী শিকারে গিয়ে ডুমুরের নাড়ু নিয়ে এসেছিল। তার চাল ডাল ছিল না। গিপিতিঃচ্ টাঁণ্ডিতে সে ডুমুরের নাড়ু এনেছে বলে তাকে দলে কেউ নিল না। গ্রামের শিকারীরা তাকে বলল—তুমি যা নিয়ে এসেছ, তা তুমি একাই খাও। বেচারা তা

খেয়েই থাকল। পরের দিন সে একটি 'মুরুম'কে তীরবিদ্ধ করল এবং গ্রামের নামে 'হৗরি' না দিয়ে ডুমুরের 'হৗরি' দিল। 'মুরুম' ভূলুণ্ঠিত হল। গ্রামের শিকারী দল সেখানে উপস্থিত হল, এবং বলল আমাদের শিকার! অমুক মেরেছে। তখন দেশের শিকারীদল সেই গরিব শিকারীকে জিজ্ঞাসা করল—কেন তুমি ডুমুরের হৗরি দিয়েছ? তখন সে দেশশুদ্ধ শিকারীদের সামনে তার মনের দুঃখের কথা জানাল এই বলে যে—গতরাত্রে নাড়ু ভাগাভাগির সময় আমাকে পৃথক করা হয়েছিল। সেইজন্য আমি গ্রামের নামে 'হৗরি' না দিয়ে আমার আনীত ডুমুরের নাড়ুর নামে 'হৗরি' দিয়েছি। গরিব শিকারীর এই কথা শুনে সমগ্র দেশের শিকারীদলকে দিহুরি ভৎর্সনা করল। গ্রামের শিকারীদলের মর্যাদা হানি হল। গ্রামের শিকারী দলকে জরিমানা দিতে হল। তখন থেকে যে যা খাবার নিয়ে আসে তা একত্রিত করে সমভাবে বণ্টন করে খাওয়া হয়। তারপর নাড়ু খাবার পর শিকারীর দল রান্নাবান্না করে। যেখানে তারা 'ডেরা' গেড়েছে তার আগুন দেখলে মনে হয় যেন গোটা বনই পুড়ছে। আলোয় আলোময় হয়। কেউ কেউ ভাত রান্না করে আবার কেউ কেউ খরগোস, ময়ূর ইত্যাদি ঝলসিয়ে মাংস তৈরি করে। ঠ্যাং ও পেট রান্না করা হয়। বাকি মাংস কাটা হয় না। রাত্রে খাওয়া দাওয়া করার পর দিহুরি সম্মেলন ডাকে। প্রত্যেকটি শিকারী দল থেকে অন্তত ৫।৬ জন করে প্রতিনিধি সম্মেলনে যোগদান করে। যারা সম্মেলনে যায় না তারা বাঁশী বাজায়, বন সঙ্গীত (অর্থাৎ অশ্লীল ভাষায় সঙ্গীত) গায়, কেউ কেউ নাটকীয় সংলাপ পরিবেশন করে। আবার কেউ কেউ নাটকীয় ভঙ্গিতে বিভিন্ন প্রকার কাহিনী পরিবেশন করে। দিহুরি যে গ্রামের অধিবাসী সেই গ্রামের শিকারীরা দাঁসায় নৃত্য পরিবেশন করে এবং প্রত্যেকটি শিকারী দলের আখড়ায় যায়। তারা দাঁসায় নৃত্যকারীদের কিছু কিছু চাল দেয় এবং নানা ধরণের হাস্যকৌতুক রস পরিবেশন করে। আমোদ-প্রমোদে সবাই আনন্দে আত্মহারা হয়।

ল-বির-মহাসম্মেলন—দিহুরি হচ্ছেন জাতীয় শিকারের মাঁঝহি বা প্রধান। দেশের মানুষ হচ্ছে তার প্রজা। দিহুরি যেখানে মহাসম্মেলন ডাকে তাকে ল-বির বৗইসি' বলে। দেশের মানুষ দলে দলে সমবেত হয়। দেশের মাঁঝহি, পারাণিক নায়কে, গডেত, দেশমাঁঝহি, পারগাণা সবাই এসে সমবেত হয়। দিহরি তাদের মাঝখানে বসে। যারা সমাজের গণ্যমান্য ব্যক্তি তারা দিহুরির পাশে বসে। তারপর দিহুরি দেশবাসীর উদ্দেশ্যে ভাষণ দিয়ে বলে: হে দেশবাসী, যদি তোমাদের কোন দুঃখ, বেদনা, ক্রোধ, অভাব, অভিযোগ থাকে তাহলে তা সবাই একে একে সমবেত দেশবাসীর কাছে

প্রকাশ কর। দিহুরি দেশবাসীকে জিজ্ঞাসা করে, সকলে কুশলে আছে তো? দেশের লোক উত্তর দেয়--তোমার আশীর্বাদে আমরা সকলে কুশলে আছি। দিহুরি বলে : আমরা সকলে ঠাকুরের আশীর্বাদ পাব। তারপর শুরু হয় অভিযোগ উপস্থিত করার পালা। কেউ বলে তার অমুক গ্রামের শিকারীদের সঙ্গে একটি খরগোসকে কেন্দ্র করে বাদ-বিসম্বাদ হয়েছে। দিহুরি তখন উভয় গ্রামের লোককে জিজ্ঞাসা করে। যে ব্যক্তি অভিযোগ নিয়ে এসেছে সে বলে আমি খরগোসটিকে লাঠিতে কাগড়া মেরে ভূলুণ্ঠিত করেছি। অপরজন বলে খরগোসটি আমার কুকুরে ধরেছে। দিহরি উভয়কেই জিজ্ঞাসা করে—তোমাদের কোন সাক্ষী আছে? তখন তারা উত্তর দেয়—হ্যাঁ, অমুক গ্রামের শিকারীরা দেখেছিল। দিহরি সাক্ষীদের ডাকে। একে একে, উভয় সাক্ষীকে জিজ্ঞাসাবাদ করে। প্রথমে খরগোসটিকে যে ব্যক্তি মেরেছে তা প্রমাণ হলেই প্রথম ব্যক্তিকে উক্ত খরগোসটিকে দেওয়া হয়। দেশের মানুষ বিচারে দিহরিকে সহযোগিতা করে। দিহরির আদেশ সকলে মানে। যদি উক্ত শিকারীদ্বয়ের কোন সাক্ষী না থাকে কিংবা সাক্ষীরা মিথ্যা জবাব দিলে দিহরি পরের দিন সকালে বাদী ও বিবাদীর দুটি তীর মাটিতে খাড়াভাবে রাখে। দিহরি তীর দুটিতে সিন্দুর লাগায় এবং ঘটির জল ধরে দাঁড়ায় ও মন্ত্র পড়ে : হে ঈশ্বর, হে ঠাকুর, তোমার উপর বিশ্বাস রেখে আমরা বিচার করছি। বাদী ও বিবাদী আমাদের বিচার মেনে নেয়নি, তুমিই সর্বত্র বিরাজমান, বাবা ঠাকুর, আর আমরাও পৃথিবীর সর্বত্র বিচার করে আসছি। এই বিচার ঠিকমত হয়নি। বাদী-বিবাদীর ঘটনা তুমিই একমাত্র জান। তুমিই এদের বিচার কর ঠাকুর। তখন দিহরি ও দেশের লোকে বাদী ও বিবাদীকে বলে—সূর্য দেবতাকে প্রার্থনা করে তোমাদের মাটিতে পোঁতা তীর তুলে নাও। আমরা দেশের মানুষ, আমরা নিরুপায়, যাও, একে একে তোমাদের তীর তুলে নাও, তোমরা আমাদের ভয় করবে না, ভয় কর ঠাকুরকে।

যে প্রথমে তীর তুলতে যাবে তাকে দিয়ে বলানো হয়—ঠাকুর, যদি আমি অধর্ম করে থাকি, তাহলে এখানে যেন আমাকে সিংহ আক্রমণ করুক ও খেয়ে ফেলুক। আর যদি অধর্ম না করে থাকি তাহলে নির্বিঘ্নে যেন ঘরে ফিরে যাই। একথা বলেই সে তার তীরটি মাটি থেকে তুলে নেয়। দ্বিতীয় শিকারীর সাহস থাকলে অনুরূপ বক্তব্য বলে। অধর্ম করে থাকলে তীর তুলে আনতে সে অগ্রসর হয় না। দিহুরি তখন যেখানে তীর পোঁতা ছিল সেখানে সেই ঘটির জল ঢেলে প্রণাম করার সময় বলে—ঠাকুর, তুমিই এদের প্রকৃত বিচার কর।

সেদিন যদি উভয়েই 'দিবি্য' রেখে থাকে, তাহলে গভীর বনে পাশাপাশি দুজনকে বসান হয়, তখন গভীর বন থেকে সিংহ গর্জন করতে করতে তাদের দিকে অগ্রসর হয় এবং তাদের খুব কাছে চলে আসে। যে ব্যক্তি সত্য কথা বলেছে, তাকে আক্রমণ না করলে সে স্থান ছেড়ে উঠে আসে। সিংহটি তখন দ্বিতীয় ব্যক্তিকে আক্রমণ করে তাকে, ছিন্নভিন্ন করে খেয়ে ফেলে। এরকম অনেক দৃশ্য অনেকে স্বচক্ষে নাকি দেখেছে, সিংহটি যদিও বা দ্বিতীয় ব্যক্তিটিকে আক্রমণ না করে এবং বেঁচে যায় তাহলে শিকারী বাড়ি ফিরে কোন না কোন রোগে আক্রান্ত হয়ে মারা যাবেই।

শিকার সম্পর্কীয় বিচার শেষ হয়ে যাবার পর দিহুরি দেশের বিভিন্ন অভিযোগের বিচার করে। সমস্ত অভিযোগের ফয়সালা দিহুরি দেশের লোকের সহযোগে সমাধান করে। যদি কোন অভিযোগের সাক্ষী পাওয়া না যায় তাহলে পরের দিন সকালে দিবি্য করা হয় এবং পূর্ব ঘটনার অনুরূপ কার্য সাধন করা হয়। সমস্ত প্রকারের অভিযোগ ফয়সালা হয়ে গেলে দিহুরি দেশবাসীর উদ্দেশ্যে বলে হে দেশবাসী, তোমাদের যদি আর কোন অভিযোগ থাকে তাহলে কাল বিলম্ব না করে অভিযোগ পেশ কর। যদি কারও কোন অভিযোগ থাকে একে একে নিজেদের অভিযোগ ব্যক্ত কর। একজন বলে আমাকে গ্রামের মাঁঝহি ও পঞ্চজন ভদ্রমণ্ডলী অমুক ব্যাপারে অযথা জরিমানা করেছে। কিংবা পারগাণা বা মাঁঝহিদের জমি সংক্রান্ত কিংবা কোনও স্বামী-স্ত্রীর কিংবা যুবক-যুবতীদের প্রেম ঘটিত ব্যাপারে গ্রামে বিচার ফয়সালা না হলে দিহুরির কাছে অভিযোগ পেশ করা হয়। কেউ আবার অভিযোগ করে—আমাকে খামকা ডাইনী আখ্যায়িত করে মানহানি করেছে। কেউ বলে বিনা কারণে গ্রামের লোক আমার বাড়ির দরজায় কাঁটা দিয়েছে। এইরূপ বহু অভিযোগ পেশ করা হয়।

'ল-বীর' মহাবিচারালয়ই সাঁওতাল জাতির জনমানসে সুবিচার লাভের শ্রেষ্ঠ প্রতিষ্ঠান। এটাই তাদের সুপ্রীম কোর্ট। সেখানে দেশের মাঁঝহি, পারগাণা, দেশ-মাঁঝহি সকলেই উপস্থিত থাকেন। সেখানে সমাজের কোন উর্দ্ধতন কর্তৃপক্ষ চোখ রাঙিয়ে ধমক দিতে পারে না। যদি কোন গ্রামে মাঁঝহি, পারগাণা ও দেশ-মাঁঝহি অন্যায় করে থাকে তারও বিচার সেখানে হয়। যদি কোন উর্দ্ধতন কর্তাব্যক্তি বিচারে হেরে যায় তবে সে নতমস্তকে বাড়ি ফিরে যায়। যদি কোন ব্যক্তি বা উর্দ্ধতন কর্তৃপক্ষ গুরুতর অন্যায় করে ও ল-বীরে না যায়, তখন দিহুরির আদেশে দেশের মানুষ তাদের বাড়ি চড়াও হয় ও তাদেরকে জরিমানা করা হয়। গ্রামে মাঁঝহি পারগাণা, কাউকে ধমকানি দিতে পারে কিন্তু এখানে তারা ধমক দিতে পারে না। সেইজন্য প্রত্যেক সাঁওতালদের 'ল-বীর' বিচারালয়ের উপর অনেক ভরসা থাকে।

বিচার শেষ হয়ে গেলে 'ডু'গাড়' নাচ শিকারীরা করে এবং বন-সঙ্গীত গাওয়া হয় ও বাঁশী বাজানো হয়। সারারাত নৃত্যগীতি চলে। পরের দিন সকালে ভাত রান্নাবান্না করে শিকারীরা খায়। অবশিষ্ট যে মুরগির বাচ্চাগুলো থাকে দিহুরি সেগুলো বনদেবতার উদ্দেশ্যে বলি দিয়ে পূজো করে। তারপর শেষবারের মত সেই বনে উল্টো দিক থেকে ঢুকে শিকার করা হয়। দুপুর কিংবা তার কিছু পরে বনের শিকার সমাপ্ত করে সমস্ত শিকারী দল শিকার ধরতে ধরতে নিজ গ্রামের দিকে অগ্রসর হয়।

প্রাচীনকালে পাঁচদিন পর্যন্ত এক নাগাড়ে শিকার করা হত। কিন্তু আজকাল সে রকম বন না থাকায় দু একদিনের মধ্যেই শিকার শেষ করে। তখনকার দিনে কোন শিকারের দল শিকার থেকে কোন গ্রামের মধ্যে দিয়ে ফিরলে সেই গ্রামের মেয়েরা শিকারীদের পা ধুইয়ে দিত এবং শিকারীরা মেয়েদের মাথায় 'চম্পা' ফুল গু'জে দিত এবং প্রীতি জহার বা নমস্কার বিনিময় করত। গ্রামের লোক শিকারীদের মহুয়ার নাড়ু দিয়ে জল খাওয়াত। এখন সে সব আর নেই। শিকারীরা নিজেদের বাড়ি ফিরে এলে শিকারীর স্ত্রী বা বোন পা ধুইয়ে দেয় এবং প্রণাম করে। বাড়ীর লোকের সৌভাগ্য যে তারা তাদের প্রিয়জনকে পুনরায় ফিরে পেয়েছে। সাঁওতালীতে প্রবাদ আছে মেয়েদের বিপ্ন সন্তান প্রসবে, পুরুষের বিপদ শিকারে।

পা ধুয়ে শিকারীকে খেতে দেওয়া হয়। খাওয়ার পরে শিকারের মাংস ভাগাভাগির জন্য শিকারীরা একত্রিত হয়। তীর বিদ্ধকারী শিকারীকে 'মাঁদাল' দেওয়া হয়। এ ছাড়া সে পায় মাথার একটি অংশ। পিলে ও পেটের এক অংশ তীর বিদ্ধকারী শিকারী পায়। এ ছাড়া বাদবাকি মাংসকে 'হুগুই' (৩ অংশ) করা হয়। গ্রামের নায়কেকে 'হুগুইর' মাংস ও এক টুকরো মেটে দেওয়া হয় পুজোতে ভোগ দেওয়ার জন্য, মাঁঝহি তীর বিদ্ধকারীর 'মান্দাল' থেকে অংশ পায় আর পায় উরুর মাংস। উরুর নীচের অংশ মাঁঝহি পায়, তার উপরের মাংস পায় পারাণিক। আর পায়ের দিকের শেষ অংশটুকু পায় গড়েত। যে নাগড়া বাদক সে 'হুগুইর'ই এক অংশ পায়। অবশিষ্ট সমস্ত মাংস শিকারীরা সমানভাবে ভাগাভাগি করে নেয়। আর যারা শিকারে যায়নি তাদের জন্য কিছু অংশ সমানভাবে ভাগ করে ঘরে ঘরে দিয়ে আসা হয়। তাকে 'চাপে জোড়া' বলা হয়। খরগোস কিংবা ময়ুরের মাংসের কোন অংশ নায়কে কিংবা মাঁঝহি কেউ পায় না, চাপো জোড়োও মাঁঝহি পায় না। কেবল তীরবিদ্ধকারীর মান্দালের অংশ ছাড়া মাঁঝহি আর কিছুই পায় না। যারা শিকারের মাংস বয়ে নিয়ে আসে তারা পায় পেট ও নাড়ী-ভু'ড়ি, তাকে বলা হয় 'কুঃকুটুংপটা' আর পায় পশুপাখীর 'কুণ্ডি'।

নায়কে পূজোর ভোগের জন্য যে মাংস নিয়ে যায় তা শুকনো পাতায় জড়িয়ে পোড়ায়

এবং মড়েকো তুরুইকো, পারগাণা হাড়াম, মাঞ্জহি ও মারাংবুরু প্রভৃতি দেবতাদের উদ্দেশ্যে ভোগ দিয়ে পূজো দিতে। ভোগ দেওয়ার পর নায়কে কেবল মাংসটাই খায়। মাঞ্জহিকে পাঁচ পায় চাল দিতে হয়। শিকারীরা সেই চাল মাথার মাংসের সঙ্গে খিচুড়ি করে সকলে মিলে খায়। শিকারীরা নিজের অংশ নিয়ে বাড়িতে প্রত্যাবর্তন করে।

তীর বিদ্ধকারীর 'মান্দাল' ও মাঞ্জহির 'ডুণ্ডে' আনা হয়। 'ডুণ্ডে' মাঞ্জহির বাড়িতে ও 'মান্দাল' তীর বিদ্ধকারীর বাড়িতে আনা হয়। যারা শিকারের মাংস বহন করে নিয়ে আসে তারা মাঞ্জহি ও তীরবিদ্ধকারীর বাড়িতে মদ ও মাংস-ভাত পায়। তীরবিদ্ধকারীর বাড়িতে 'মান্দাল' থেকে 'খাণ্ডা' মাংস 'ন'াস' থেকে পৃথক করা হয়। ঐ মাংস তীর বিদ্ধকারীর বোন ও তার মেয়েরা পায়। বোন ও মেয়ের যত দূরেই বিয়ে হোক না কেন, তীরবিদ্ধকারী শিকারী নিজেই বোনকে বাড়ীতে আপ্যায়ন করে ও মদ খাওয়ায়। বোন ও মেয়েরা সম্মানবোধ করে ও আনন্দিত হয়। মাথা ও মেটের অংশ তীরবিদ্ধকারী নিজে খিঁচুড়ি তৈরী করে পূর্বপুরুষদের উদ্দেশ্যে ভোগ দেয়।[১৮]

অযোধ্যা পাহাড়ে শিকার উৎসব

সাঁওতাল সমাজ বিভিন্ন জায়গা থেকে বিতাড়িত হয়ে যে সব জায়গায় বসবাস স্থাপন করেছিল, সে সব জায়গার জঙ্গলে তাদের জাতীয় শিকার উৎসব বজায় রেখেছিল, সাঁওতাল পরগণায় চলের আসার পর ছোটনাগপুরের বিভিন্ন জঙ্গলে তারা শিকার করত। মানভূম জেলা যখন বিহারে ছিল তখন মানভূমের অযোধ্যা পাহাড়ের জঙ্গলে তারা শিকার করত, বিচার সভা বসাত। ১৯৫৬ সালে ভাষাভিত্তিক রাজ্য গঠনের লক্ষ্যে রাজ্য পুনর্গঠন কমিশন যখন সাঁওতাল পরগণাকে দ্বিখণ্ডিত করল। যখন এই পরগণার মানভূমের কিছু অংশকে পশ্চিমবঙ্গের আওতায় নিয়ে এল তখন থেকে সাঁওতালদের বৃহৎ গোষ্ঠী পশ্চিমবঙ্গের মধ্যে চলে এল। বিহারের অযোধ্যা পাহাড়ও চলে এল পশ্চিমবঙ্গের আওতায়। ফলে প্রতিবছর বুদ্ধপূর্ণিমার দিন অযোধ্যা পাহাড়ে শিকার উৎসব সাঁওতালরা করছে।

অযোধ্যা পাহাড় পুরুলিয়া শহরের দক্ষিণ-পশ্চিম অংশে। অযোধ্যা পাহাড় এর আয়তন ৯৮'২০ বর্গ কিঃ মিঃ। উচ্চতা ১২০০ ফুট। সবচেয়ে উচু শৃঙ্গ গর্গবুরু ২২০০ ফুট। এর আশপাশে অনেক শৃঙ্গকে মাথা উঁচু করে দাঁড়িতে থাকতে দেখা যায়। এরা হল চেমট, গজাবুরু, মাঠাবুর, উজ্জলভুংরী, পানগাড়া ও চন্দনপানি ইত্যাদি।

বাগমুণ্ডিতে যাওয়ার পথে অযোধ্যার মোড়, পুরুলিয়ার দিকে আড়ষা বা শিরকাবাদ যেদিক থেকে অযোধ্যাকে দেখা যাক। দেখবেন কখন কচ্ছপের মত, কখন শূয়োরের পিঠ। ওঠার পথ খাড়াই হলেও ওপরে সমতল। পাহাড়ের ওপরে দাঁড়িয়ে মনে হবে না পাহাড়ে দাঁড়িয়ে আছি। অযোধ্যার মোড় দিয়ে গেলে কিছুটা ওঠার পর সামনেই পড়বে সুন্দর ঝরণা। নাম টুরগা। টুরগা ফল্‌স বলেই এর পরিচিতি। লরি বা গাড়ি যাওয়ার রাস্তার ধারেই এর অবস্থান। গরমে এর জল শুকিয়ে কাঠ। বর্ষায় আবার শুরু হয় ঝরণার কল্লোল। আজও কিছুটা উঠলে ডান দিকে পড়বে 'ওয়াচিং টাওয়ার।' ফরেস্ট ডিপার্টমেণ্ট থেকে এটা করা হয়েছে। বন থেকে কাঠ চুরি, বা হাতির দল আসছে কিনা দেখার জন্য, পাহাড়ে মোট ৭৮টা গ্রাম আছে। এছাড়া আরও আছে যেগুলোর খোঁজ খবর এখনও সরকারি, বেসরকারি, কোন তরফে নেওয়া হয়নি। এখানে যাঁরা বাস করেন তাঁরা সবাই আদিবাসী। আদিবাসী বলতে সাঁওতাল, পাহাড়িয়া, হো, মুণ্ডা, বীরহোড় গোষ্ঠীর লোক। এঁদের মধ্যে সাঁওতাল লোকসংখ্যা সবচেয়ে বেশি। আর কিছু আছেন মাহাতো, কুমোর গোষ্ঠী। ১০০ বছর আগে বা ৩০ বছর আগে এখানে মানুষ বাস করার অনুপযুক্ত ছিল। মানুষের বদলে জন্তু জানোয়ারের সংখ্যাধিক্য ছিলই বেশি। এক সময় এই বন থেকে বাঘ, চিতা, ভাল্লুক শিকার করেছে সাঁওতালরা। আজ একটা খরগোস, হরিণ, বুনো শুয়োর, ময়ূর ছাড়া হিংস্র জন্তু মেলা ভার। এখন অযোধ্যা পাহাড়ে গেলে দেখবেন সরকারি অফিস, হেল্‌থ সেণ্টার, বন বিভাগের দপ্তর হয়েছে। এসব সম্ভব হয়েছে খৃষ্টান মিশনারী লুথারিয়ান ওয়াল্ড সার্ভির্সের দৌলতে। লুথারিয়ানরা জঙ্গল হাসিল করে পাহাড়ের পাথুরে মাটির বুক চিড়ে বানিয়েছে রাস্তা। স্বচ্ছন্দ গতিতে উঠে যেতে পারবেন গাড়ি চালিয়ে পাহাড়ে। লুথারিয়ান মাত্র কয়েক বছর ছিল পাহাড়ে। ১৯১৫ থেকে ১৯২২। এর পর দেশ জুড়ে আদিবাসীদের মধ্য থেকে বিভিন্ন দাবি দাওয়া উঠতে থাকায় দেশের মানুষ ভাবলেন এটা মিশনারীদের কাজ। সরকারও ভাবলেন। আদিবাসীদের মদত দিচ্ছে মিশনারী সংগঠনগুলো। অগত্যা বন্ধ হল ঐ সব এলাকায় কাজ করা। সরকার দায়িত্ব দিলেন 'কম্প্রিহেন্‌সিভ এরিয়া ডেভেলপমেণ্ট কর্পোরেশন' সংক্ষেপে CADC সংগঠনকে। ১৯৮২-র পর থেকে পাহাড়ের হালচিত্র অনেক পাল্টে গেছে। একসময় পাহাড়ের সাঁওতালরা বা আদিবাসীরা জানত না যে তাদের স্বজাতি নিচের গ্রামগুলোয় আছে। লুথারিয়ান সেই যোগাযোগটাও করে দিয়েছে। সম্পূর্ণ না হলেও ধীরে ধীরে উন্নতির পথে এগোচ্ছে অযোধ্যা পাহাড়ের আদিবাসীরা। যত উন্নতি হচ্ছে, গাড়ি লোকজন চলাচল বাড়ছে ততই জঙ্গল ফিকে হয়ে আসছে। আর এর ফলে শিকার উৎসবেও ভাটা পড়ছে।

মাত্র ১০ বছর আগে শিকারের যে উন্মাদনা ছিল এই অঞ্চলে এখন তার তীব্রতা কম।

সাঁওতালরা তাদের জাতীয় শিকারের সমস্ত রকম নিয়ম কানুন এখনও মেনে চলছে। জঙ্গলে জঙ্গলে শিকার করার পর বুদ্ধপূর্ণিমার দিন সকালে তারা পাহাড়ের ওপর অযোধ্যা গ্রামের মধ্যে 'সীতাচাটান' নামে এক জায়গায় শিকার নিয়ে এসে জমায়েত হয়। কথিত আছে রামচন্দ্র বনবাসে যাবার সময় লক্ষ্মণ ও সীতাকে নিয়ে কয়েক মুহূর্ত এখানে বিশ্রাম করেছিলেন। সীতার জলতৃষ্ণা মেটাতে তিনি তীর ছুড়ে মাটি ফুঁড়ে জল বের করেছিলেন। এখন সেটা ছোট পুকুরে পরিণত। সেই থেকে এই জায়গাটার নাম সীতাচাটান। সাঁওতালরা নিজেদের রামের বংশধর মনে করে বলেই রামের প্রতি তাদের ভক্তি লক্ষ্য করা যায়। সীতাচাটানে শিকারীরা ভাতরান্না করে খাওয়া দাওয়া করে। সন্ধ্যে হতে না হতেই শুরু হয়ে যায় আনন্দ 'জোয়ার'। মদ-হাঁড়িয়ার নেশায় বুদ হয়ে আদিরসাত্মক গান গায়, অঙ্গভঙ্গি করে। উলঙ্গ হয়ে নাচে, মেয়েদের গোপনাঙ্গের বর্ণনা দিয়ে গান গায়, সঙ্গম-সম্পর্কিত কথা বলে, সুরসুরি দেয়। বলা হয়, যৌবনের দীক্ষা একটি সাঁওতাল যুবক এখান থেকেই পেয়ে থাকে। জীবনে একবার অন্তত একজন সাঁওতাল যুবককে শিকার উৎসবে অংশগ্রহণ করতেই হবে। ভোরবেলায় সবাই ফিরে চলে গ্রামের পথে। বাড়ির মেয়েরা পথ চেয়ে বসে থাকে। ঘরের পুরুষ শিকার থেকে ঘরে ফিরেছে এই আনন্দে তারা মেতে ওঠে। শিকারীদের তারা পা ধুইয়ে বরণ করে ঘরে ঢোকায়। শিকারিরা মেয়েদের কাছে শিকার করার বীরত্বের কথা শোনায়। কিন্তু কালের পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে পশ্চিমবঙ্গের সাঁওতালদের এমন কি গোটা সাঁওতাল সমাজের নিজ বিচার সভা ল-বীর সম্মেলন বন্ধ হয়ে গেছে। শিকার উৎসবে আর বিচার সভা বসে না। লোকশ্রুতি যে একশো বছর আগে এই অযোধ্যা পাহাড়ের শিকার উৎসবের সময় সীতাচাটানের বিচার সভায় মৃত্যুদণ্ডও দেওয়া হয়েছিল।

সাঁওতালদের এই বিচার কেন বন্ধ হল? তা আজও জানা যায়নি? তবে অনুমান আইন ব্যবস্থা জোরদার, অঞ্চলে অঞ্চলে পঞ্চায়েতী ব্যবস্থা চালু হওয়ায় এখন সব বিচার ওখানেই হচ্ছে। সাঁওতালরা আলাদা করে সর্বোচ্চস্তরের বিচার সভা বসাচ্ছে না। কিন্তু ছোটখাটো বিচার সভা তারা এখনও করে থাকে। সাঁওতাল সমাজের বিচার পদ্ধতি বহু যুগের। ইংরেজরা যে বিচার ব্যবস্থা চালু করে গেছেন এবং আমরা যে বিচার ব্যবস্থার সঙ্গে বর্তমানে পরিচিত তা এই সাঁওতাল সমাজ থেকেই নেওয়া। ছোট থেকে বড় কোর্ট হয়ে হাইকোর্ট হয়ে সুপ্রীম কোর্ট পর্যন্ত যেমনভাবে বিচারের ধারা চলছে। সাঁওতালদের বিচার পদ্ধতিও প্রাচীনকালে একইভাবে চলে আসছে।

গ্রামসভা, অঞ্চল, পরগণা হয়ে দিশম মাঝি অর্থাৎ শিকার উৎসবের সময় অনুষ্ঠিত ল-বির সম্মেলন পর্যন্ত গিয়ে বিচার শেষ হয়। এখানে গিয়ে বিচারের নিষ্পত্তি ঘটত। কামৌ ল-বির সম্মেলন ছিল সাঁওতালদের কাছে এখনকার সুপ্রীম কোর্টের পর্যায়ে। একথাটা জোরের সঙ্গে বলতে পারি যে, ইংরেজরা ভারতের আধিপত্য গড়ার সময় সাঁওতালদের জীবনযাত্রার সঙ্গে খুবই ঘনিষ্ঠ ছিল। ইংরেজ লেখক, বুদ্ধিজীবীরা এদের জীবনযাত্রা সম্পর্কে প্রত্যক্ষভাবে জড়িত ছিল বলে ভারতের বিচার ধারাও তৈরি করে গেছে ঠিক ওদেরই কায়দায়।

যাইহোক, পশ্চিমবঙ্গ সরকার পশুহত্যা বন্ধ করার জন্য অনেক চেষ্টা চালিয়েছিলেন। কিন্তু সাঁওতালরা তাদের প্রাচীন ঐতিহ্য থেকে একপাও বিচ্যুত হতে রাজী নন। ঐ দিনটা তারা শিকার করবেই। সারা পশ্চিমবঙ্গে তো বটেই, সুদূর বিহার, আসাম থেকেও সাঁওতালরা শিকার করতে আসবেই এদিন। দুদিন আগে কলকাতার হাওড়া, এবং বিহারের দিক থেকে আগত ট্রেনগুলোয় সাধারণ যাত্রীদের চলাফেরা করা দুরূহ হয়ে ওঠে। অস্ত্র-সস্ত্রে সজ্জিত হয়ে হাজার হাজার সাঁওতাল শিকার করতে অযোধ্যা পাহাড়ের জঙ্গলে যায়। এই হল শিকার উৎসবের বৈশিষ্ট্য।

শিকার উৎসবের পর আসি ধর্ম ও দেবদেবী সম্পর্কে। কারণ ধর্ম ও দেবদেবী সাঁওতাল সমাজের ভাগ্য নির্ধারণের একমাত্র পথ। লৌকিক আচার, কুসংস্কার সবই এর ওপর নির্ভর করে।

সাঁওতালরা মনে করে এই যে বেঁচে থাকা, এই যে জীবন যাত্রা, চলাফেরা, সুখ, দুঃখ সবই নিয়ন্ত্রণ করছে তাদের দেব-দেবীরা। সুতরাং দেব-দেবী না মানলে, ধর্মকে না মানলে সমাজ ধ্বংস হয়ে যাবে।

দেব-দেবীর প্রশ্ন আসছে এই কারণে যে ডাইনীর সঙ্গে দেবদেবীর সম্পর্কে রয়েছে। পরবর্তী অধ্যায়টি পড়লে এ বিষয়ে আরও তথ্য জানা যাবে।

ঃ সূত্র নির্দেশিকা ঃ

১। Linguistic Survey of India—G. A. Grierson Vol 4. পৃঃ ২৩৪

২। (ক) পশ্চিমবঙ্গের আদিবাসী সমাজ—ধীরেন্দ্রনাথ বাস্কে পৃঃ ১৭১

(খ) Descriptive Ethology of Bengal—E. T. Dalton. পৃঃ ৪৫০

৩। ভাষা ও সাহিত্যের ইতিহাস—ডঃ সুনীতি চট্টোপাধ্যায়

৪। Descriptive Ethology of Bengal—E. T. Dalton. পৃঃ ৪৫০

৫। পশ্চিমবঙ্গের আদিবাসী সমাজ—ধীরেন্দ্রনাথ বাস্কে পৃঃ ১৭১

৬। পশ্চিমবঙ্গের আদিবাসী সমাজ—ধীরেন্দ্রনাথ বাস্কে পৃঃ ১৭২—১৭৩

৭। সাঁওতাল সংস্কৃতি—তুরবীন সরেন পৃঃ ৫

৮। Selected Papers—Dr. Suniti Chatterjee Vol. 1 পৃঃ ৩০

৯। The Tribes and castes in Bengal—Risles

১০। সাঁওতাল সংস্কৃতি—তুরবীন সরেন পৃঃ ১০

১১। ,, ,, ,, পৃঃ ১০

১২। সংস্কৃতি, সাহিত্য, ইতিহাস—ডঃ সুনীতি চট্টোপাধ্যায়

১৩। (ক) সাঁওতাল সংস্কৃতি—তুরবীন সরেন পৃঃ ১০

(খ) Descriptive Ethology of Bengal—E. T. Dalton. পৃঃ ৪৫১

১৪। Linguistic Survey of India. Vol IV পৃ. ৩৩০

১৫। Descriptive Ethology of Bengal—by E. T. Dalton পৃঃ ৪৫২

১৬। ,, পৃঃ ৪৫২

১৭। ,, পৃঃ ৪৫৩

১৮। সাঁওতাল সংস্কৃতি—তুরবীণ সরেন পৃঃ ১৯৮

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

দেব-দেবী

দেবতাদের সম্পর্কে বয়োবৃদ্ধ কালয়ান তাঁর 'হড়কোরেন মারে হাপড়ামকো রেয়াঃক কথা' অর্থাৎ 'পূর্বপুরুষদের কথা'তে বলেছেন দেবতাদের মধ্যে সিঞ ও বোঙ্গা বা বঙ্গা আমাদের বড় দেবতা, তারপরে 'জমসিম বঙ্গা' তারপরে 'মারাংবুরু' (এর আসল নাম লিটা) তারপরে জাহের এরা' (আসল নাম রামসাল্‌পি) এর পিছনে ম'ড়ে'কোঁ, (তুরুইকোদেরও নাম করি, কিন্তু পূজা করি না), এদের পরে গোস'াএ এরা, তারপর পারগানা বুড়া, তারপরে মাঝি হাড়াম বঙ্গা, তারপর ঘরের বঙ্গা আর তারপর আবগে বঙ্গা। এসব বাদে আরও বঙ্গা আছে (যেমন ধনী হতে ইচ্ছুক লোক 'কি স'াড় বঙ্গার পূজা করে, সিমা বঙ্গা স্থঃৎ বঙ্গা", ডাডি বঙ্গা (কুয়োরদেবতা) 'হুরুৎখুন্টুঃৎ বঙ্গা (গাছের গুড়িতে বা খুটিতে থাকে), বনের দেবতা, পাহাড়ের দেবতা ইত্যাদি আছে।

আবগে বোঙ্গা অনেক বেশি। প্রত্যেক 'পারিসের' আলাদা আর অড়াঃ (ঘরের) বঙ্গাও (দেবতা) ঐরকম। এক পারিসেরও (গোত্রের মিল খায় না আর আলাদা পারিসেরও কিছু কিছু মিল হয়। আবগে দেবতা আর ঘরের দেবতার নাম বাইরের লোকের কাছে বলে না আর তাদের স্ত্রীদেরও বলবে না। শুধু বুড়ো মানুষ মরবার সময় বড় ছেলেকে নাম কানে কানে বলে যাবে। আমরা গুরু লোকেরা আদি থেকেই সব পারিসের 'আবগে' আর ঘরের দেবতার নাম জানি। কতক হাঁসাদঃদের আবগে হচ্ছে ধারাসে'ড়ে, কিংবা ধারা সাণ্ডা। (নিজ হাঁসদাঃ) আর কাটকম কুদরা, আর ঘরের দেবতা হচ্ছে বাঁশপাহাড়, আর দেশোয়ালি, কিস্কুদের আবগে হল চাম্পাদানা গাড়' আর ঘরের দেবতা হল 'স'স্‌', হেমব্রমদের 'আবগে' হল গাড়সিংকা' আর 'লীলা চাণ্ডী', আর ঘরের দেবতা হল গুরাইয়া মাণ্ডিদের আবগে দেবতা হল ধানঘারা আর ঘরের দেবতা হল গুরাইয়া. মুমুদের আবগে দেবতা হল কুদরাচাণ্ডি, বাহাটা, দুয়ার স'এড়ে, কুদরাজ আর গোসাত্র বাত্র আর ঘরের দেবতা হল 'বাটপাহাড়', সরেনদের আবগে দেবতা হল 'আচরালি', আর ঘরের দেবতা হল গুরাইয়া আর সারচাণ্ডি, টুডুদের আবগে দেবতা হল ধানঘারা, আর ঘরের দেবতা হল 'ঠুন্টা তুরসা', বাস্কেদের আবগে দেবতা হচ্ছে 'দেশোয়ালি' আর ঘরের দেবতা হল 'বাটপাহাড়' আর বেশরাদের আবগে দেবতা হল 'চাম্পাদানাগাড়,' আর ঘরের দেবতা হল 'স'স্‌', পাঁউরিয়া আর চঁড়েদের আবগে দেবতা ভুলে গিয়েছি।

'জমসিম' দেবতাও সবার আলাদা আলাদা। কারুর বা 'পান বড়' কারুর বা 'আনহড়' কারুর বোঙ্গাবাজি, কারুর 'সেওরানি', কারুর 'থাম্বাং মারাং', আর কেউ বা 'বাচহা আহাং' বলে জমসিম দেবতাকে। ওঝাদের দেবতা হল 'সিঞবোঙ্গা', কামরাং বুরু, কামরু গুরু, সিধা গুরু, গোঁসাই গুরু, মহবক গুরু, সুহাং গুরু, মিছু গুরু ইত্যাদি। এছাড়া আরও অনেক গুরু কবিরাজী শিখেছে। 'কিঁসাড়' দেবতাও সকলের আলাদা। এক 'কিঁসাড়' দেবতার নাম হল 'কালচাওরা'। কিঁসাড় দেবতা পরের ধান চুরি করে নিজেদের মালিককে এনে দেয়। কখন কখন কিঁসাড় দেবতাদের মধ্যে ছাড়াছাড়ি হয়। সবচেয়ে যে বেশি বলবান, তার মালিকের বেশি ধান হয়। অনেক সময় কিঁসাড় দেবতা তাড়া খেয়েছে। একদিন এক লোকের খামার থেকে কিঁসাড় দেবতা ধান কাঁধে করে নিয়ে যাচ্ছিল, ঠিক সেই সময়ে ধানের মালিক এসেছে, আর চুরি করেছে বলে হাত্‌বাত্‌ ঢেলা মেরে মেরে নিয়ে গেল। মালিকের ঘর পর্যন্ত খেদিয়ে নিয়ে গেল। সেই দেবতা (বেড়াল হয়ে) ঘরের মধ্যে ঢুকে হাড়্‌হুড়্‌ ভিতরে চারিদিকে ছুটে বেড়াচ্ছে দেখা গেল। সব হাঁড়িকুড়ি ভেঙ্গে ফেলল। সেই লোক যে তাড়িয়ে নিয়ে গেছিল, মালিককে ডেকে তুলে খুব গালাগাল করল, তাকে বলল—এই যে তোমার চার দেবতা ঘরের মধ্যে খেদে (তাড়িয়ে) ঢুকিয়ে দিয়েছি, কতদিন থেকে যে আমার ধান নিয়ে আসছে—সেইজন্য ধান হয় না। এদিন থেকে ঐ লোকটি তাদের বাড়ি গেলেই দেবতা ভয়ে সমস্ত ভিতরময় পালিয়ে বেড়ায়। ঘরের মালিক ঐ লোকটির কাছে মিনতি করল—আমাদের ঘরে এস না; তোমার ভয়ে দেবতা সবকিছু আমাদের ভেঙ্গে দিচ্ছে।

'জমসিম' দেবতা গোড়া থেকে ছিল না। জমসিমের সময় শুধু সিঞ বঙ্গার পূজা করা হচ্ছিল। আবগ যেমন পূজা করেছিল। খাওয়া-দাওয়ার পর ঘরে যাবার সময় টাঙ্গি ভুলে ফেলে এসেছিল। রাস্তায় সেটা মনে পড়তে একজন আনবার জন্য ফিরে গিয়েছিল। সেই লোকের কাছে সেই জমসিম দেবতা বের হল, ফেলে যাওয়া জিনিস কুড়িয়ে খাচ্ছে। খেতে খেতে দেবতা আপন মনে বলছে—ওঃ, এতক্ষণে আহার করলাম। তারপর লোকটিকে দেখে অদৃশ্য হয়ে গেলেন। লোকটি টাঙ্গি আনল। কিন্তু দেবতার আবির্ভাবের কথা বলল না। তারপরে তাদের মরণ-বাঁচন ভীষণ অসুখ করল। সেই সময় খড়ি দেখাল। ওঝারা বলে দিল কোন দেবতা বোধ হয় তোমাদের মধ্যে আবির্ভাব হচ্ছে। সেই সময় ঐ টাঙ্গি আনা লোকটির মনে পড়ল সেই দিনের কথা যে, সত্যি দেখেছিলাম ভুলে যাওয়া টাঙ্গি আনতে গিয়ে—বলতে 'শুনলাম এতক্ষণে আহাং করলাম।' সেই থেকে দেবতার নাম আহাং রাখল। ওঝারা তাদের বলল—এই দেবতা বলছে জমসিম-এ পূজা দিতে। তখন থেকেই সাঁওতালেরা মানছে, পূজা করছে। সিঞ বোঙ্গা বা সূর্যদেব কারুর অকল্যাণ করে না। সমস্ত বিপদ-আপদ থেকে তিনি রক্ষা করেন। সাঁওতালরা অনেক সময় সিঞ বোঙ্গার দোহাই দিয়ে থাকে। 'জমসিম' উৎসবে সিঞ বোঙ্গার উদ্দেশ্যে পূজা দেওয়া হয়।

'ম'রেকো-তুরুইকো'-কে পূজা করা হয় ভাল বৃষ্টি, ভাল ফসল এবং রোগ ব্যাধি থেকে রক্ষা পাবার জন্য। 'জাহের থান'-এর দেবী হলেন জাহের-এরা। তিনি কারও অনিষ্ট করেন না। জাহের থানে তাঁর নামে একটি শাল গাছ থাকে, তিনি সেখানেই অধিষ্ঠান করেন। গ্রামের মঙ্গলের জন্য প্রতি উৎসবে সেখানে তাঁর নামে একটি মুরগি উৎসর্গ করা হয়। জাহের-এরার পরই গোসাই-এর জাহের থানে তাঁর নামে একটি মহুয়া গাছ থাকে। পূজার সময় নায়ক তার নামে একটি মুরগি উৎসর্গ করে। 'সীমাবোঙাকে সাঁওতালরা প্রত্যেকেই ভয় করে। সেজন্য প্রতি বছর গ্রামে তাঁর নামে পূজা দেওয়া হয়। খুব সাবধানে সীমাবোঙার পূজা করা হয় এবং কুডাম নায়কে এ সময় 'বুল মায়াম' অর্থাৎ নিজের শরীরের রক্ত সীমাবোঙার উদ্দেশ্যে নিবেদন করেন। সীমাবোঙাকে সন্তুষ্ট না রাখলে কিংবা পূজায় কোন ত্রুটি হলে গ্রামে নানারকম রোগ দেখা যায়। সাধারণতঃ বছরে দুবার এই দেবতার নামে মুরগি উৎসর্গ করা হয়।*

*সাঁওতাল সংস্কৃতি—চুরবীন সরেন এবং পশ্চিমবঙ্গের আদিবাসী, সম্পাদক—ধীরেন্দ্রনাথ বাস্কের বই থেকে গৃহীত।]

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

[ওঝা, পথা ও জানগুরুর ভূমিকা]

ওঝা, ওঝাকো (ওঝারা)

গ্রামের মধ্যেই একে দেখা যায়। যে কেউ যখন তখন ওঝা বলে যেতে পারে। হাতুড়ে বিভায় ইনি পারদর্শী।' সঠিকভাবে ডাইনীও ধরতে পারে।

এর কাজ সম্পর্কে বয়োবৃদ্ধ কোলয়ান বলেন— ওঝারা সত্যি কামরু গুরুর কাছে শিখেছে বহু পূর্বে। তাঁর দেশ আর আমাদের দেশ লাগালাগি ছিল, পূর্বপুরুষেরা যে কথা আমাদের বলেছেন। ওঝাদের কাজ হল ছয়টি (১)—খড়ি দেখে, (২) চাল ছড়ায়, (৩) কামড়ায় কিংবা 'ঝুঙা' করে, (৪) দেবতা খুঁজে, (৫) দেবতা ছড়ায়, (৬) ' লোককে ওষুধ দেয়, রোগী ওষুধে যদি ভাল না হয়, গ্রামের লোক ওঝাকে খড়ি দেখায়। তেল আর শালপাতা নিয়ে আসে, আর সে বসে দুটি পাতাতে তেল মাখাবে, আর মন্ত্র বলতে বলতে ঘষবে—"তেল তেল থার তেল, মাষ তেল, কুসুমতেল-ই তেল, পড়ছায়েতে, কি উঠো, ডান উঠো ভূত উঠো, বুলিন উঠো, বিষ উঠো, কে পড়ছে, গুরু আজ্ঞা মাত্র পড়ছে।" এরপর মাটিতে একটু রাখবে। তারপর খুলে দেখবে। তারপর তাকে জিজ্ঞাসা করবে: দেন্ বাবা, অনুগ্রহ করুন, কি। সব পেলেন? বললে তবে ত আমরা বুঝব। ওঝা খড়ি দেখবারই আগে ঠিক করে দেখছে যে, এখানে হল ডান, এখানে হল ঘরের দেবতা, এখানে হল বাইরের দেবতা, এখানে হল দুঃখ, আর এখানে হল বিষ। পাতার যে ঘরে দাগ উঠবে হিজিবিজি, সেইটি বলে দেয়, ডাইন হলে ডাইন, দেবতা হলে দেবতা; দুঃখ হলে দুঃখ, আর বিষ হলে বিষই। ডাইনি যদি উঠে, মাঝি পারানিক সন্ধ্যাবেলা বলে যায় শুন অমুক, অমুকের অসুখ করেছে, ভাল যেন হয়, তোমাকেই ধরেছি, ভাল না হলে: তোমাকে বলছি না। তাকে ভাল হলে ভালই, তা না হলে দুইজন করে মাঝি চারদিকে তেল দেখাতে পাঠাবে। সন্ধ্যাবেলা জমা হয় আর তেল দেখাতে যে সব লোক গিয়েছিল তাদের একে একে জিজ্ঞাসা করবে। তিন দিক থেকে ডাইন ঠিক করে আনবে, বাঁচবার জন্য ভাল খুঁজিবে, আর যদি মিল না হয়, আবার পুনরায়-খড়ি দেখিয়ে আনবে।

ঘরের দেবতা যদি ওঠে তাহলে রোগীকে বলবে নাও তোমার ঠাকুর সামালাও তারপর জল দিয়ে মানৎ করবে যে ভাল হলে পূজা করব। বাইরের দেবতা উঠলে ওঝা মন্ত্র আওড়াতে আওড়াতে দেবতাকে চাল ছড়িয়ে দিবে, "নে তবে ফালনা বঙ্গা, বুল মায়াম সিটকা মায়াম এমাম্ চালাম কানাঞ ফরিয়াক-ক কাটিক মায়, অকোয়ে আচুলেৎ মেয়া ডোডেলেৎ মেয়া উনিরেন সিয়া হপনগে সটুকে সামবাড় কেম, তেঁঞে খা-হলিয়া অড়া: দ ছিকেম্ হাড়িকেম্ ওকাড়েতাম নান বা থান সেনজং বেরেৎজং মে") নাও তবে ফালনা বঙ্গা আং-এর রক্ত শিরার রক্ত দিচ্ছি, ভাল যেন হয়ে যায়, সে তোমাকে লাগিয়েছিল তারা সেরা ছেলেই সাবাড় করুন, আজ থেকে এ বাড়ি ছেড়ে দেন, নিজের থানে চলিয়ে যান। মারাং বুরু আর পারগানাকেও চাল ছড়া 'বাখেড়' (মিনতি) করবে, এই যে অমুক মাঝির ঘরে 'জজম বঙ্গা (যে দেবতা মানুষকে খায়) জজম বুরু লেগেছিল পড়েছিল, ধরে সাবুদ করলাম, খুদ চাল তার দিয়ে দিলাম, তারই সাক্ষী সভা করুন' আজ থেকে যেন ভাল হয় রোগী। এইভাবে আলাদা মারাং বুরু আর পরগানাদেরও ওঝা মিনতি করে। শেষে মুড়া ঢড়া আইলদেব দেবতাদের চাল ছড়িয়ে মিনতি করে: এই নিন্ তবে আপনারা মুড়ার খুঁটির, লাটার, লোকাকের, সিমার আইলের বড় ছোট ঝুলি, ঝোলাকাঁধে, খড়ম হাতে যোগি ইত্যাদি, যাদের ছেলে তাঁকে আসুন, যাঁদের চলে না তাঁরা দূরে থেকে সাক্ষী শোভা করুন।

দুঃখ উঠলে ওষুধ বাটিয়া খাওয়ায় আর বিষ হইলে কামড়ায় আর লুণ্ডা করে (ঔষধের গোলা তৈরী করে সেটা দিয়ে মালিশ করে)। ওঝারা প্রথমে এক জায়গায় মন্ত্র দ্বারা ঝেড়ে জমা করে, তারপর মুখে কামড় দিয়ে বার করে পাতার থলাতে ফেলবে। কি সেখানে রোগ আছে, গুঁড়ির গোলা তৈরি করে মন্ত্র পড়ে লুণ্ডা করে। সেগুলি বলি দিয়ে খায়, আর গ্রামের দুই একজনকে ভাগ দেয়।

সখা

সখা, ওঝা এবং জানগুরু সাঁওতাল সমাজের কাছে দেবতুল্য। সখা, ওঝা ও জানগুরুর নির্দেশ দেবতার নির্দেশ বলেই সাঁওতালরা মনে করে। সখা গ্রামেই থাকে। ওঝার ওপর স্তর সখা, সখার ওপর জানগুরু। গ্রামের মানুষের কুমঙ্গল, অসুখ-বিসুখ দূর করার জন্য সখা চেষ্টা করে। ওঝা সামান্য তুকতাক বিতাই জানে। সখা কাউকে ডাইনি করলে সেই ডাইনি নির্ঘাত। গ্রামবাসীরা গ্রামের কারুর অমঙ্গল হলে সখার কাছে গেলে সখা গুণে বলে দেন কে ডাইনী। সখার কতকগুলো মন্ত্র আছে। সেই মন্ত্রগুলো হল —

'সের চাওলে কুপি সুহুম,
লেটের আদিঞ অগম কালি মাই।
নিয়া আতরা অক্ত রেনা
কাখা কালি মাই
লালই দেয় তিঞ।'

যার বাংলা হল—মাপোয়া চাল, পেঁপে ভাটিই তেল, পৌঁছে গেছে আমার কাছে, এইবার মত অন্তরের কথা আমাকে বলতে হবে কালি মা। এরপর সখা কালি মাকে উদ্দেশ্য করে, বলে—

সখা—আচ্ছা কালিমা, লোকগুলি এসেছে কি জন্ত? লৌহ লুতি হারায়েছে না মানুষ রোগী। লৌহ লুতি হারালে তো সখার কাছে আসে না। সখা পরিষ্কার ভাবে ধরে নেয় যে মানুষই রোগী। তখন সখার কাছে ব্যক্তিরা স্বীকার করে যে মানুষই রোগী।

সখা—আচ্ছা কালি মা, মানুষ যে রোগী সে কি রোগা, মেয়ে না না পুরুষ? মেয়ে মেয়ে করতে করতে হ্যাঁ বা না সাড়া না মিললে পরিষ্কার ভাবে ধরে নেয় পুরুষ রোগী।

সখা—আচ্ছা কালি মা, রোগীর যে গ্রাম, উত্তর দক্ষিণ না পূর্ব পশ্চিম?

উত্তর দক্ষিণ, উত্তর দক্ষিণ বলতে বলতে হাঁ বা না আওয়াজ না পেলে পূর্ব পশ্চিম ধরে নেয়। দুইয়ের মধ্যে একটা তো হবেই। এসব বলার পর মন্ত্র উচ্চারণ করে। সখা কালিমার উদ্দেশ্যে মন্ত্রটি হল—

মন্ত্র : ব্রহ্মা বিষ্ণু জগৎ চিন্তা মুনি ;
আজ্ঞা পিতা গুরু পরস্ত মদন
সত্যকালি ঠিক ঠিক করে বল কালিমা।

সখা : আচ্ছা কালিমা, রোগীর নামে যে তেলপাতা দেখা হয়েছিল তিনটি না পাঁচটি? পাঁচটি পাঁচটি বলতে বলতে কোন সাড়া না পেয়ে ধরে নেয় তিনটি খড়ি দেখেছে।

মন্ত্র :—বাঁচি পাতকম সিংভূম শিকারভূম পাড়া পাকেচেৎ বিহারী বুরু। বার বার বলতে থাকে।

সখা :—আচ্ছা কালি মা, রোগী মৃত না জীবিত? ঠিক ঠিক করে বল কালি মা। সখা নানা দৃষ্টিভঙ্গিতে ভেক দেখায় ও মন্ত্র বলে গান করে জীবিত জীবিত বলতে থাকে। কোনো উত্তর না পেলে মৃত বলে ঘোষণা করে। শ্রোতারা মানতে বাধ্য হয়।

গান (ক) টুরু বুরু গডেৎ বাবা
আতু দয়া হুহয় মেমে
নিয়া জাতরা অগুরেণা কথা কটাল মার্ত
একলাই স্বয় এতএও।

গান (খ) গিদি গিদি মেঙ্গেল গিদি
গিদি গিদি রাইলা গিদি
মিলাম গিদি বেন তাড়না

অওরয়না কাথা ঝিরিনা
লালই ছয় ভিএত্ত।

গান (গ) দোষ্টা কগে দোষ্টা কনথে
নির্দোষীকে কটল বির না
নিয়া জাতথা অওরেনা
কাথা কাটল মাই লালাই হয় এতএ।

বঙ্গানুবাদ :—(ক) টুরা নামক পাহাড়ের গড়েৎ বাবাকে বলা হচ্ছে। যে গ্রামের মানুষকে ডেকে দাও। সাক্ষাৎ কালি মায়ের অনুপ্রেরণায় অন্তরের কথা সম্ভব।

(খ) আগুনের মত শুকনি, শক্তিশালী শুকনি, দেশ দুনিয়ায় ঘুরছে। আমি তোমাদের কাছে দোহাই দিচ্ছি যেন অন্তরের কথা বলে দিতে পারি।

সখা দারুণভাবে সপথ নিয়ে ডাইনি নির্ণয় করবে।

সখা :—আচ্ছা কালি মা, গায়ের দুই বাড়ি (বিধবা) ডাইনি হচ্ছে। কোনটি দোষী সাবস্ত হচ্ছে? ভয়াদ (আত্মীয়) না গ্রামের বিধবা? সাধারণত আত্মীয় ডাইনি হয়ে থাকে।

সখা সমস্ত আত্মীয়কে এক পাশে আলাদা করে বসাবে, অন্য এক পাশে গ্রাম্য ষোলআনা। ওঝার তেলপাতে ভায়াদ (আত্মীয়) ডাইনী সাবস্ত করা থাকে। সে জন্য দোষী আত্মীয় আপনা-আপনি ভয়ে কাঁপতে থাকে কিংবা ম্লান বদনে বসে থাকে।

সখা সমস্ত গ্রামবাসীকে বোকা বানাতে পেরেছে কি না তা জানার জন্য বাড়ী ফিরে যেতে বলবে এবং উপদেশ মূলক কথা জানাবে। গ্রামবাসীরা বিনয়ের সহিত জানাবে যে ডাইনী তাদের দেখতে হবে এবং ডাইনী নির্ণয় করে সে তার পারিশ্রমিক বাবদ ২২৫/২৫০ বা যা টাকা দাবী করবে তা নিয়ে তবে।

গ্রামবাসীরা সকলে স্বীকার করলে গ্রামে গিয়ে গ্রাম্য বিচার অনুপাতে মোটা টাকার জরিমানা ধার্য করে এবং একদিনের মধ্যে দিতে হবে অন্যথা কুপিয়ে মারা হবে। ভয়ে একদিনের মধ্যে জমি বিক্রয় কিংবা গরু ছাগল বেচিয়ে সমস্ত জরিমানা টাকা আদায় দিতে হয়। দোষী ব্যক্তি অস্বীকার করলে জরিমানা দিয়ে পুনরায় দেওয়ানী (হাইকোর্ট) করতে পারে। হাইকোর্টের রায়ে অন্য ভায়াদ ডাইনি হতে পারে কিংবা কোনো ঠাকুর দ্বারা ডাইনী হয়েছে-বলে সাবস্ত করে থাকে। ডাইনী মন্ত্র বা গান এক ধরণের গোঁড়াকল। ফলে সমস্ত আদিবাসী কুসংস্কারে নিমজ্জিত। ১৯৬০ হইতে ১৯৮০ সাল পর্যন্ত সথার জ্ঞানগুরুর দ্বারা পরিচালিত ব্যক্তিকে সথার অবতার বলা যায়।

গ্রামবাসীরা তাদের বিশ্বাসের সঙ্গে বা নথার কথা মিলিয়ে যখন বাড়ি ফেরে তখন তাদের কোন নিকটতম আত্মীয় বা প্রতিবেশী সম্পর্কে তীব্র ঘৃণা ও ক্ষোভ নিয়ে গ্রামে ঢুকেই ফেটে পড়ে। ডাইনি হওয়ার লক্ষণ কি? ছেলেমেয়েদের জ্বর, পেটের অসুখ, খোলসা, গরু মোষের মারা যাওয়া, স্বামী-স্ত্রীর মনোমালিন্য, বউ-শাশুড়ীর ঝগড়া, ফসলহানি, ইত্যাদি ছোটবড় ঘটনাগুলিই পরবর্তীকালে ঘাতক আকার ধারণ করে।

ছোট ছোট ছেলেমেয়েরা যখন মায়ের দুধ খায় না, বা স্তনে দুধ হয় না, তখন শাশুড়ী বা পাড়াপ্রতিবেশিনীরা বলেন নিশ্চয় কারো কু-দৃষ্টি পড়েছে সন্তানের বা মায়ের ওপর। কু-দৃষ্টি বা নজর লাগা কাটাবার জন্ত তখন ডাক পড়ে গ্রামের নথার। নথা এসে মন্ত্র পড়ে 'হুন হুন, ই হুন কে ঝাড়ে, গুরু ঝাড়ে গুরুর আজ্ঞাই হাম্বি ঝাড়ি, বিষাইচণ্ডী রাঁগাহাড়ি, কামুর কামরুর দহাই।'

জানকো

(জানদের)

জান হচ্ছে আমাদের হাইকোর্ট। ঐ যে যারা ডাইন হয়, ওদেরই সত্যি ডাইন বলি। কি জানি সত্যিই পায়, না মিথ্যা, আমরা বিশ্বাস করি সত্যিই পায় বলে, কেননা মারাং বুরুর কাছে সিদ্ধি লাভ করেছি। আর পরীক্ষাও করছি, দেবতার শক্তিতেই বলে না ফন্দিবাজি করে জান হচ্ছে।

কোন লোক ওষুধে ভাল না হলে, প্রথমে ওঝার কাছে গিয়ে খড়ি (গুটি চালান বা খড়ি দেখা) করাব তারপর গ্রামে গ্রামে ডাল পুঁতি অতঃপর জানের কাছে যাই গ্রাম শুদ্ধ লোকের অসুখ করলে মাঝি সমস্ত পুরুষ মানুষদের সঙ্গে করে নিয়ে যাবে, আর একজনের অসুখ করলে সে মাঝির কাছে কাঁদবে, তারপর রোগীর তরফের দুই একজন আর একজনের বাড়িতে যাকে পাওয়া গেছে তার স্বামী বা ভাই আর গ্রামের পাঁচ ছয়জন সাক্ষী জানের কাছে যাবে। এক সঙ্গেই থাকবে, যেন কেউ লুকিয়ে জানকে কিছু বলতে না পারে। জানের কাছে একবারে যাবে (সোজাসুজি যাবে না) বাইরে ডেরা বাঁধে। কোথাকার লোক, কি জন্য এসেছে, কার জন্য এসেছে, আর কি অসুখ, সে সবের কথা কাউকে কিছু বলে না। জানের গ্রামের মাঝিকে বলবে: ওগো বাবা গুরুর কাছে তেল পূজা করতে দাও। তারপর সে জিজ্ঞাসা করবে, কতজন পূজা করবে (দেখবে)? বলিল—অতজন আছি। সেই মাঝি জানের কাছে নিয়ে যাবে। মাঝি তাদিগকে পূজার জিনিস হাজির করাবে যেমন একটি সুপারি, একটি ভাঁড়ানিচ (পাতার থালা বা বাটি) আতপচাল, তেল সিন্দুর, ধুনা আর বেলপাতা। তখন জান বলিবে---আচ্ছা এস তবে পরে এই বেলা। তারা ডেরায় ফিরে যাবে। সেখানে গ্রামের কোন লোক এসে কিছু জিজ্ঞাসা করলে কথা বলবে না, কি বললেও তাদের দেশ আর তাদের গ্রাম বলবে না, অন্য দেশ আর তাদের গ্রামই

বলবে। এই সময়ে জানের কাছে যাবে। জান কখনও কখনও তার ঘরেই দোষ দেয়, আর কখনও কখনও 'জাহেরে' কি বাইরে। তারা চুপচাপ বসে আছে আর নিজে আতপ চাউল অনেক জায়গায় দেবতার নামে রেখে রেখে যায়, আর বেলপাতা তাতে রেখে যায়। এরপর চাল রাখা জায়গাতে সিঁদুর দিয়ে দাগ দেবে তেলে গুলে; আর ধূপের সরার আগুনে ধুনা ফেলে রাখবে, শাঁখ বাজাবে আর পূজার ঘণ্টা বাজাবে আর পূজা করে তারপর ভর দেয়, ভর দিয়ে বকতে থাকে। প্রথমে তাদের দেশের নাম বলবে, ওটার পর গ্রাম, তারপর কুলহি (গ্রামের রাস্তা) কোন্ কোন দিকে আছে, সেইসব বলে; তারপর মাঝি ওটার পর ফরিয়াদী লোক? ওটার পর তার কাকা জেঠা, ভাই ভগ্নীদের, ছেলেদের, মেয়ে আর এরা যতজন আছে সকলের নাম বলবে।

তারপর জিজ্ঞাসা করবে কি বাবা এই সমস্ত ঠিক বলেছে কি না? তারপর তারা বলবে ঠিকই, বিশ্বাস করলাম এবারে ভেঙ্গে বলে দেন। জান উত্তর দেয় দাও 'বুন্দা' (ঠাকুরের টাকা) দাখিল কর, তবে তো বলব। তারপর একটি করে টাকা দেয়। আর চুক্তি করে গিয়ে থাকলে, যত টাকা একবার করেছে, সেটাও চেয়ে নিবে, সে সব দিলে তবে বলবে ডাইন কি দেবতা, আর তারা কারা। তারপর জান বলবে এত এত জায়গায় 'ভাগি চাউরা' করেছে, এটা ওটা ঠিক করে ছিল কিনা? তাহারা জবাব দিবে।

হেঁ বাবা ঐগুলিই। তখন জান তাদের বলবে: যদি তুষ্ট না হয়ে থাক তাহলে সাত সখার কাছে (সাত জায়গায়) বুঝে দেখ। সাত সখায় আলাদা হলে বুন্দা টাকা ফেরত দিয়ে দিব। তারপর ঘরে ফিরে আসবে। বোঙ্গা ধরা হলে, অসুস্থ, লোক বলি মানত করবে, আর ডাইন ধরা হলে, হুড়ুম হুড়ুম করে জরিমানা করে বেআবরু করে গ্রাম থেকে তাড়িয়ে দেয়। একজানের কাছে ডাইন হয়েছে, লোক খুসি না হলে অন্য জানের কাছে নিয়ে যায়, পুনরায় প্রমাণ করবে বলে। কিন্তু সেটা আজকাল, কিন্তু ডাইনেরা এক জায়গায় দোষী হলে, হাজার জানের কাছে গেলেও সেই কথাই বলে। শুধু দুইজন ডাইনী গুণে (বিদ্যায়) জানেদের কথা গড়বড় করতে পারে। মাঝির স্ত্রী ডাইনী ধরা হলে তাড়াতে পারে না: নিজেই উল্টে যে লোকটিকে খাচ্ছে তাকে বলবে---যাও দেখে নাও কোন দিক, সুখ যদি না হচ্ছে ত, আমি গ্রাস করেছি, আমি কোথায় যাব? আজকাল জানেরা ভীষণ ঠকাচ্ছে, পূর্বের মত ধরম জানদের (ধার্মিক জানদের) মত সত্য এদের নাই। পূর্বে জানেরা জান শিক্ষা করে নাই, আপনা হতেই পেয়েছিল। তারা ভার দিচ্ছিল না রাত্রের বেলা স্বপ্নে পেত কি দিনের বেলা হলে দেখে। দেবতা এসে বলে দেয় যে, অমুক অমুক আসছে এটা ওটার জন্য, তুমি তাদের এইরকম বলবে। আজকাল সেরকম জান নেই, বেশির ভাগই ফাঁকিবাজি করে সূত্র জিজ্ঞাসা করছে টাকা খাচ্ছে। 'ফুলধারিয়া' (পূজার ফুল) যোগাড় করে জানের পূজা ইত্যাদিতে সাহায্য করে

রেখেছে বড় কাটাবার জন্য। আর যে জানের 'ফুলধারিয়া' নাই তারা দেখে শুনে বলে। আধা নাম বলে দেখে, আর জান করতে আসা লোকদের দিকে তাকায়, ঠিক কিনা আর বেঠিক হলে তারও নাম বলে দেখবে। সেইজন্য আজকাল জানদের মিল থাচ্ছে না।

'ফুলধারিয়া' বাধা জান সহজেই বের করে নিতে পারে। সে রকম জান ঠিক না বলতে পারলে বলে বাবা বেড় আছে, ওটা সরান কর।ও। তারপর ফুলধারিয়া কাছে যায়। বেড় কাটাবার জন্য কি কি লাগিবে, সে সব বলে দিয়েছে। 'ফুলধারিয়া' সে সব পূজা করবে, মুরগী ফড়িং কি ব্যাং কি শেওলা কি সাদা বিড়াল। পূজা করার আগে জিজ্ঞাসা করে কার নামে বেড় কাটব ? তখন মাঝি পারানিকদের নাম বলে দেয়। ফরিয়াদী লোকের নামও বলে আরও দুই এক কথা বলে দিয়ে পূজা করবে। তারপর তাদের বলবে—সন্দেহ তোমাদের থাকলে আমাকে পাহারা দিতে পার। জানের কাছে যাব না। কিন্তু নিজের ঘরে যাবেই, আর তার ঘরের লোক আর জানের ঘরের লোকের সঙ্গে কথাবার্তা হতে পারে, তাতে অনেক চালাকি হতে পারে। জানেরা আগের মত একেবারে ঠিক ঠিক ফুটিয়ে তুলতে পারবে তাহলে তো কথাই নেই। ঠিক সে রকম করছে আজকালকার জানরা ? ফুলধরিয়ারা এক সিকা প.য় বেড় কাটাবার জন্য।

চাউরা : বিং
('ডাল' পোঁতা)

[সাঁওতালরা প্রাচীনকালে পরিবারের কারুর অমঙ্গল কিছু হয়েছে কিনা তা জানার জন্য আর এক ধরনের বিশ্বাস করত। সেই বিশ্বাস পদ্ধতিটা হল—]

চাউরা বিং হচ্ছে এই রকম : ডাইন কি দেবতা, কি দুঃখ খড়িতে উঠলে, সেটা সঠিক করবার জন্য জলাশয়ের পাড়ে ডাল পোঁতে। সাক্ষী হিসাবে একটি ডাল মাঝখানে প্রথমে পোঁতে তারপর ঘরে দেবতার নামে একটি, তারপর ভায়াদি কুটুমের নামে একটি, ওটার পর মেয়ে বোনদের নামে একটি, সেটার পর প্রতি ঘরের নামে একটি ডাল পোঁতে। প্রতি ডালে সিন্দুর দিয়ে যায়। তারপর চাল ছাড়িয়ে 'বাঁখেড়' করে : প্রণাম তবে সিঞ বঁদা (সূর্যদেব)। বেড়ার মত চারদিক ঘিরে ঘিরে রেখেছে, চারখুঁট, সারা পৃথিবী ভরে রয়েছে তবে এই যে ডালিকালি করছি, দোষীরাই দোষ করে সেইটাই যেন শুকনো হয়ে ঝরে যায়, সাক্ষী রইলেন আর যদি না হয়, সবুজ হয়ে নতুন পাতা বাহির হবে, সোনার মত সুন্দর থাকবে (বলে ডাল পুঁতবে)।

আরও বলে : যদি দেবতা হন, এটাই যেন শুকনো মচ্মচে হয়ে যায়, যদি না হন সোনার মত সত্যই (খাঁটি থাকবেন) সাক্ষী রইলেন। সেইরূপ প্রত্যেকের নামে প্রতি ডালে 'বাঁখেড়' করবে। এইসব করার পর ঘরে চলে যায়। পাঁচ ঘণ্টা পরে ফিরে আসে ডাল দেখবার জন্য। যে নামের ডাল মরেছে, সেটাই ঠিক হবে ' তারপর অন্য গ্রামের পুনরায় সেইরূপে 'মুহি' (বাজাই) করিবে দুই

তিন জায়গায়। তারপর সেই দুঃখ পাওয়া লোকটিকে বলবে: এই যে এইটি তোমাকে ঠিক করে দিলাম, এখন গুরুর কাছে নিয়ে যাচ্ছে, না ভাল হয়ে গেছে? সে উত্তর দিবে: কমছে না, গুরুর কাছ থেকে যাচাই করে নিয়ে আসি। দিন ঠিক করে ভালের কাছে চলে গেল।*

অতএব ডাইনি আছে কি? খোঁজ করতে গিয়ে দেখেছি ডাইনি ব্যাপারটা সম্পূর্ণ ভুয়ো। এগুলো সবই ওঝার চালাকি। ডাইনি বলে গ্রাম থেকে বিতাড়িত করতে পারলে লাভবান ওঝার সখা, বা জানগুরুর হবে। সম্পত্তি গ্রামবাসীরা লুটে নেবে। মাঝখানে ডাইনি বানিয়ে জানগুরু, সখা ওঝা মোটা টাকা আয় করে নেবে। ভাল রকমের এটা একটা ব্যবসা। নিরক্ষর ও দরিদ্র্যপীষ্ঠ আদিবাসীদের কাছ থেকে রোজগার করার সবচেয়ে ভাল ব্যবসা।

এই জানগুরু ব্যক্তিটি কাদের ডাইনি করেছে? কোথাও ডাইনি হওয়ার ঘটনা শুনলে গিয়ে দেখবেন এবং পরবর্তী অধ্যায়ে আলোচিত ডাইনি সংক্রান্ত বিষয়গুলিতেও দেখবেন, দারিদ্র্যের মধ্যে যাঁরা সাংসারিক কাজকর্মে অক্ষম, শারীরিক ভাবে পঙ্গু, এমন ব্যক্তি বা প্রচুর জমি জমা আছে, বা বয়স্ক ব্যক্তিদের দুরারোগ্য কোন অসুখ হলে চিকিৎসার কোন ব্যবস্থা করতে পারছে না এমন ব্যক্তিবর্গ ডাইনি অপবাদে নিন্দিত হচ্ছে। সন্তান না হলেও ডাইনি করা হচ্ছে। আমাদের সমাজে যেমন বাবা-মা বৃদ্ধ হলে অনেক সন্তানই বৃদ্ধ বাবা-মাকে সংসারের বোঝা ভেবে বৃদ্ধাবাস বা তীর্থবাসে পাঠিয়ে দেন বোঝা হালকা করার জন্য।

সাঁওতাল সমাজেও তেমনি ডাইনি করে সমাজ থেকে নির্বাসন দেওয়া হয়। জানগুরু কাউকে ডাইনি করলে প্রচুর টাকা জরিমানা নেয়। কোথাও কোথাও জরিমানার টাকা ৬০০০ টাকাও হয়েছে। ডাইনি করলেই জানগুরু কে দিলেই নিলেই হল না। গ্রামবাসীরা জানগুরুর কাছে গিয়েছিল এই বাবদ অর্থাৎ ধুলোউ-রানীর খরচ বাবদ অনেক টাকা ডাইনী সাব্যস্ত মেয়েটির কাছ থেকে নেয়। এছাড়াও আনুমানিক অন্যান্য জিনিসপত্রও দাবি করে। জিনিস না দিলে সেই পরিমাণ টাকা দিতে হয়। পরবর্তী অধ্যায়ে এব্যাপারে বিস্তারিত আলোচনা করা আছে। যদি কেউ জানগুরু বা সখার টাকা এবং গ্রামবাসীদের টাকা না দিতে পারে তাহলে তাকে গ্রামছাড়া করে ওর যাবতীয় সম্পত্তি হাত করে নেয়। বেধড়ক মারে। কখনও কখনও মেরেও ফেলে। সংবাদপত্র খুললে এখবর প্রতিদিন একটা অন্তত ছাপা হবে দেখতে পাবেন।

জানগুরু, সখা, ওঝাদের অত্যাচার বহুদিন ধরে চলছে। স্থানীয় ক্ষমতাসীন রাজনৈতিক দল এবং বর্তমান সরকারও এগুলোর খবর দেখে বসে রয়েছেন। সখা জানগুরু এদের কাউকে শাস্তি দিতে পারছে না। প্রশাসন অদ্ভুতভাবে নীরব থাকছে। কারণ ভোট হারাবার ভয় আছে। সুতরাং এই হল জানগুরু। এর আরও কর্মকাণ্ড পরবর্তী অধ্যায়ে পাবেন।

---

* হড়কোরেন মারে হাপড়ামাকো রেয়াঃক্ কাথা—বর্তিকা, সম্পাদনা—মহাশ্বেতা দেবী, জানুয়ারী-মার্চ '৮৯

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

ডাইনিতন্ত্রে বিশ্বাস

ডব্লু. জি. আর্চার (W. G. Archer) তাঁর "The Hill of Flutes"-গ্রন্থে সাঁওতাল সমাজে ডাকিনীবিদ্যা প্রসঙ্গে বিশদ আলোচনা করেছেন। তিনি বলেছেন সাঁওতাল সমাজে ডাইনীবিদ্যার দীক্ষা কৈশোর থেকেই শুরু হয়। যে কিশোরীদের এই বিদ্যা শেখাবার জন্য বাছাই করা হয়, ডাইনীরা তাদের কাছে ডাইনীদের সম্পর্কে নানা রোমাঞ্চকর গল্প শোনায়, ভয় পেতে নিষেধ করে। একবার ওরা অভ্যস্ত হয়ে উঠলে ডাইনী কিশোরীদের ডাইনী সমাজে প্রচলিত গান শেখায়। ডাইনীদের গান শোনার পর কিশোরীদের ফেরার উপায় থাকে না, তাদের দীক্ষা নিতেই হয় নয়তো মৃত্যুবরণ করতে হয়। এরপর কিশোরীকে কোন বোঙার সাথে বিবাহ দেওয়া হয় এবং বোঙার কাছ থেকেই কিশোরী মানুষ মারার বিদ্যা শেখে। বোঙার সাথে বিবাহ অত্যন্ত বিপজ্জনক ব্যাপার, কেননা বোঙা স্বামী পছন্দ না করলে অনেক সময় কিশোরী বধূকে মেরে ফেলে। একজন শিক্ষানবিশকে ডাইনীর পূর্ণ মর্যাদা পেতে হলে এরপর তার নিজের পরিবারের কাউকে 'খেতে' হয়। এব্যাপারে হয় সে নিজে 'মারতে' সাহায্য করে নয় 'মারবার' পর মৃতের মাংসের অংশ ভক্ষণ করতে হয়। একবার দীক্ষা নেওয়া হয়ে গেলে তরুণীকে ডাইনীদের নিয়মকানুন মানতে হয় এবং ডাইনীদের বিভিন্ন আচার-অনুষ্ঠানে ও সম্মেলনে যোগ দিতে হয়। এই সম্মেলন কখন কখন প্রতিরাত্রে অনুষ্ঠিত হয়, তবে সাধারণত শনি বা রবিবারে কিংবা আরো দীর্ঘ সময় বাদে বাদে হয়। একজন গুডেৎ বোঙাকে (আহ্বায়ক) ডাইনীদের ডাক দেবার জন্য নিযুক্ত করা হয়। এই বোঙা একটি কালো মুরগী হাতে নিয়ে রাতের বেলায় গ্রামের রাস্তা দিয়ে যায়, ডাইনীদের কানে সেই মুরগীর ডাক পৌছায় অমনি তারা বিছানা। ছেড়ে উঠে পড়ে এবং তাড়াতাড়ি নির্দিষ্ট জায়গায় গিয়ে হাজির হয়। কখন কখন আরও একটি বোঙাকে পাঠানো হয় যে সারাটি গ্রামের লোককে গভীরভাবে আচ্ছন্ন করে রাখে যাতে তারা বাড়ির স্ত্রীলোকদের অনুপস্থিতির কথা জানতে না পারে। ডাইনীদের মজলিস গ্রামের মাঝখানে গরমকালে নির্জন মাঠে বড়ো ঝাঁকড়া গাছের তলায় কুলহি মুড়া অথবা দোপথী চৌপথীতে অনুষ্ঠিত হয়। ডাইনীরা যখন ঘর ছেড়ে বেরয় তখন তারা কাপড়-চোপড় খুলে উলঙ্গ হয় এবং কাঁটার কোমরবেড়ি পরে নেয়। প্রত্যেকে নিজের বিছানায় একটি করে ঝাঁটা রেখে দেয়, যেটিকে তার বোঙা সাময়িকভাবে ডাইনীর মূর্তিতে বদলে দেয়। সব ডাইনী এক জায়গায় জড়ো হবার পর পরগনা বোঙাকে পূজা

দেওয়া হয়। এরপর কখন তারা গাছে চড়ে মহামরীর দেশে যায় রোগের বীজাণু আনতে, কখন বোঙা স্বামীর সঙ্গে যৌনমিলনে মিলিত হয়, বা জাহিরা থানে নাচ শুরু করে। তবে এই মজলিসেই ওরা ঠিক করে নেয়, এবারে কাকে মেরে খাওয়া যেতে পারে। নির্বাচন শেষ হলে মারবার উপায় ঠিক করা হয়। ডাইনীদের রেওয়াজ অনুযায়ী কোন লোককে পাঁচ ভাবে মারা যেতে পারে। প্রথমতঃ লোকটির কলজে ফুসফুস বা হৃৎপিণ্ড বার করে নেওয়া এবং রান্না করে খেয়ে ফেলা; এতে অবশ্য কিছু শর্ত আছে: যদিও ডাইনী নিজে লোকটিকে মারবে এবং খেয়ে ফেলবে তবু একাজে কোন ডাইনীকে সেই পরিবারের হতে হবে এবং যদি সে নিজে মারে তবে তাকে সেই কাজে যে কোনভাবে হোক সক্রিয় সরিক হতে হবে, যদি সেই পরিবারে কোন ডাইনী না থাকে তবে যতদিন না সেই পরিবারের কউকে ডাইনীবিদ্যায় দীক্ষা দেওয়া সম্ভব হচ্ছে ততদিন মারার কাজ স্থগিত রাখতে হয়। বোঙার সম্মতি এবং পরিবারের ভেতর ডাইনী পাবার পর শিকার লোকটির কখন হৃদপিণ্ড কখন কলজে বা ফুসফুস বের করে নেওয়া হয়। এরপর হৃৎপিণ্ড, কলজে বা ফুসফুস চালের সঙ্গে মিশিয়ে রান্না করা হয়, কিছু অংশ দেবতাকে উৎসর্গ করা হয় এবং বাকি অংশ ডাইনীরা খেয়ে থাকে। কলজে, ফুসফুস খেয়ে ফেলার পরই শিকার লোকটি অসুস্থ হয়ে পড়ে, কখন কখন সঙ্গে সঙ্গেই মৃত্যু ঘটে, কখন বা ধীরে ধীরে মৃত্যু ঘনিয়ে আসে। দ্বিতীয়তঃ ডাইনী নিজে লোকটিকে না মেরে কোন বোঙার সাহায্যে রোগ সঞ্চার করে। এইভাবে, বোঙা নিজে লোকটিকে মেরে ফেলে। তৃতীয়ত বোঙা নিজে লোকটিকে না মেরে অন্য কোন ঘাতবশক্তির জন্তু বা অন্য কিছুর সাহায্যে লোকটির মৃত্যু ঘটায়। চতুর্থতঃ কোন পাথরের ভেতর কোন বোঙাকে প্রতিষ্ঠা করে সেই পাথরটি শিকার লোকটির ঘরের ভেতর বা গোয়ালঘরের মেজেতে পুঁতে ফেলা হয়, এটিকে থাপন (স্থাপনা) বোঙা বলে (মূদার সঙ্গে তুলনীয়)। এটা দুভাবে করা হয়; একটা হল কোন সাদা পাথরের গায়ে সিঁদুর লেপে চুলে জড়ানো, অন্যটা হল পাথর গুটির একপাশ কেটে তার ভেতর সব রকম শস্য এবং সিঁদুর মাখানো একটি সাদা পাথর ভরে দেওয়া। এই পাথরের উপর দৈবাৎ কেউ পা রাখলে সে বোঙার গায়ে পা রাখে, ফল, আকস্মিক মৃত্যু অথবা দুরারোগ্য ব্যাধিটির আক্রমণ। পঞ্চমতঃ রোগের বীজাণু সারা গ্রামে ছড়িয়ে দেওয়া যেতে পারে—কুলহি রাস্তায়, কুয়োর জলে, পুকুরের সর্বত্র। এর ফলে সারা গ্রামে মহামারী ছড়িয়ে পড়ে এবং লোকের মৃত্যু ঘটে।

ডাইনী হিসাবে কাউকে সন্দেহ করা হলে তাকে নানাভাবে পরীক্ষা করা হয়। ডাইনীকে জুতো এবং চামড়া শুঁকানো হয়, কখনো কখনো জুতো বা চামড়া দিয়ে তাকে প্রহার করা হয়। লোকবিশ্বাস আছে জুতো বা চামড়ার গন্ধ ভূত এবং ডাইনীরা সহ্য করতে পারে না; জুতো বা চামড়া দিয়ে প্রহার করলে

ডাইনীর সব মন্ত্রশক্তি নষ্ট হয়ে যায়। কখনো কখনো ডাইনীদের গভীর জলাশয়ে ছুঁড়ে দেওয়া হয় ও লোকভাবনা এই যে, সাধারণ সৎ মানুষ জলের তলায় তলিয়ে যায়। তাই যদি কেউ ভেসে উঠে তবে সে যে অশুভশক্তির সাহায্যেই ভেসে ওঠে তা প্রমাণিত হয়; তাই যদি সন্দেহভাজন ডাইনী জলে ছুঁড়ে দেবার পর না ডুবে ভেসে ওঠে তবে তার বিরুদ্ধে গুরুত্বপূর্ণ প্রমাণ সাধিত হয়। লঙ্কা পোড়ার গন্ধে সাধারণ মানুষ নাকের জলে চোখের জলে একাকার হয়ে অস্থির হয়ে পড়ে; কিন্তু যদি দেখা যায় লঙ্কা পোড়ার গন্ধ বা ধোঁয়া কারো ওপর স্বাভাবিক প্রতিক্রিয়া করতে পারছে না, তখন তা যে অশুভশক্তির প্রভাবের জন্যই ঘটেছে, না তা ধরে নেওয়া হয়। তাই ডাইনীদের পরীক্ষা করার জন্য ডাইনীকে একটি বন্ধঘরে আটকে রেখে আগুনে গুচ্ছ গুচ্ছ লঙ্কা পুড়তে দেওয়া হয়, যদি কোনরকমে স্বাভাবিক প্রতিক্রিয়া না দেখা যায় তবে তাকে ডাইনী হিসাবে ঘোষণা করা হয়। মাদাল ডাল দিয়ে চাবকানো আর একটি রীতি; আমরা অন্যত্র বলেছি যে, ভূতপ্রেত অশুভশক্তি মাদাল পাতার গন্ধ সহ্য করতে পারে না—তাই মাদাল ডাল দিয়ে চাবকালে যদি কেউ পরিত্রাহি চিৎকার শুরু করে তবে তাঁকে ডাইনী হিসাবে ধরে নেওয়া হয়। ওঝাওরা ডাইনী সনাক্ত করবার দায়িত্ব ওঝার ওপর দিয়ে থাকে। ওঝা একটা পেতলের পাত্রে জল ঢেলে তার ভেতর একটি কুল্‌থি বা কুথথি ডালশস্যের দানা ছেড়ে দেয়, সে এই দানাটির ছায়ার ওপর নজর রেখে ডাইনী দেখতে পায়, তার শারীরিক বর্ণনা দেয় এবং তার নামও বলে দেয়। ক্রুদ্ধজনতা তখন ডাইনীর ঘরে যায়, তাকে গালাগালি করে এবং তাকে দোষ স্বীকার করবার জন্য শাসানি দেয়। যদি সে সব দোষ অস্বীকার করে তখন লোকেরা সখা (বা সেয়ানা লোক)-র কাছে যায় এক মুঠো আতপ চাল নিয়ে। সখা একটি আগুনের পাত্রে ধুপধুনো এবং চালের কয়েকটি দানা ফেলে দিয়ে কাছে বসে মাথা দুলিয়ে 'ঝুপার' করে, তার নজর কিন্তু থাকে আগুনের পাত্রে আপনমনে সে নিজেকে প্রশ্ন করে এবং তার জবাবও দেয়; তারপর যখন তার ঘোর কেটে যায় তখন সে উপস্থিত জনতাকে সে কি কি বলেছে জিগেস করে জেনে নেয় এবং সে পারিশ্রমিকের বদলে জনতাকে ডাইনীর নামও বলে দেয়। সাঁওতালদের মধ্যে অন্যরকম রীতি লক্ষ্য করা যায়। প্রথমে গ্রামপ্রধান ডাইনীদের উদ্দেশ্যে হুঁশিয়ার বাণী উচ্চারণ করে। তারপর গ্রামের লোকেরা সালের ডাল ভেঙে নদীতীরে পুঁতে দেয়। এক একটি পাতা এক একজন নারী বা সন্দেহভাজন ডাইনীদের নামে চিহ্নিত করা হয়। এরপর কিছু চাল ছিটিয়ে দিয়ে সিংবোঙা আর চাঁদো বোঙাকে যে দোষী তার-নামে চিহ্নিত পাতা বা পাতাগুলিকে শুকিয়ে ফেলার জন্য মিনতি করা হয়। নির্দিষ্ট আকারের পরে যদি দেখা যায় যে কোন বিশেষ পাতা শুকিয়ে গেছে তাহলে ধরে নেওয়া হয় তারা ঠিক পথে চলছে। এবার তারা কোনো জানগুরুর কাছে যায়, জানগুরু ঝুঁপার করে ডাইনীর নাম বাতলে দেয়। শুকনো শাল পাতার

চিহ্নিত নাম এবং জানগুরুর মুখ থেকে উচ্চারিত নাম দুটো একজনেরই হলে জনতা নিঃসন্দেহ হয়। তবু সাধারণভাবে আরও একজন জানগুরুর সিদ্ধান্ত নিতে হয়। যদি দ্বিতীয় জনও একই ডাইনীর নাম করে তখন সন্দেহভাজন ডাইনী অস্বীকার করলেও তাকে ডাইনী হিসাবে প্রমাণিত বলে ধরে নেওয়া হয় এবং সামগ্রিক রীতি অনুসারে তার বিরুদ্ধে শাস্তির ব্যবস্থা করা হয়। কিন্তু প্রথম, দ্বিতীয়, তৃতীয় বা চতুর্থ জানগুরুর সিদ্ধান্তে যদি অমিল দেখা দেয়, তখন ডাইনীর বিরুদ্ধে কোন শাস্তির ব্যবস্থা করা সম্ভব হয় না। ওঝা বা জানগুরু যদি ডাইনীদের নাম প্রমাণ করে দেয় তখন ডাইনীদের অপরাধ স্বীকার করে নিতে বলা হয়। অর্থদণ্ড করা হয়; প্রমাণিত হওয়া সত্ত্বেও অস্বীকার করলে ডাইনীদের গ্রাম থেকে তাড়িয়ে দেওয়া হয়, কখনো হত্যাও করা হয়।*

এবার দেখা যাক বয়োবৃদ্ধ কোলয়ান এই বিশ্বাস সম্পর্কে কি বলেন—কোলায়ান বলেন।

ডাইনী হ'ল আমাদের 'হড় হপনের' (সাঁওতালদের) মস্ত জ্বালা। ডাইনের জন্য লোকে শত্রু হচ্ছে, কুটুম্বের দুয়ার বন্ধ হচ্ছে বন্ধ হচ্ছে, বাপে ছেলেতে ঝগড়া হচ্ছে, ভাইয়ে ভাইয়ে বিরোধ হচ্ছে। স্বামী স্ত্রীতে ছাড়াছাড়ি হচ্ছে, আর দেশে খুন হচ্ছে। ডাইনী না থাকলে আমাদের সুখ থাকত। সাহেব লোকের সবই ভাল বিচার ক'রেছেন, যতদুর জানা যায়, ডাইনী সম্বন্ধে কি ক'রে যে অন্ধ হচ্ছেন, বুঝতেই পারি না। ডাইনীরা আমাদের খায়, আমরা ধ'রে একটু দুড়ুম দুড়ুম করলে, উল্টে আরও হাকিমরা হাজতে দিচ্ছেন, মহা জ্বালায় পড়েছি, কি করলে আমাদের ভাল হবে, দিশেহারা হয়ে গেছি। হাকিমদের বুঝালেও তাঁরা বিশ্বাস করে না। বলেন, কৈ দেখি আমার আঙ্গুল থাক্ তবে বিশ্বাস ক'রব ডাইনী আছে বলে—তারপর কয়েদ করে বসল। থাপরি ছরি নিয়েত ডাইনীরা খাচ্ছে না. বিদ্যার জোরে পরপারে পাঠিয়ে দেয় কি আর একেবারে সোজা। আগে মাঝি পারানিকরা দমন করেছিলেন, আর ভাল না হলে, পাঁচ জনে মিলে বে-আবরু ক'রে গ্রাম থেকে তাড়িয়ে দিয়েছিল, কিন্তু আজকাল হাকিমদেরই বশ ক'রে শেষ ক'রল। সেইজন্য সব পুরুষই ভয়ে পিছিয়ে গেছে।

পুরুষ মানুষের কথা আর চলছে না, এখনকার যুগে মেয়েরাই রাজা হয়ে গেছে। একটু বেশি কিছু বলছে কি টক ক'রে মুখে পুরছে, সেই ভয়ে চুপ করে থাকে। ডাইনীরা রাত্রে জমা হয় কোন বনে কি মাঠে। যাবার সময় ঠুঁটো ঝাঁটা কি কোন কিছু পুরুষের কাছে রেখে যায়, আর তারা মনে করে ঘরের মানুষ আমার আছেই, কেবল বাঁধাতে ঐ ঝাঁটাকে নিজের লোকের মত দেখে তা না হ'লে ওরা যায় না, কোন গাছে চড়ে বিদ্যার জোরে হাওয়ার মত যায়। দেবতাদের আখড়ায় নেমে, দেবতাদের সঙ্গে নাচে, সিংহদের ডাকে, চুল আঁচড়িয়ে দেয়, চুমা খায়,

* The Hills of Flutes, W. G. Archar p.p. 293-299.
(ঝাড়খণ্ডের লোক ভাবনা—ড. বঙ্কিমচন্দ্র মাহাত, পৃষ্ঠা ২২৭)

তারপর দেবতাদের কাবু করে দিব্যি দেয়, যেন কোনরকমে খড়ি দেখার সময় না উঠে। এইসব করে মুরগী ডাকের সময় ঘরে ফিরে আসে।

ডাইনীরা অনেককে শিষ্য করে, ছোট মেয়েছেলেদেরও ভুলায়, তারা মরে গেলে বীজ যেন থাকে। প্রদীপ নিয়ে রাত্রে ঘুরে, লোকের বাড়ীতে ঢুকে শিষ্য করবার জন্য মেয়েদের ভুলে আর তারা স্বীকার না করলে বলে: না শিখলে তুমি মারা যাবে, তা না হলে সিংহে খাবে। সেইজন্য ওরা ভয়ে তাড়াতাড়ি শেখে। ছেলেদের জাগিয়ে ডাইনীরা ঝাঁটা মারে, আর ভাঙা কুলা কাঁধে নিয়ে জাহেরে যায় প্রদীপ নিয়ে। সেখানে মুরগী পূজা করে আর খিচুড়ি পিঠা তৈরি করে খায়। চেলাদের সিংহের চুল আঁচড়ানো করায়, আর তারা ভয়ে স্বীকার না করলে বলে কিছুই করবে না, বোন! ভয় করো না, তারপর মন্ত্র আর ঝাড়নি গান শিখিয়ে দেয়, তারপর সিদ্ধি দিবার জন্য বলে: যাও বোন বাবা কি তোমার বড় দাদাকে খাও। স্বীকার না করলে জ্বর হওয়ার কিংবা পল্লী করে দেয়। "কাটকম চারেচ্" (এক রকমের ঘাস)-এর দ্বারা কলিজা খুঁটে বার করে, আর সেটা সিদ্ধ করে প্রথমে চেলাদের আগে খাওয়ায়। সেইদিন থেকে ঐ চেলাদের সমস্ত দয়া মায়া শেষ হবে, রেগে গেলে ছেলে কি বাবা, ভাইদের খাবে, আর নিজেদের স্বামীদেরও মায়া করে না, খেয়েও ফেলে।

প্রবাদ আছে যে পুরাকালে দুটি ছোকরাকে মাদল বাজাবার জন্য ডাইনীরা রোজ তুলে নিয়ে যেত। একদিন একটি ছোকরার কলিজা ডাইনীরা বার করে নিয়ে গেল, আর এক হাঁড়ি হাঁড়িয়া, চাল, নুন, হলুদ, হাঁড়ি, কলা তাদের বাড়ি থেকে সঙ্গে নিয়ে গেল জাহের। সেখানে নিয়ে গিয়ে সেই কলিজা সিদ্ধ করে, সেই ছোকরা দুজনকে বখরা দিল খাবার জন্য। কিন্তু ওরা খেল না, কোঁচড়ে লুকিয়ে রাখল, শুধু হাঁড়িয়াটুকু খেল। দেবতাদের সঙ্গে নেচে ক্লান্ত হয়ে ঘরে ফিরে এল। পরদিন সকাল হতেই কলিজা বার করে ছোকরা মূর্ছা গেল। সে সব লোকে দিশাহারা হল, বলতে লাগল শেষ হয়ে গেল, শেষ হয়ে গেল? ঐ ছোকরাদের মায়া হল, সেইজন্য বলল—যাও অমুক অমুক মেয়েদের ধর তাহলে মানুষটি ভাল হবে। তারপর মাঝির বৌ পরানিকের বৌ ইত্যাদি ভাল ভাল লোককে ধরে নিয়ে এল ওদের কথামত।

ওরা এসে স্বীকার করতে চায় না, গালাগালি দিতেই চাইছে আর তাদের স্বামীরাও রাগে গরগর করছে, বলছে প্রমাণ করে দাও—তানা হলে ভাল বলছি না। তখন সেই ছোকরা দুটি তাদের দেওয়া ভাগ পাঁচজনের সামনে খুলে বলল এই যে, বাবা রাখাল। সেটা দেখে ডাইনী আর তাদের স্বামীরা চুপ।

তারপর পরগণাকে নিয়ে এল। সে হুকুম দিল, যাও টাঙ্গি নিয়ে এস, আনিল। সেই সময় পরগনা ডাইনীদের বলল—যাও ভাল কর তা না হলে কেটে ফাঁক করব;

তোমরা হলে কাঠ, ও হোল মজ্জা। তারপর ভয়ে ভাল করে দিল। ভাল না করে দেওয়ার জন্য বহু জায়গায় কেটে দিয়েছে।

মাঝির স্ত্রী কি পরানিকের স্ত্রী ডাইনী থাকলে, প্রমাণ করা বড় শক্ত, কেন না তাদের স্বামীরা গড়াতে দেয় না। পূর্বে, যেমন, একজন ওঝা মানুষ রেগে গিয়ে মাঝি আর পারানিকদের স্ত্রীদের ডাইনী বলেছিল। মাঝিরা তাকে বলল এটা তুমি প্রমাণ না করলে তোমার মাথা রাখব না। উত্তর দিল—একদিন চোখে দেখিয়ে দিব। তারপর চুপচাপ হল। ওঝা একদিন সন্ধ্যেবেলা খেয়ে দেয়ে তীর ধনুক নিয়ে জাহেরে চলে গেল। সেখানে একটি গাছের উপর উঠে ওৎপেতে বসল।

সন্ধ্যার খাওয়া দাওয়া শেষ হওয়ার পরই যাদের দোষ দিয়েছিল সেই ডাইনী মেয়েরা জাহেরে গেল। গিয়েই এক পাক নেচে ঘুরল। তারপর তাদের একজন 'রুম' (ঝুঁপাব) হল। তারপর সিংহকে ডাকল, লুক্ক নামে নাম করে। সিংহকে দুইবার শিস দিয়া ডাকিল, তারপর দুইটিই চলে এল, তারপর চুল আঁচড়ে দিচ্ছে, চুমু খাচ্ছে, সেই সময় ওৎপেতে বসা লোকটি বড় সিংহটিকেই তীর মারল। তখন সিংহ মনে করল যে, এরাই আমাকে কিছু করল বোধ হয়। সেই রাগে এক এক করে এলোপাতাড়ি কামড়িয়ে মেরে ফেলল ডাইনীদের, আর অন্য সিংহটিকেও বিঁধে মেরে ফেলল তারপর ঘরে ফিরে গেল।

পরদিন সকাল হলে দেখল, তাদের নাই, তখন ঘরে ঘরে পরস্পরকে জিজ্ঞাসা করেছে যে, আমাদের সব কোথায় গেল বল। তখন ওঝা লোকটি তাদের বলল : জাহেরের দিকেই দেখে এস, ওই দিকেই যেতে দেখেছিলাম।

তারপর গেল, দেখা যে, "বিলিয়া চিতিং" সিংহ দুটি কামড়িয়ে মেরে ফেলেছে আর তারাও পড়ে আছে। তখন চারিদিকে গোলমাল হতে ধারে পাড়ার লোক জমা হয়ে তাদের দেখল। তখন থেকে বিশ্বাস করে আসছি ডাইনীর কথা।

পূর্বপুরুষেরা বলতেন যে মারাংবুরু বেটাছেলেদের ডাইনি শিক্ষা দিচ্ছিলেন, কিন্তু মেয়েলোকেরা ফোর ফন্দি করে গুণ (বিদ্যা) আগেই নিয়ে নিল। একদিন যেমন, বেটাছেলেরা জমা হল পরস্পরকে শিক্ষা দেবার জন্য। নিজেদের ঝগড়াটে বৌদের কি করবে বলে। বলিল হলাম বেটাছেলে. কি করে আমাদের কথা চলছে না? দুই এককথা মেয়েলোকদের বললে বিশ বাখান গাল দিতে আরম্ভ করে, এরকম সহ্য করব না। তারপর ঠিক করল : চল মাতাং বুরুর কাছে যাই, তার কাছে কোন গুণ শিক্ষা করে আসি, যেমন করেই হোক এই মেয়েদের যেন কাবু করতে পারি। তারপর দিন ঠিক করল যে, মাঝ রাত্রে ফালনা বনে জমা হবে। গেল। মারাং বুরুকে মিনতি জানাল, ডাকল : ও ঠাকুরদা একবার

আসুন। বহুলোক এসেছি আপনার কাছে না কাজ হয়ে। মারাংবুরু চলে এলেন, জিজ্ঞাসা করলেন : কি দুঃখ আমাদের আছে নাকি? তারপর তাদের দুঃখ জানাল আর মিনতি করল মেষগুণ (বিদ্যা) শিখিয়ে দিন নিজেদের বৌদের শায়েস্তা করতে।

মারাং বুরু বলিলেন শিগাতে পারি, কিন্তু এই সমস্ত পাতায় তোমাদের রক্তে লিখলে তবে। সেই সব শুনে বিস্তর ভয় পেয়ে বলিল কাল ফিরে এসে লিখে গুণ নিব। তারপর চলিয়া গেল। কিন্তু তাদের স্ত্রীরা লুকিয়ে লুকিয়ে এসে আড়াল থেকে সব কথা ঠিক শুনে নিল। তখন তারা বলিল : এই পুরুষদের ধর্ম হচ্ছে এই। আমাদিগকে বিয়ে করার আগে কুকুরের মত গোসাঁই গোসাঁই করে পিছনে ঘুরে বেড়িয়েছিল; এখন বুড়ি হয়েছি বলে খারাপ, দেখছে; মেরে ফেলতে চেষ্টা করছে : আচ্ছা দেখে নেব, কে কাকে মারতে পারে। এই সব যুক্তি করে গলি রাস্তা দিয়ে তাড়াতাড়ি এগিয়ে চলে গেল। রাস্তা ঠিক করে নিল কি করবে বলে। পুরুষরাও পরে ঘরে ফিরে এল। ফিরে আসা মাত্র মেয়েরা তাদের স্বামীদের সোহাগের সঙ্গে অভ্যর্থনা করল, তাতে বেটাছেলেরা মনে করল, নিজে নিজেই ভাল হয়েছে কি জন্যই বা যাব?

পরের দিন মেয়েরা নিজেদের স্বামীদের ভাল করে ভাত তরিতরকারি দিল, আর বেশি করে সন্ধ্যা বেলা হাঁড়িয়া দিল। পুরুষেরা খেয়ে মাতলে হয়ে বেহুঁশ হল। তখন মেয়েরা একত্র হয়ে ধুতি পাগড়ি পরে আর বেঁটে ছাগল চুল লাগিয়ে মারাং বুরুর কাছে চলল। ডাকিল : ও ঠাকুর্দা, আসুন শীঘ্র তাড়াতাড়ি, আমাদের স্ত্রীরা দিনরাত জ্বালিয়ে মারছে।

মারাং বুরু চলে এলেন। তখন তাঁকে বলিল, নিন্ আপনার পাতা বার করুণ. নিজে নিজের দাগ কাটব (লিখব), আর সহ্য করতে পারছি না মেয়েদের অত্যাচার। মারাং বুরু তাঁর শাল পাতা বাহির করিলেন. আর তারা ফুঁড়ে রক্ত দিয়ে নিজের নিজের পুরুষের ছবি আঁকিল, তারপর মারাং বুরু মন্ত্র আর মারনি শিখিয়ে দিলেন, সিদ্ধাই দিলেন লোক খাওয়ার জন্য। মুচকি মুচকি হেসে তারা বাড়িতে ফিরে এল।

পরদিন সকালে পুরুষেরা তাড়াতাড়ি উঠছে না বলে ভীষণ গালাগালি দিয়ে মুখ শুকনো করে দিল। পুরুষরা আঁধাবুঁদা উঠে চোখ রগড়াতে লাগল, ঘুমও ভেঙ্গে গেল, আর মেয়েরা শান্ত হচ্ছে না তাও বুঝতে পারল। তারপর চলমল বৈঠক বসাল, সেখানে ঠিক করল, চল ত যাই। মারাং বুরু যাই বলুক, গুণ নিশ্চই শিখব। তারপর রাতে জঙ্গলে গেল, আর কাক শকুনের মত বিস্তর মিনতি মারাং বুরুকে করল, দাও বাবা, নিশ্চয় শিখিয়ে দাও, মেয়েরা আমাদের ভয়ানক জ্বালাছে। সেই সব শুনে মারাং বুরু আশ্চর্য হয়ে তাদের বলিলেন : গুণতো তোমাদের দিয়ে দিয়েছি, কি চাইছ ঘন ঘন? তখন পুরুষেরা একসঙ্গে বলে উঠল কৈ, কখন দিলেন আমাদের? সেদিন থেকে আমরা তো আসি নাই। সে সব শুনে মারাং বুরু মহা চিন্তায় পড়লেন, বললেন : তোমাদের দিয়েছি না তো

কি করেছি? এই যে তোমাদের দাগ দেখ তো। পুরুষেরা নিজেদের দাগ দেখে বলল: দাগ যেন আমাদেরই, কিন্তু আমরা তো দাগ কাটি নাই, কারা যেন আমাদের দাগ কেটেছে (ছবি এঁকেছে)।

তখন মারাং বুরু গালে হাত দিয়ে চিন্তা করতে লাগলেন, তারপর বুঝতে পারলেন যে, মেয়েরা আমাকে শুদ্ধ ছেলেমানুষ করে ফেলল। তারপর রেগে গিয়ে ঐ পুরুষদের বললেন : নাও এখানে তাড়াতাড়ি দাগ কাট, ঐ বদমাস মেয়েদের দেখে নেব। দাগ দিল, আর তিনি ওঝা আর জান হবার সিদ্ধাই দিলেন, যেমন করেই হোক ডাইনীদের ধরে যেন সাজা দিতে পারে। তখন থেকে ডাইনী আর ওঝা ও জানদের মধ্যে শত্রুতা আছে। কিন্তু ওঝা আর জানেরা পারছে না, কেন না ডানেরা ওদের দেবতাদের সহজেই কাবু করেছে সেইজন্য সহজে ধরতে পারে না, অন্য লোকই ঘড়ি মাটিতে (খড়িগুণা) উঠছে। আর জানেরা আঁধা হয়ে অন্য লোকেদের বলছে (দোষ দিচ্ছে)।

কতকলোক বলে ডাইনী, ওঝা আর জান সকলেই কামরু গুরুর কাছে শিখেছে। হাঁ বহুপূর্বে আমাদের পূর্ব পুরুষরা তাঁর কাছে গিয়েছিলেন। ওঝা হওয়ার কথা সত্যই কেননা ওঝা লোকেরা প্রথমেই তাঁর নাম দেন, তা না হলে ডাইনি আর জানের কথা জানি না. কামরু গুরুর কাছে শিখেছে কি না জানি না; দোহাইটুকু তাঁর দোহায় দেয় না. সেইজন্য বলছি, তাঁর কাছে শিখে নাই।*

সাঁওতাল সমাজের ডাইনী বিশ্বাসের মত পৃথিবীর বহু দেশেই ডাইনী ও ডাইনীতন্ত্রের উপর বিশ্বাস ও তার প্রয়োগ ছিল। ফ্রান্সের জোয়ান অব্ আর্ককে ডাইনী হিসাবে অভিযুক্ত করে ১৪৩১ খৃষ্টাব্দে ইংরাজরা জ্যান্ত পুড়িয়ে মারে, তখন জোয়ানের বয়স ছিল মাত্র উনিশ বছর। গ্রামের মেয়ে জোয়ান পরাধীন দেশকে মুক্ত করার ব্রতে ঝাঁপিয়ে পড়ে। পুরুষের পোশাক পরে প্রচণ্ড আত্মপ্রত্যয় নিয়ে সে যুদ্ধ করত। মেয়ে হয়েও এই ধরণের 'অস্বাভাবিক' পুরুষালি আচরণের কারণে কুসংস্কারাচ্ছন্ন বিশ্বাসের প্রভাবে ইংরাজরা তাকে সাব্যস্ত করে ডাইনী হিসাবে। ব্যাপারটা জোয়ানের মত ব্যক্তিত্বকে সরিয়ে দেওয়ার একটি হীন চক্রান্তও বটে। একইভাবে দেখা যায় গ্রামের অথর্ব বৃদ্ধাদেরই সাধারণত ডাইনী সন্দেহে মারা হয়। সংসারের এই সব বোঝাকে যে কোন উপায়ে সরানোর সচেতন প্রচেষ্টা। দুচারটি ক্ষেত্রে জমির বিরোধ পারিবারিক কলহ ও গুণিনকে ঘুষ দিয়ে শত্রু বিশেগকে ডাইনী হিসাবে ঘোষণা করার ব্যপারও জড়িত থাকে।

আফ্রিকার কিছু কিছু দেশে, অস্ট্রেলিয়া ও ল্যাটিন আমেরিকার বিভিন্ন জনগোষ্ঠী এখন ডাইনীতন্ত্রে সুগভীর আস্থা রাখে ও সক্রিয়ভাবে তার চর্চা করে। ১৯৬৪ সালে ১৮মে তারিখের লাইফ পত্রিকায় ডাইনীদের সম্প্রতি অনুষ্ঠিত ক্রিয়াকলাপের

* হড়কোরেন মারে হাপড়ামেকো রেয়া:'ক্ কাথাবর্তিকা—জানুয়ারী-মার্চ '৮৯
সম্পাদনা—মহাশ্বেতা দেবী।

উপর সচিত্র প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়। ইংল্যাণ্ডের ফোকলোর সোসাইটি এবিষয়ে এক সেমিনারের আয়োজন করেন। সোসাইটির সভাপতি ডগলাস কোনেড সহাস্যে স্বীকার করেছিলেন যে, আগে তিনিও ডাইনীতন্ত্রের চর্চা করতেন। ডাইনী ও ডাইনীতন্ত্র হল আদিম মানুষের অজ্ঞতা ও অসহায়তা থেকে সৃষ্টি হওয়া নানা মিথ্যে বিশ্বাস ও ধারণার ধারাবাহিকতায় জন্ম নিয়েছে। সংস্কৃতে ডাইনীদের অলৌকিক শক্তির অধিকারিণী মহিলা হিসাবে বর্ণনা করা হয়েছে। এর থেকেই এসেছে ডাইনী কথাটি ইংরাজীতে বলা হয় witch এক্ষেত্রেও মূলত মহিলাদেরই বোঝানো হয়। প্রাচীন ভারতীয় শাস্ত্রে আদ্যাশক্তির সাথে ডাকিনী বা ডাকিনীদের উল্লেখ পাওয়া যায়।

বহু কুসংস্কারের মত ডাইনীদের সম্পর্কেও ধারণা যে তারা অলৌকিক ক্ষমতার অধিকারী। ঝড়বৃষ্টি, অগ্ন্যুৎপাত, ভূমিকম্প বন্যা ইত্যাদির মত প্রাকৃতিক বিপর্যয় এবং অকালমৃত্যু, দুরারোগ্যরোগ ইত্যাদির মত শারীরিক দুর্ঘটনার সবকটির পেছনেই বাস্তব করণ থাকলেও, আদিম মানুষের কাছে তার প্রায় সবটাই ছিল অজানা। এদের বুদ্ধিগ্রাহ্য রাখার জন্য এ সব কিছুর বদলে এক অলৌকিক শক্তি বা আত্মাকে তারা দায়ী করছে। পাশাপাশি এই প্রতিকূল শক্তির হাত থেকে বাঁচার জন্য অলৌকিক শক্তিকে করায়ত্ত করার চেষ্টা ও চর্চা করছে। এ ক্ষেত্রে তথাকথিত যাদুবিদ্যা একটি বিরাট ভূমিকা পালন করেছে। বিশেষ কিছু লোক দাবি করত যে তারা এই ম্যাজিক বা যাদুবিদ্যার সাহায্যে প্রাকৃতিক শক্তিকে নিয়ন্ত্রণ করতে পারে। শত্রুর উচ্ছেদ করতে পারে ইত্যাদি। এবং এইভাবে তারা সমাজে প্রতিপত্তি ও সম্ভ্রম লাভ করত। এই ভাবেই ডাইনীতন্ত্র আর মারণ, উচাটন, বশীকরণ, বানমারা, তুকতাক, তন্ত্রবিদ্যা ইত্যাদি যাদুবিদ্যার সাথে সম্পর্কযুক্ত কাল্পনিক নানা পদ্ধতির উদ্ভবঘটেছে। ডাইনীরা এইসব ক্ষতিকর যাদুবিদ্যার (black magic) দক্ষ হয় বলে বিশ্বাস। অন্যদিকে জীবন ও মৃত্যুর বৈজ্ঞানিক রহস্য সম্পূর্ণ অজ্ঞাত থাকায়, প্রাচীন মানুষ পাপের পেছনে এক আত্মায় কল্পনা করেছে এবং বিশ্বাস করেছে যে নানা দুর্দশার পেছনে রয়েছে কিছু ক্ষতিকারক বদ্ আত্মার কারসাজি। ডাইনীরা এই ধরনের বদ্ আত্মাকে বশীভূত করেও তাদের দিয়ে নানাবিধ কাজ করতে পারে বলেও বিশ্বাস। ডাইনীরা যেন এই বদ্ আত্মারই প্রতিভূ। জ্ঞানের বিকাশের বৈষম্য, প্রকৃতির কাছে অসহায়তা, সামাজিক ও অর্থনৈতিক দুর্দশা ইত্যাদির ফলে ব্যাপক মানুষের মধ্যেই এখন এ ধরনের ভ্রান্ত বিশ্বাস টিকে রয়েছে।

দূর থেকে কারোর অজ্ঞাতে মন্ত্র পড়ে তার শরীর বা মনের উপর প্রভাব বিস্তার করা যায় না। কিন্তু কাউকে শুনিয়ে মন্ত্র পড়লে ভীতির কারণেই সে মানসিকভাবে প্রভাবিত হয়ে পড়তে পারে এবং এ থেকে নানা শারীরিক ও

মানসিক রোগের সৃষ্টি হতে পারে। আর, একবার ডাইনী সম্পর্কিত কোন ঘটনার কথা প্রচার হলে ডাইনীতে পরিপূর্ণ আস্থাশীল গ্রামবাসীরা ধরাবাহিকভাবে পরবর্তী কোন দুর্ঘটনা রোগ বা মৃত্যুকেও ডাইনীর কাজ বলে মনে করতে শুরু করে। ভীতির কারণে চক্রবৃদ্ধিহারে অসুস্থতারও সৃষ্টি হয়, গণহিস্টিরিয়ার মত। পশ্চিমবঙ্গে শুধু নয়, ভরতবর্ষের বহু অঞ্চলেই ডাইনী প্রোকোপ মাঝে মাঝে দেখা যায়। জ্ঞাতি, কুটুম্ব বা ঘনিষ্ঠ দুই বন্ধুকে পরস্পরের শত্রু করে দেওয়ার মত বহু বিচিত্র ক্ষমতার অধিকারী বলেও ডাইনীদের মনে করা হয়। গ্রামের মধ্যে পরস্পরের মধে ঝগড়া ঝাঁটি মারপিট হলে বলা হয় গ্রামের উপর ডাইনীর নজর পড়েছে। কিন্তু পারস্পরিক বিদ্বেষের পেছনে যে সংকীর্ণ স্বার্থ, অসহিষ্ণুতা, অর্থনৈতিক কারণ ইত্যাদিই কাজ করে সে ব্যাপারে সচেতনতার অভাব থেকে যায়।

ডাইনী বিশ্বাস শুধুমাত্র আদিবাসীদের মধ্যেই নেই সব সম্প্রদায়ের মানুষের মধ্যেই আছে। ছোটবেলায় নানারকম গল্প করে শিশুদের বলা হয় ডাইনী দেখতে বৃদ্ধা। শণের মত তার চুল, হাতে আঁকাবাঁকা লাঠি, বড়বড় নখ,, হি হি করে হাসে, ক্রূর তার দৃষ্টি, বাচ্চার রক্ত চুষে খায় আর অন্যের সর্বনাশ করার জন্য সদাই প্রস্তুত। ইয়োরোপের ডাইনীরা আবার নাকি ঝাঁটা হাতে আকাশে উড়ে যায়, কিংবা একটি 'কুরূপা বৃদ্ধা নির্জন কুটিরে বসে নানা রকম ওষুধ তৈরি করছে, তার পাশে ঘুর ঘুর করছে একটি কালো বেড়াল।'

মূলগতভাবে এখনোটিকে থাকা ডাইনী সম্পর্কিত বিশ্বাসের ভিত্তি তৈরি করে রেখেছে অজ্ঞতা ও দারিদ্র্য। সাঁওতালদের মত আদিবাসীদের বেশীরভাগের জীবনই মূলত প্রকৃতি নির্ভর। রোগের ক্ষেত্রে যেমন আধুনিক চিকিৎসা, ও চিকিৎসক ও হাসপাতাল তাদের সাধ্যের বাইরে, সুযোগ-সুবিধাও অত্যন্ত সীমিত, তেমনি বহু শত বছরের ভ্রান্ত সংস্কারের বেড়ার বাইরে বেরিয়ে আসার মানসিকতাও সৃষ্টি হয় নি। যেমন, পরিসংখ্যান বলছে সাঁওতালদের মধ্যে ভালভাবে লিখতে পড়তে পারে এমন মানুষের সংখ্যা অতি নগণ্য। অধিকাংশই বছরে চারমাসের বেশী শুধু তাড়ি খেয়ে বেঁচে থাকতে হয়। তারা জানে অসুখ করলে ওঝা গুনিন ছাড়া বিশ্বাসযোগ্য আর কেউ তাদের সামনে নেই। দুর্দশা ও শ্বাসকষ্টের জন্য বোংগা-ডাইনীরা ছাড়া অন্য কিছুকে দায়ী করার মত প্রাথমিক চেতনা তাদের দেওয়া হয়নি। সচেতনভাবে এই অজ্ঞতা, দারিদ্র্য, অসহায়তা ও কুসংস্কারের সুযোগ নেয় স্বার্থান্বেষী কিছু মানুষ। গুণিন মোড়োল থেকে শুরু করে ভোটবাবু নেতারা পর্যন্ত। সারা দেশের নানা প্রান্তে ছাড়িয়ে থাকা অজ্ঞ ভীরু বঞ্চিত মানুষরা যদি আর্থিকভাবে স্বচ্ছল হয়, আধুনিক জ্ঞানে শিক্ষিত হয়, বৈজ্ঞানিক চিকিৎসার পরিপূর্ণ সুযোগ পায়, তবেই আরও কুসংস্কারের মত ডাইনীরাও দূর হবে, মরবে না নিরপরাধ কোন বৃদ্ধা বা যুবতী। ৫০০ বছরেরও আগে ডাইনী অপবাধে

মৃত্যুর এতদিন পরেও ডাইনী হত্যা চলছে, একই সাথে মানুষের মহাকাশ অভিযানও চলছে। জ্ঞান সম্পদের বণ্টনের ক্ষেত্রে তীব্র বৈষম্য এ থেকে স্পষ্ট হয়। বোঝা যায় চরম দারিদ্র্যে মানুষ জীবনের অসহায়তা অনিশ্চয়তার অন্ধকারের মধ্যে বেঁচে থাকার লড়াই চালাতে গিয়ে ডাইনীতন্ত্রের মত ভয়ঙ্কর কুসংস্কারের শিকার হয়ে পড়ছে আজও। দেশের 'অগ্রগতি' ব্যাপক মানুষের বঞ্চনার' কুদৃশ্যকে আড়াল করে রাখেছে।*

সাঁওতালদের লোককথায় আছে যে, মারাং বুরু শ্রেষ্ঠ 'শক্তি' (স্ত্রীলিঙ্গ শক্তি)। একবার স্ত্রী জাতির অত্যাচারে নিপীড়িত হয়ে পুরুষরা মারাং বুরুর কাছে যায়। তিনি বিশেষ একটা দিনে তাদের আসতে বলেন। স্ত্রীরা যেভাবে হোক পুরুষের উদ্দেশ্য বুঝে তাদের অনুরূপ লয়ে। ফলে মারাং বুরু যে পুরুষদের ত্রাণ উপায় নির্দেশ করবেন তাও স্ত্রীরা জেনে ফেলে। ফলে নির্দিষ্ট দিনে স্ত্রীরা পুরুষদের পরম যত্নে পান আহার করার এবং তাতে পানের মাত্রা বেশি থাকায় পুরুষরা পানমত্ত হয়ে মারাং বুরুর কাছে যাওয়ার কথা ভুলেই যায়। স্ত্রীরা ছাগলের দাড়ি কেটে নিজেদের গোঁফে লাগিয়ে মারাং বুরুর কাছে উপস্থিত হয়। মারাং বুরুও পুরুষ মনে করে ত্রাণ মন্ত্র শিক্ষা দেন, সকালে ঘুম থেকে উঠে পুরুষরা চরম নির্যাতনের সম্মুখীন হয়। যখন তাদের মনে পড়ে যে মারাং বুরুর কাছে নির্দি' রাতে যেতে পারে নি। তখন তারা মারাং বুয়ুর কাছে যায় এবং ত্রাণের প্রার্থনা করে। মারাং বুরু হতবাক। তিনি বলেন—তোমাদের ত ত্রাণের উপায় বলে দিয়েছি আবার এসেছে কেন? পুরুষরা অস্বীকার করে। মারাং বুরু বুঝতে পাবেন যে স্ত্রীর চাতুরির দিয়ে পুরুষ বেশে তাঁর কাছ থেকে বিদ্যা অর্জন করেছে। তিনি তখন রুষ্ট হয়ে প্রতিবেদন হিসাবে প্রতি-বিদ্যা পুরুষদের দান করেন। স্ত্রীদের শেখা বিদ্যা কুবিদ্যা বা ডাইনী বিদ্যার প্রতিকার করার জন্য পুরুষদের দেন'জান বিদ্যা'। সেই থেকে পুরুষ 'জানেরা স্ত্রী ডান'দের প্রতিকার করছে। রামদাসটুডু রাসকা তাঁর "খেরওয়াল বংশা ধরম পুঁথি"তে শালোরায় আর পালো রায় নামে দুই স্ত্রীলোকের ডাইনীবিদ্যা কিভাবে ফলপ্রসূ হয় তার বিবরণ দিয়েছেন। বস্তুতঃ তাও উপকথাতেই আছে। উপকথাতে আছে কোন লোকের মৃত্যুকাল উপস্থিত হলে শালো রায় ও পালো রায় যেন ঐ লোকের প্রতি অঙ্গুলী নির্দেশ করে এবং অঙ্গুলি নির্দেশের ফলে ঐ লোকটির মৃত্যু হবে। তাতে আরও বলা হয়েছে যে সার্ধ-দ্বি-চরণের একটা মন্ত্র তাঁদের উচ্চারণ করতে হবে। তাছাড়া পূজা সামগ্রীও পূজা পদ্ধতিও বলা হয়েছে। বলা হয়ে 'লুসী' নামক এক সিংহের কথা, মন্ত্রের প্রভাব বৃক্ষ চালনা ইত্যাদি কথা। সান্তাড়ী কাহিনীতে কালক্রমে ডাইনীদের বিভিন্ন কর্মকাণ্ড বিভিন্নভাবে প্রকাশিত হয়েছে। তাতে মূল পেয়েছে আরও বেশি রস ও চারা তাতেই আজ বিষবৃক্ষে পরিণত হয়েছে।

---

* ডাইনীতন্ত্রে অতীত ও বর্তমান—ভবানীপ্রসাদ সাহু 'উৎস মানুষ' সেপ্টেম্বর '৮৪

অর্থাৎ ব্যক্তির মৃত্যুর পর তার উমুলকে রুম (রনন) এর মাধ্যমে আত্মিকের দেহ প্রবিষ্ট করান হয়। তখন মৃত ব্যক্তি আবিষ্ট ব্যক্তির মাধ্যমে নিজের মৃত্যুর কারণ প্রকাশ করে। তার মধ্যে 'হড় দোষ' অর্থাৎ নর-দোষ বা মনুষ্যকৃত বলেও প্রকাশ করা হয়। এইরূপ প্রকাশই ডাইনির প্রথম উৎস বলে মনে হয়। 'রুম ওাকাত' অর্থাৎ মৃত ব্যক্তির উমুলকে যখন ডেকে জানা গেল যে মৃত 'ব্যক্তি' মানুষের দোষ বা মানুষের 'গুনে' আজ মৃত, তখন আরম্ভ হয় দোষী ব্যক্তির অন্বেষণ। এবং এই অন্বেষণ সাধারণত ওঝা, জান, সখা, মাতি, ভকত ইত্যাদি 'আত্মজ্ঞানী' পুরুষেরা করে থাকেন। আবার কোন ব্যক্তি মৃত্যুর মুখোমুখি, কিংবা জটিল রোগাক্রান্ত, পুরাতন কিংবা দীর্ঘস্থায়ী রোগাক্রান্ত, অথবা হঠাৎ অসুস্থ বা সংজ্ঞাহীন ইত্যাদি শারীরিক কিছু দুর্গতি হলেই তার নিদানের অন্বেষণ চলে। প্রাচীনকালে পুরাতন মানুষদের জন্য আদিমকালের বাদ্যিবুনো—একজনকে পাওয়া গেল। তাকে বৈদ্য বলা হয় না বলা হয় ওঝা বা অঝা। তিনি তাঁর জ্ঞানমত কিছু ওষুধ দিলেন। অসুখ ভাল হলে ভাল। নয়ত তিনি অলৌকিক শক্তিতে তেল পড়া বা তেল দেখে নির্ণয় করলেন কোন মানুষের দ্বারা নিযুক্ত কোন 'অপদেবতা' বা 'দেবতা' অনিষ্ট করছে। কিংবা অনিযুক্ত কোন অপদেবতা অনিষ্ট করছে এবং এই অপদেবতাকে অপসারণ না করলে অপমৃত্যু অনিবার্য। কারণ তার ওষুধের এমন ক্ষমতা নেই যে ঐ অপদেবতাকে অপসারণ করে ও রোগ অনুযায়ী করে নিজের নিয়ম অনুযায়ী ঐ অপদেবতা 'ছড়াবার' চেষ্টা হল। তাতে যদি রোগ নিরাময় হয় তবে ওঝার নাম 'ডাক' হল। এবং পরবর্তীকালে তিনি চিকিৎসার জন্য ডাক পাবেন অন্যদের কাছ থেকে। কিন্তু যদি অপদেবতা ছাড়ানোর পরও রোগ না ছাড়ে তবে অঝার 'অধ্যায়' শেষ। তিনি বলে দিলেন—আমার বিদ্যা শেষ অন্য অঝা দেখ তবে জানের কাছে প্রজ্ঞান নেওয়াই প্রশস্ত মনে হয়। অতএব গ্রাম্য জনগণ বিভিন্ন দলে বিভক্ত হয়ে বিভিন্ন জানের স্থানে উপস্থিত হল। ফলে বিভিন্ন ব্যক্তিকেও দোষী নির্দেশ করতে পারে কিংবা কোন এক বিশেষ ব্যক্তি বা পরিবারকে দোষী নির্দেশ করতে পারে।

আদিবাসী লেখক ধীরেন্দ্রনাথ বাস্কে একটি প্রবন্ধ লিখেছিলেন—আদিবাসী সমাজের চিকিৎসা পদ্ধতিতে যাদুমন্ত্র, তুক-তাক, ঝাড়ফুক, তেলপড়া জলপড়া ইত্যাদি একটা উল্লেখযোগ্য ব্যাপার। বলতে বাধা নেই, আধুনিক চিকিৎসা বিজ্ঞান যখন আবিষ্কৃত হয়নি, তখন এইসবই ছিল গ্রাম সমাজের সাধারণ মানুষের একমাত্র চিকিৎসা পদ্ধতি। আধুনিক চিকিৎসা বিজ্ঞান যখন আবিষ্কৃত হয়নি, তখন এ সবই ছিল গ্রাম সমাজের সাধারণ মানুষের একমাত্র চিকিৎসা পদ্ধতি। আধুনিক চিকিৎসা বিজ্ঞান যখন উন্নত হল, তখন তা শিক্ষিত সমাজের মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল।

গ্রাম-সমাজ এদিকে তেমন আকৃষ্ট হলনা। চিকিৎসা বিজ্ঞানের ওষুধপত্রকে তারা অপদেবতার স্পর্শহাত বলে ব্যবহার করা স্বাস্থের পক্ষে হয়ত ক্ষতিকর বলে মনে করে এসব থেকে দূরে থাকত। প্রাচীন রীতি, সংস্কার বা বিশ্বাস যাই বলা যাক. আদিবাসী সমাজ আজও তা ধরে রেখেছে বলে পিছনে আটকা পড়ে আছে। কিন্তু তার জন্য দায়ী তো আমাদের সমাজ ব্যবস্থা। আধুনিক চিকিৎসা বিজ্ঞানের যাবতীয় সুযোগ-সুবিধা তাদের দ্বারে দ্বারে পৌঁছে দেওয়ার দায়িত্বকার? ব্যাধি মানুষকে সবচেয়ে দুর্বল করে দেয় আর সেই দুর্বলতাই এনে দেয় নানা কুসংস্কার। কিন্তু এসবই কি নিছক সংস্কার? আয়ুর্বেদ বিজ্ঞান ও চিকিৎসা বিজ্ঞান সুপ্রাচীন চিকিৎসা পদ্ধতি! আদিবাসী সমাজের চিকিৎসা সেই কবিরাজী মতই কিন্তু আদিবাসী সমাজের ধারণা প্রত্যেকটি রোগ ব্যাধির পিছনে একজন না একজন দেবতা বা দেবী অথবা অপদেবতা আছেন। সবরকম অমঙ্গলের জন্য তারাই দায়ী। এ সম্পর্কে তাদের কতকগুলো যুক্তি আছে। যেমন আদিবাসীদের বিশ্বাস. অতিরিক্ত ভয় বা পাপজনিত ব্যাপার থেকে আত্মাবস্তুর সাময়িক অনুপস্থিত ঘটে। এই আত্মাবস্তু স্থির না থাকলেই রোগের উদ্ভব হয়। পাপ থেকে ভয়ের উৎপত্তি এবং পাপ থাকলে কোন প্রকার মানুষ ভয় পাবে এবং রোগাক্রান্ত হবে। তাই চিকিৎসার প্রারম্ভিক পর্যায়ে শুদ্ধিকরণ অনুষ্ঠান বা 'পিউরিফিকেশন রাইট' পালন করতে দেখা যায়। এ অনুষ্ঠানের প্রধান উদ্দেশ্য শুদ্ধ করা বা পাপমুক্ত করা। গুনি ওঝাদের যাদুমন্ত্র, তেলপড়া জলপড়া প্রভৃতির সাহায্য যেমন নেয়, তেমনি গাছ গাছড়া রস. লতাপাতা ফুলের ব্যবহারও তাদের কাছে অপরিহার্য। তবে একথা সত্যি যে, চিকিৎসা বিজ্ঞান ও গাছগাছড়ার গুণাগুণ অস্বীকার করেছে। আর সাধারণ মানুষের মধ্যে ধারণা জন্মে গেছে যে যাদুমন্ত্র, তুকতাক ঝাড়ফুঁক ইত্যাদিতে আছে এক ঐন্দ্রজালিক শক্তি. রোগ নিরাময়ের জন্য ওঝা বা গুনি সে শক্তি প্রয়োগ করে। আদিবাসী সমাজ সুপ্রাচীনকাল থেকে তাদের বিশ্বাস ও প্রাচীন রীতি আঁকড়ে ধরে আছে।

আদিবাসী সমাজে ডাইনী বিশ্বাস একটা ক্ষতিকারক বিশ্বাস। এটা একটা নিদারুণ অভিশাপ। এ কুসংস্কারের জন্য বহু নিরীহ নারী নিপীড়িত হয়েছে এবং হচ্ছে। বলতে লজ্জা হয়. যেখানে বিজ্ঞানের এত অগ্রগতি সেখানে ডাইনী প্রথার মত একটা অন্ধবিশ্বাস, কুসংস্কার এবং গুপ্তবিদ্যার প্রভাব কি অনড় অবস্থায় থাকবে? আদিবাসী সমাজ কি এর গণ্ডী থেকে বেরিয়ে আসতে পারবে না। আসলে আদিবাসীরা তা পারত কিন্তু তা হচ্ছেনা একশ্রেণীর অসাধু লোকের দৌলতে। নিজেদের স্বার্থসিদ্ধির জন্যই কুসংস্কারকে যাতে আবার জাগিয়ে তোলা যায় তারই প্রকৃষ্ট নিদর্শন এই ডাইনী সন্দেহ। আদিবাসীরা বিশ্বাস করে তুক-তাক ও ইন্দ্রজাল বিদ্যায় মেয়েরাই পারদর্শী হয়। স্বাভাবিক কারণেই তারা দুর্বল। সমাজ নানা কাজে পবিত্রতা রক্ষার জন্য তাদের অনেক কিছু স্পর্শ করতে দেওয়া হয় না। বিশেষ করে,

ঋতুবতী নারীর সম্পর্কে কিছু কিছু সংস্কার পৃথিবীর সব সমাজেই প্রচলিত আছে। এই অবহেলার জন্য অনেকে ক্ষুব্ধ হয়। আর প্রতিহিংসাপরায়ণ হয়ে প্রতিশোধ নেওয়ার জন্য এ বিদ্যা আয়ত্ত করে থাকে।

এ সব মেয়েরা নিজ স্বার্থসিদ্ধির জন্য অন্যের ক্ষতি করে এবং তারা মনে করে যে অন্যের ক্ষতি করার স্বাভাবিক ক্ষমতা তাদের আছে। এ ক্ষতি হয়ত কোন অলৌকিক উপায়ে ঘটে না, কৌশলে কার্যকরণে যোগসাজই এইসব হয়ত ঘটিয়ে থাকে। আজ মানুষ যখন কোন কাজে সূক্ষ্ম বিশ্লেষণ করতে পারে না তখনই যাদুবিদ্যার কথা তার মনে হয়। স্বভাবতই সে তখন অপেক্ষারত শক্তিশালী তন্ত্রমন্ত্র জানা লোকের খোঁজ করে। ওঝা ও সখারা ডাইনীবিদ্যা কাটান করতে জানে বলে দাবি করে, জানগুরুরা ডাইনীদের সনাক্ত করে। মনে রাখতে হবে, এসবটাই অনুমানের উপর নির্ভর করে করা হয়।

সুতরাং নির্মূল না করা গেলেও প্রতিরোধ করা দরকার। শ্রীবাস্কে প্রতিরোধ সম্পর্কে ছয়টি প্রস্তাব দেন। এগুলো হল এক প্রথমে চাই শিক্ষা। বিশেষ করে স্ত্রী শিক্ষা। অজ্ঞতার জন্যই আদিবাসীদের জীবন অন্ধকারে পড়ে আছে। এ অন্ধকার দূর করতে না পারলে আদিবাসীদের উন্নতি আশা করা যায় না। তাছাড়া ডাইনী তন্ত্রের আড়ালে যে অত্যাচার, অবিচার ও শোষণ চলছে তার বিরুদ্ধে লড়াই করতে হবে।

দুই, ডাইনীবিদ্যা সম্পর্কে ভ্রান্ত ধারণা ভেঙ্গে দেওয়ার জন্য বিভিন্ন আদিবাসী সংস্থা ও ক্লাবের সহযোগিতা নিয়ে কাজ শুরু। এ ব্যাপারে তরুণ সমাজের দায়িত্ব বিশেষকরে স্মরণীয়।

তিন, ডাইনী বিদ্যার অপকারীতা সম্পর্কে নাকি লিখে আদিবাসী গ্রামে গ্রামে মনস্থ করা।

চার, ডাইনী বিদ্যার অপকারিতা, ওঝা, সখা ও জানগুরুদের কার্যকলাপ সম্পর্কে ডাকুমেচারী ছবি তুলে গ্রামগুলোতে দেখানোর ব্যবস্থা। প্রয়োজন হলে বিভিন্ন স্থানে ছবি ফটো প্রদর্শনী করে এ সম্পর্কে জনগণকে অবহিত করে তুলতে হবে।

পাঁচ, বর্হিজগতের সঙ্গে আদিবাসীদের মেলামেসা যোগাযোগ আরও গভীর হয়ে ওঠে এ ব্যাপারে দৃষ্টি দেওয়া।

ছয়, আর সর্বোপরি, এ ধরণের অজ্ঞতা প্রসূত সংস্কারকে সমূলে উৎপাটিত করার জন্যে সবচেয়ে বেশী যার প্রয়োজন সেই আইনের শাসন। এ ধরণের কোন বা উৎপীড়ন হচ্ছে জানা মাত্র প্রশাসনকে কঠোর ব্যবস্থা নিতে হবে। শাস্তির ভয় থাকলে আর কেউ এভাবে পীড়ন করতে সাহস করবে না।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

ডাইনী অঞ্চলের বর্ণনা

আজব অঞ্চল পুরুলিয়া। 'এক অর্থে প্রকৃতি যতটা নিষ্করুণ নয়, 'পুরুইল্যা' বা পুরুলিয়ায় তার চেয়ে বেশি নির্মম নিষ্করুণ পুরুলিয়ায় অকৃত্রিম, অবিকৃত অধিকাংশ অধিবাসীর জীবনের একঘেয়ে দারিদ্র্য। ভয়ঙ্কর দারিদ্র্য এবং তার কদর্য মূর্তি, চামুণ্ডার মূর্তির চেয়ে আরও ভয়ঙ্কর।'

অন্য অর্থে, লোকসংস্কৃতির গবেষণার মনোহর মূলক মালভূম-পুরুলিয়া। পুরুলিয়ার আদত প্রাকৃত জন যারা, সাঁওতাল, বাউরি, ভূমিজ, মুণ্ডা, ওঁরাও, ভাণ্ডি, মাহালি, কুর্মালি, খাসী, শবর গণ্ড প্রভৃতি, যারা এককালে জঙ্গল হাসিল করে, পাথুরে মাটির বুক চিরে ফসল ফলিয়ে পুরুলিয়ায় গ্রামবসতি স্থাপন করেছিল, তারা ক্রমে ক্রমে বাঘমুণ্ডির অযোধ্যা পাহাড়ের মত, আঁকাবাঁকা ঘন জঙ্গলে আবৃত, বিপদসঙ্কুল পার্বত্য পথে দারিদ্র্যের চূড়ায় উঠেছে এবং সেখানে নৈরাশ্যের জমাট অন্ধকারে নিরুপায় নিশ্চিহ্নতার জন্য প্রতিমুহূর্তে অপেক্ষমান। অথচ পুরুলিয়ায় সংস্কৃতি-লোকসংস্কৃতি বলতে যা বোঝায় তা কিন্তু তাদেরই উৎসব-পার্বণ, ধ্যান ধারণার, ধর্মকর্ম, নৃত্য, গীতাদির বিচিত্র অনুষ্ঠানের রঙিন সুতো দিয়ে ঠাসবুনোটের একটি গালিচা বিশেষ। বিবিধ শাস্ত্রীয় সাহিত্যে, এই প্রাকৃতজনদের পাষণ্ড দস্যু রূঢ় চোয়াড় ইত্যাদি সম্বোধনে উপহাস করা হয়েছে। যেহেতু মদ্য মাংস উপাচার যোগে তারা বিচিত্র দেবদেবীর পূজো করে, ধামসা, মাদল, ঝাঁঝ, সিঙা, বাঁশি, চ্যাড়জেটি, মদনপেড়ি, খোল বাজিয়ে কৃষ্ণ রাধার নামকীর্তন করে না অথবা নিরামিষ নৈবেদ্য দিয়ে শ্যামাপূজা করে না, তার জন্যেই পুরুলিয়া আজও গবেষক, সংস্কৃতিসেবক, কবি, সাহিত্যিক, লেখকদের অপূর্ব লীলাক্ষেত্র, জ্ঞান আহরনের উল্লেখযোগ্য পীঠস্থান।

এই জেলা আগে বিহার সরকারের অধীন ছিল। দেশস্বাধীন হওয়ার পর, মানভূম সহ দেশজুড়ে ভাষাভিত্তিক প্রদেশ গঠনের দাবী ও আন্দোলন উত্তাল হয়ে উঠলে কেন্দ্রীয় সরকার রাজ্য পুনর্গঠন কমিশন গঠন করেন। এই কমিশনের সুপারিশ ও কেন্দ্রীয় সরকারের সিদ্ধান্ত অনুসারে মানভূম জেলা খণ্ডিত করে পুরুলিয়া ও ধানবাদ দুটি জেলার সৃষ্টি হয়। ভারতের বৃহত্তম ইস্পাত কারখানা বোকারোর প্রয়োজনে পুরুলিয়া থেকে একদিকে চাষ ও চন্দনকিয়ারী থানা ছিন্ন করে নবগঠিত ধানবাদ জেলার সঙ্গে যুক্ত করা হয়। অন্য দিকে আবার টাটা ইস্পাত কারখানার স্বার্থে ও প্রয়োজনে অরণ্য ও খনিজ সম্পদে সমৃদ্ধ প্রায় ৬০০ একর আয়তনের চাণ্ডিল, ইচাগড়ও পটমদা থানা সিংভূম জেলার অন্তর্ভূক্ত করা হয়। মানভূমের অবশিষ্ট প্রস্তর-কঙ্করময় ও খরাপীড়িত ১৭টি থানায় ২,৪০০ বর্গমাইল আয়তনের নবগঠিত পুরুলিয়া জেলা ১৯৫৬ সালের পয়লা নভেম্বর পশ্চিমবঙ্গের সঙ্গে যুক্ত করা হয়। রাজনৈতিক ছলা কলার ফলে ১২৩ বৎসর পরে মানভূম জেলার ৮ হাজার বর্গমাইল আয়তন,

ধানবাদ ও পুরুলিয়া বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়। ধানবাদে বোকারো ইস্পাত কারখানা এলাকাকে সমৃদ্ধতর করে তুলেছে। আর অন্যদিকে দেশের দরিদ্রতম এবং খরাপীড়িত অঞ্চল বলে চিহ্নিত হয়েছে পুরুলিয়া জেলা। জেলার আয়তন ২,৪১০ বর্গমাইল অর্থাৎ ৬২৫৯ বর্গ কিলোমিটার এবং গ্রামের সংখ্যা ২,৪৯০। লোকসংখ্যা ১৬ লক্ষ ১০ হাজার। যা সমগ্র পশ্চিমবঙ্গের লোকসংখ্যার ৩.৫ শতাংশ। পশ্চিমবঙ্গের অন্যান্য জেলার জনবসতির ঘনত্ব যেখানে ৫০৪ জন, পুরুলিয়ার ঘনত্ব সেখানে ২৫৬ জন। মাথা পিছু গড় আয় ৭৪৭.৪০ টাকা সেখানে পুরুলিয়ায় মাথা পিছু গড় আয় ৩৪২ টাকা। আদিবাসীদের ক্ষেত্রে তা না বললেই চলে। আদিবাসীদের বাস প্রধানত পুরুলিয়ার উত্তর, দক্ষিণ ও পূর্বে। উত্তরে কাশিপুর, সাতুরিয়া ও নেতুরিয়া থানা, দক্ষিণে কায়রা, মানবাজার ১নং-এ ২টি অঞ্চল (বিসিঁড়ি ও ধানারা) মানবাজার ২নং-এ ৭টা অঞ্চল—বুড়িবাঁধ, জামতোড়িয়া, বড়গড়িয়া, বোরো, বারি, আকড়ো, দীঘি ইত্যাদি। বলরামপুর বান্দোয়ান প্রভৃতি। পূর্বে—হুড়াও পুন্চা। এছাড়া পশ্চিমে খুব অল্পসংখ্যক আদিবাসী বাস করে। ডাইনি আন্দোলন চলছে দক্ষিণ পুরুলিয়ায়। এইসব গ্রামের এসব জায়গায় যাওয়া যে কি কষ্টকর তা বলা যায় না। দক্ষিণ পুরুলিয়ার যোগাযোগ ব্যবস্থা খুবই খারাপ। অবিভক্ত মানভূম জেলার এক অংশ ১৯৭৭ সালে পশ্চিমবঙ্গে আসে। টাটার অনুরোধে ডাঃ বিধানচন্দ্র রায় তিনটি থানা বিহারকে দিতে রাজি হওয়ায় বান্দোয়ান পুরুলিয়ার রাস্তার ৭ মাইল বিহারে পড়ে যায়। বিহারের কোন কাজে লাগে না বলে বিহার সরকার ঐ ৭ মাইল রাস্তার কোন উন্নতি করেন না। আর পশ্চিমবঙ্গ সরকার পুরুলিয়া জেলার মধ্যে বান্দোয়ান থেকে পুরুলিয়া যাওয়ার রাস্তা তৈরি করেন না। ফলে বান্দোয়ান থেকে পুরুলিয়া যেতে হলে ৩২ মাইল হাঁটতে হয়। ড্যাম পার হয়ে মানবাজার গিয়ে পুরুলিয়ার বাস ধরতে হয়। এছাড়া পুরুলিয়ার অজস্র নদী, খালের উপর কোন কালভার্ট বা সেতু নেই। পুরুলিয়া বদর থেকে দক্ষিণের ঐ আদিবাসী গ্রামগুলোয় সোজাসুজি যেতে দু' তিন দিন লেগে যায়। কিন্তু বাঁকুড়া বা ঝাড়গ্রাম থেকে বাসে গেলে একদিনে পৌঁছানো সম্ভব। বাঁকুড়া দিয়ে যাওয়ার রাস্তাটা হল বাঁকুড়া থেকে ঝিলিমিলি যাওয়ার বাসে ঘন্টা ৪ চলার পর ঝিলিমিলির একটু আগে পোড়াহাটির মোড় পরে। পোড়হাটির মোড় থেকে রাস্তা চারদিকে ভাগ হয়ে গেছে। একদিক গেছে উত্তরে বাঁকুড়া, দক্ষিণে ঝাড়গ্রাম, পূর্বে ঝিলিমিলি, আর পশ্চিমে পুরুলিয়ার দিকে। এই পোড়হাটির মোড়ে নেমে পশ্চিমদিকে পায়ে হাঁটা পথে কুইলাপালের হাটের পাশ দিয়ে প্রায় ৭।৮ মাইল উঁচু নীচু আঁকা বাঁকা পথে গেলে উত্তরদিকে জামতোড়িয়া পরে। কুইলাপাল দিয়ে গেলে কোন নদী পেরোতে হয় না। কিন্তু বান্দোয়ান দিয়ে গেলে পথে কংসাবতীর শাখা নদী জ্যাম পড়ে। পারাপারের কোন ব্যবস্থা নেই। কোন কাল-ভার্ট বা সেতু নেই। কোমর বা গলা জলে নেমে নদী পার হতে হয়। ওসব ঐ অঞ্চলের মানুষদের গা সওয়া হয়ে গেছে। প্রতিদিনই একগ্রাম থেকে আর এক গ্রামে, শহর কলকাতায়, রুজি রোজগারের ধান্দায় নিয়মিত তাদের যাতায়াত

করতে হয়। সাইকেলই একমাত্র যানবাহন। একগ্রাম থেকে অন্য গ্রামে যেতে নদী পেরোতে হচ্ছে। বর্ষাকালে নদীগুলোর চেহারা হয় ভয়ঙ্কর। তখন পারাপার ভীষণ মুস্কিল। বর্ষা ছাড়া অন্যান্য সময় ভয়ঙ্করতা কম থাকলে মানুষ নদী সাঁতারিয়ে, সাইকেল; জলের মধ্যে দিয়ে টেনে নিয়ে অথবা ঘাড়ের উপরে তুলে নদী পেরোয়। প্রতিদিন এ চিত্র দেখা যায়। এই লেখককেও সংবাদ সংগ্রহ করার জন্য ১৯৭৯ সাল থেকে বর্তমান বছর পর্যন্ত বহুবার ঐ সব এলাকায় যেতে হয়েছে। আর ঐ রকম ভাবেই গামছা পরে জামা, প্যান্ট, ক্যামেরার ব্যাগ মাথায় তুলে নদী পেরোতে হয়েছে। ওপারে উঠে ভেজা জামা কাপড় ছেড়ে শুকনো কাপড় পরে। ডাইনীর সংবাদ সংগ্রহ করার জন্যও সাংবাদিক আনন্দবাজারের বিক্রম নায়ার, নিরঞ্জন হালদার, টেলিগ্রাফের মানস ভট্টাচার্য্যও একই রকম ভাবে নদী পেরিয়ে গিয়েছিলেন সংবাদ সংগ্রহ করতে।

জামতোড়িয়া ও তৎসলগ্ন অন্যান্য গ্রামগুলির অন্যতম প্রধান সমস্যা এই যোগাযোগ ব্যবস্থা। শিক্ষার প্রসারও এসব অঞ্চলে তেমন ঘটেনি। শতকরা ১০ ভাগও স্বাক্ষরনয়। জামতোড়িয়া সহ সাতটি পাড়া, যথাক্রমে, মাঝিপাড়া, কোদপাড়া, সর্দার পাড়া, এছাড়া মানবাজার ২নং ব্লকের অধীন মোট অঞ্চলের গ্রামগুলি হিসেব করলে শতকরা ৪-৫ ভাগ স্বাক্ষর জ্ঞান সম্পন্ন মানুষ পাওয়া যায়।

এখানে কোন হাইস্কুল নেই। একটি মাত্র জুনিয়ার বেসিক স্কুল। তার অবস্থাও সঙ্গীন। স্কুলে ছাত্র-ছাত্রাদের বসার জায়গা নেই। কাঁচা দেওয়ালের মাটি খসে খসে পড়ছে। ছাত্র-ছাত্রীদের পানীয় জলের জন্য কোন ব্যবস্থা নেই। আশপাশের দোকান থেকে চেয়ে খেতে হয়। স্কুলের সামনে একটা টিউব অয়েল আছে। দীর্ঘদিন ধরে তা দুমড়ে পড়ে রয়েছে। এব্যাপারে স্কুল কর্তৃপক্ষ একেবারে নীরব। হাইস্কুলের কোন ব্যবস্থা না হওয়ার ফলে ছাত্র-ছাত্রীদের নদী পেরিয়ে ৮ মাইল দূরে আগুইবিল, দক্ষিণ পশ্চিমের ৪/৫ মাইল দূরের গ্রাম বোড়ো কিংবা ১৬ মাইল উত্তরে মানবাজারে গিয়ে পড়াশোনা করতে হয়। মেয়েরাও ঠিক একইভাবে পরিশ্রম করে লেখা পড়া করছে।

আই, টি, ভি, পির টাকায় জেলা পরিষদের মাধ্যমে আদিবাসী ছেলে-মেয়েদের পাঠ্য পুস্তকের গণ্ডির বাইরে জ্ঞানের পরিধি বাড়ানোর জন্য কয়েকবছর আগে রুরাল লাইব্রেরীর পরিকল্পনা হয়েছিল। কিছুটা গাঁথা হয়েছে। কিন্তু তা এখন গরু মোষ চড়ার স্থান হিসাবে চিহ্নিত। লাইব্রেরী বাবদ খরচের জন্য অনুমোদিত টাকা তুলে নাকি খরচ করা হয়েছে। পাশের সর্দার পাড়ায় এক বাড়িতে লাইব্রেরী চালু করা হয়েছে। স্থানীয় আদিবাসী ছেলে মেয়ে বই নিতে নারাজ। কারণ ঐ অঞ্চলে শতকরা ৮০ জন মানুষই আদিবাসী। তারা আদিবাসী পত্র-পত্রিকার প্রতি যত আগ্রহী, বাংলা বা অন্য পত্র-পত্রিকার প্রতি ততটা নয়।

৬ থেকে ১২ বছর বয়সের মধ্যে প্রাথমিক স্কুলে পড়ে এমন ছাত্রদের থাকার জন্য

আই, টি, ডি, পি-র (ইন্টিগ্রেটেড ট্রাইবাল ডেভেলপমেন্ট প্রজেক্ট) টাকায় আদিবাসী আশ্রমিক হোস্টেল করার কাজ ১৯১৯ তে শুরু হয় এই জামতোড়িয়া গ্রামেই। ১৯৫৪-তে-এর নির্মাণ কাজও শেষ হয়। কিন্তু আজও তার উদ্বোধন হয়নি। ব্যবহৃত না হওয়ার ফলে দরজা জানালাগুলিতে উই ধরে গেছে। ছাদের টালি ভেঙে জল পড়ছে। সবচেয়ে বড় কথা দিনের বেলাতে গরু ছাগল ঘুরে বেড়াচ্ছে। আর রাত্রে বসছে সব রাজনৈতিক দলেরই গোপন মিটিং। পায়খানার গ্যাস পাইপ উধাও। মাঠে যারা গরু চড়াতে আসে তারা পায়খানা করে স্তূপাকার করে রেখেছে। কেন যে এটা এরকমভাবে নষ্ট হচ্ছে তা গ্রামের শিক্ষিত মানুষরা আজও বুঝে উঠতে পারছেন না, অথচ অতি সত্বর আদিবাসী হোস্টেল চালু করা অত্যন্ত জরুরী এই গ্রামে! পঞ্চায়েতের কাজ এখানে কিছু হয়নি বলে স্থানীয় মানুষের অভিযোগ। সেচের কোন ব্যবস্থা নেই। অথচ সেচের ব্যবস্থার জন্য পাশাপাশি বুড়িবাঁধ ড্যাম, জ্যামনদী, কংসাবতী ড্যাম ও কুমারী নদী আছে। কিন্তু ব্যবস্থা না থাকার ফলে এখানকার ৩০ হাজার মানুষকে শুধু বৃষ্টির উপর নির্ভর করে থাকতে হচ্ছে। তাঁরা তিন মাস ভুট্টা জুন্নর খেয়ে থাকেন। বছরের ৭ মাস দুমুটো অন্ন যোগাড় করতে আদিবাসীদের বর্ধমান, দুর্গাপুর, হুগলি, কলকাতা প্রভৃতি জায়গায় জনমজুর খাটতে যেতে হয়। এখানে আছে একটা মাত্র সাব হেল্থ সেণ্টার। ওষুধপত্র ঠিকমত পাওয়া যায় না। রোগীর অবস্থা খারাপ হলে তাকে নদী ডিঙ্গিয়ে মাইলের পর মাইল সাইকেল বা দোলনায় করে নিয়ে আসতে হয় সদর হাসপাতালে। মাঝপথে মৃত্যুও তাই এখানকার নিত্তনৈমিত্তিক ঘটনা।

এখানে জমি নিয়েও গণ্ডগোল অনেক। ১৯৫৪ সালে পুরুলিয়া জেলা বিহার থেকে পশ্চিমবঙ্গে এলে বিহার সরকার আদিবাসীদের জমির রেকর্ড হস্তান্তর করেন না। ফলে পুরুলিয়ার আদিবাসীদের জমি অ-আদিবাসীদের দখলে চলে যায়।

ফলে জমি নিয়ে বিরোধ এখানে সর্বত্র। বনবিভাগ আদিবাসীদের অনেক জমি বনবিভাগের বলে দাবি করে, দখল নেয় বা নিতে চেষ্টা করে। দক্ষিণ পুরুলিয়ার কায়রা গ্রামের অধিবাসী সাঁওতালী কবি সাহিত্যিক ও তেতরে পত্রিকার সম্পাদক মহাদেব হাঁসদার বিরুদ্ধে তিনবার মামলা করতে হয়েছিল। আদিবাসীদের জমি অ-আদিবাসীরা কিনতে পারেনা। কিন্তু অ-আদিবাসীরা ফুল পাতিয়ে (বন্ধুত্ব পাতিয়ে) আদিবাসীর নামে 'বেনামী' জমি রাখে।

আদিবাসীদের মদ খাইয়ে সর্বস্বান্ত করা হচ্ছে। নিরক্ষর আদিবাসীদের ধাপ্পা দিয়ে জমি নিজের করে নিয়ে যেমন দলিলে 'বারো' (সাঁওতালীতে বারো মানে ২) লিখে ২ বিঘের বদলে ১২ বিঘে জমি নিয়ে নিচ্ছে। সেজন্য আদিবাসীদের মধ্যে মদ ও হাঁড়িয়ার বিরুদ্ধে আন্দোলন শুরু হয়েছে। ১৯৫৪ সালের সেপ্টেম্বর মাসে মানবাজারে ৬ হাজার আদিবাসীর বিক্ষোভ মিছিলে আদিবাসী রমণীর উপর ধর্ষণকারীর শাস্তি ছাড়াও পুরুলিয়ার গ্রামাঞ্চলের সমস্ত মদের দোকানের লাইসেন্স

বাতিল করার দাবি জানান হয়। জামতোড়িয়ার এই করুণ চিত্র সরকারের নজরে আনার জন্য গত ১২ জানুয়ারি ১৯৫৪ 'খেরওয়াল গাঁওতা' নামে একটি সাংস্কৃতিক সংস্থা আদিবাসী মন্ত্রী মহেশ্বর মুর্মুকে একটি মেমোরাণ্ডাম দেন। মেমোরাণ্ডামটিতে এই অঞ্চলের বিস্তারিত অবস্থার বর্ণনা দেওয়া আছে। মেমোরাণ্ডামটি হল এরকম—

মাননীয়,
আদিবাসী মন্ত্রী,
পশ্চিমবঙ্গ সরকার
মহাকরণ—কল-১

মহাশয়,

আমরা বাঁকুড়া জেলার সংলগ্ন পুরুলিয়া জেলার বান্দোয়ান বিধানসভা এলাকার উত্তর-পূর্ব দিকে মানবাজার দুই নম্বর ব্লকের জামতোড়িরা, বড়গড়িয়া, বেলগড়িয়া, কালাপতি, বুড়িবাঁধ প্রভৃতি অঞ্চলের অধিবাসীদের সমস্যার প্রতিকারের আশায় আপনার সক্রিয় হস্তক্ষেপ প্রার্থনা করছি।

এই এলাকায় প্রায় ৩০ হাজার অধিবাসীর বাস। এর প্রায় ৯০ শতাংশ আদিবাসী। এটা খুবই গরিব এলাকা। প্রতি বছর এলাকার প্রায় প্রতিটি পরিবার থেকে গড়ে তিনজন বছরে তিনবার 'নামালে' কাজ করতে যায়। রামদাস বাস্কে সি. পি. এম-এর ১০ বছর বুড়িবাঁধের অঞ্চল প্রধান ছিলেন। তিনিও জীবিকার জন্য সপরিবারে 'নামালে' গিয়েছেন। তিনদিকে কংসাবতী ড্যাম ও ছোট ছোট নদীর জন্য বর্ষাকালে সমগ্র এলাকাটি পুরুলিয়া জেলা থেকে বিচ্ছিন্ন থাকে।

চারদিক থেকে বিচ্ছিন্ন বলে এখানে খুন, চুরি, ডাকাতি ও লুটপাট একটু বেশি হয়। বিহার সরকার ১৯৫০ সালে জামতোড়িয়ায় একটি পুলিসফাঁড়ি (আই, সি) বসিয়েছিলেন, একটি ছোট ভাঙাবাড়িতে ফাঁড়ির অফিস এবং পুলিসের থাকার জায়গা। এখানে কখনও প্রয়োজনীয় সংখ্যক পুলিশ থাকে না। এলাকার নিরাপত্তার কথা ভেবে গ্রামবাসীরা বরাবর ফাঁড়ির বদলে একটি পূর্ণাঙ্গ থানা করার দাবি জানিয়েছেন। সেজন্য জমিও দান করেন। তবুও এখানে থানা হয়নি। বরং ফুলবেড়িয়া নদীর অপর পারে বোরোতে থানা করার চেষ্টা হচ্ছে, জামতোড়িয়ার ফাঁড়ি তুলে দেওয়ার জন্য মহাকরণ থেকে নির্দেশ গিয়েছে। যার অর্ডার নম্বর—জি ও নং-১০৬৩৭-পি/এল/বি/৩-পি-৪-৮৫ তাং ৫—১১—৮০। আমরা এই আদেশ প্রত্যাহারের জন্য অবিলম্বে আপনার হস্তক্ষেপ প্রার্থনা করি।

জামতোড়িয়ায় থানা না থাকায় এই এলাকার কোন খুনের বা খুনের চেষ্টার আসামী ধরা হয় না এবং ধরলেও তাদের শাস্তি হয় না। এই চিঠির এক আবেদনকারী মহেশ্বর বেশরাকে ১৯৮৪ সালের ৩০ মে ছোটরাঙা গ্রামে দুজন খুন করতে আসে। গ্রামবাসীরা তাদের ধরে ফাঁড়িতে জমা দেয়, একজন রাত্রে ফাঁড়ি থেকে পালিয়ে যায়। কিন্তু মানবাজার থানার গাফিলতিতে কিছুই হয় না। এই এলাকাতে ১৯৮৪ সালের ২০মে

দিনের বেলায় সাঁওতালী লেখক, সমাজসেবী, প্রাথমিক শিক্ষক ও ডাইনী বিরোধী আন্দোলনের শক্তিশালী সংগঠক জাগরণ সরেন খুন হন। 'ডাইনি' প্রথার প্রতিবাদ করায় একদল লোক ১৯৫৪ সালে বড়দহি গ্রামের সুধীর টুডুকে রাতের অন্ধকারে খুন করতে যায় এবং ভুল করে লক্ষ্মণ টুডুকে খুন করে। কিন্তু সুধীর টুডুর বাড়ি আক্রমণকারীদের ধরা হয় না। সুধীর টুডুর স্ত্রী নীলমণি টুডুকে একদল মতলববাজ 'ডাইনী' অপবাদ দিয়ে মেরে ফেলার চেষ্টা করে। নীলমণি এখনও কাজের জন্য বাইরে যেতে পারে না। (এই ঘটনা কলকাতার দূরদর্শনে প্রচার করা হয়েছে)। 'ডাইনী' প্রথার বিরোধিতার জন্য সর্বজন শ্রদ্ধেয় সাঁওতালী কবি সারদাপ্রসাদ কিসকুকে বারবার খুনের চেষ্টা করা হয়। জামতোড়িয়া ফাঁড়ির পুলিশের জন্য তিনি বেঁচে যান। গত নভেম্বর মাসে ১৩ দিনের মধ্যে তিনটি খুন হয় 'ডাইনী' অপবাদে—ডাঙারডি এবং কেন্দাড়ি গ্রামের দুই মহিলা। এছাড়া কাল্লাবেড়া গ্রামের এক যুবক। ১৯৫৪ সালের ৩ জানুয়ারি কবি সারদাপ্রাসাদ কিসকুর পুকুরের মাছ লুঠ হয়।

এইসব খুন ছাড়াও জামতোড়িয়া ফাঁড়ির পাশেই গত নভেম্বর মাসে একরাতে বোমা ফাটিয়ে ডাকাতি হয়, এখনও কাউকে ধরা হয়নি। ২৬ ডিসেম্বর ফাঁড়ির পাশে পোস্ট অফিসে ডাকাতি হয়। ফাঁড়ি উঠে যাওয়ার অর্থ এলাকার লোকদের ডাকাত ও খুনীদের হাতে ছেড়ে দেওয়া।

জামতোড়িয়া ফাঁড়ির পাশেই একটি স্বাস্থ্যকেন্দ্র আছে। অনেক আন্দোলনের পর এখন এখানে একজন নার্স ও স্থানীয় ডাক্তার আছেন। বর্তমানে এখানে দশ বেডের হাসপাতালের জন্য অনেকগুলি ঘর হচ্ছে। কিন্তু নিরাপত্তার ব্যবস্থা না থাকলে এখানকার হাসপাতালের অবস্থা বাঁকুড়া জেলার রাইপুরের হাসপাতালের মত হবে। সেখানে সরকার একটি বড় হাসপাতাল করেছিলেন। কিন্তু একদিন রাত্রে দুষ্কৃতকারীরা এক নার্সের উপর হামলা করায় ডাক্তার ও নার্সের অভাবে বহু বছর হাসপাতালটি বন্ধ ছিল। এই এলাকার চিরুডি স্বাস্থ্যকেন্দ্রে ১৪ বছর যাবৎ নিরাপত্তার অভাবে কোন নার্স বা এম. বি. বি. এস ডাক্তার নেই। ঠিক একই কারণে পুলিশ না থাকলে নিরাপত্তার অভাবে জামতোড়িয়া হাসপাতালে ডাক্তার ও নার্স থাকবে না। অন্যত্র থানা হলে সেখানে পুলিশের লোকদেরও চিকিৎসার সুযোগ থাকবে না এবং থানায় আসা আহত ব্যক্তিদেরও চিকিৎসা হবে না। এই সব কারণে জামতোড়িয়ায় ফাঁড়ি বা একটি পূর্নাঙ্গ থানা থাকা দরকার। এতবড় এলাকায় একটি হাইস্কুল ছিল না। বড়গড়িয়া. জোরোবাড়ি, জামতোড়িয়া, বেলগড়িয়াতে জুনিয়র হাইস্কুল। এবছর (১৯৫৪) এলাকার এক প্রান্তে জঙ্গলে ঘেরা গোলাপাড়া জুনিয়র হাইকে হাইস্কুলে উন্নীত করা হয়েছে। জুনিয়র হাইস্কুলের ছাত্রদের দুই একজন অন্য হাইস্কুলে ভর্তি হতে পারলেও, ছাত্রীরা কোথাও ভর্তি হতে পারে না। জামতোড়িয়া সার্কেলে ৫৮টি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের জন্য জামতোড়িয়া সার্কেলের এস-আই-এর অফিস এখনও মানবাজারে। এলাকায় বসবাসের নিরাপত্তা না থাকলে জামতোড়িয়ায় কখনও অফিস

হবে না। এলাকায় স্থায়ীভাবে পুলিশ না থাকলে স্কুলগুলির, বি, ডি. ও অফিস ও হাসপাতালের কর্মীদের বেতন ডাকাতি হওয়ার সম্ভাবনা।

এই এলাকায় যে সব এম. এল. এ হয়েছেন, তাঁদের কেউই মাধ্যমিক পর্যন্ত পড়েন নি। ২নং পঞ্চায়েত সমিতির বর্তমান সভাপতি অমূল্য মাহাতো প্রাথমিক বিদ্যালয়ের পড়াও শেষ করেন নি। বুড়িবাঁধের প্রাক্তন ও বর্তমান গ্রামপ্রধান প্রায় নিরক্ষর। জেলাস্তরে মন্ত্রী, জেলা সভাধিপতি, স্কুলবোর্ডের নেতারা উত্তর পুরুলিয়ার অধিবাসী এবং ব্রাহ্মণ সম্প্রদায়ভুক্ত। তাই এলাকার সমস্যার কথা সরকারী মহলে সিদ্ধান্ত গ্রহণকারীদের কানে পৌঁছায় না। তাই আমরা আপনার কাছে এলাকার সমস্যা তুলতে বাধ্য হচ্ছি।

সুতরাং মহাশয়, আপনার কাছে আমাদের দাবি—নিম্নলিখিত দাবীগুলি পূরণের জন্য বিভিন্ন সরকারী দপ্তরকে সক্রিয় করতে আপনি উদ্যোগ নিন।

দাবীসমূহ

১। এলাকার অধিবাসীদের নিরাপত্তার কথা ভেবে জামতোড়িয়া থেকে পুলিশ ফাঁড়ি (আই. সি) তুলে দেওয়ার আদেশ অবিলম্বে বাতিল করা হোক।

২। অবিলম্বে জামতোড়িয়ায় একটি পূর্ণাঙ্গ থানা করার নির্দেশ দেওয়া হোক।

৩। জামতোড়িয়ায় দান করা জমিতে অবিলম্বে বাড়ি ও পুলিশের কোয়ার্টার করা হোক।

৪। এলাকার ৫৮ টি প্রাথমিক বিদ্যালয় ও ৪টি জুনিয়র হাইস্কুলের কথা মনে রেখে অবিলম্বে এই এলাকায় দু'টি জুনিয়র হাইকে হাইস্কুল হিসাবে অনুমোদন দিতে হবে।

৫। অবিলম্বে জোরোবাড়ি ও জামতোড়িয়া জুনিয়র হাইস্কুলে ছাত্রাবাস দুটির জন্য বাড়ি করতে হবে।

৬। বড়গড়িয়া ও বেলগড়িয়া জুনিয়র হাইস্কুলে অবিলম্বে দুটি ছাত্রাবাস তৈরি করতে হবে। প্রস্তাবিত হাইস্কুলের একটিকে আদিবাসী 'ছাত্রীনিবাস' অবশ্যই চাই এবং স্কুলগুলিতে সহ-শিক্ষা থাকায় আদিবাসী মহিলা শিক্ষয়িত্রী নিয়োগ করতে হবে।

৭। চিরুডি হাইস্কুলে ৯৫ জন আদিবাসী ছাত্র-এর জন্য ছাত্রাবাস অবিলম্বে তৈরি করতে হবে। আদিবাসী কল্যাণ দপ্তরের তদারকিতে পঞ্চায়েতের মাধ্যমে ৫ বছর যাবৎ নির্মীয়মান দুই কামরার হোস্টেল অবিলম্বে সম্পূর্ণ করতে হবে।

৮। এলাকা থেকে অন্যত্র যাতায়াতের জন্য অবিলম্বে জামতোড়িয়া-পুরুলিয়া এবং বড়গড়িয়া, জামতোড়িয়া-বাঁকুড়া বাস রুট খুলতে হবে।

৯। প্রতিবেশী বাঁকুড়া জেলায় রাণীবাঁধ ও ঝিলিমিলিতে বন্ধ করে দেওয়া খেড়িয়া আদিবাসী ছাত্রাবাস দুটি অবিলম্বে চালু করতে হবে এবং ঝিলিমিলি স্কুলের হায়ার সেকেণ্ডারি ছাত্রদের 'আদিবাসী ছাত্রাবাসে' পুনরায় ভর্তির ব্যবস্থা করতে হবে।

আশাকরি উপরি-উক্ত দাবীসমূহ কার্যকর করতে আপনার সক্রিয় সহযোগিতা পাব।

শুভেচ্ছা সহ—

মনোহর কিস্কু
সভাপতি
খেরওয়াল গাঁওতা
জামতোড়িয়া
পুরুলিয়া

মহেশ্বর বেশরা
সাধারণ সম্পাদক
খেরওয়াল গাঁওতা
জামতোড়িয়া
পুরুলিয়া

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ

ডাইনি বিরোধী আন্দোলনের সূত্রপাত

দক্ষিণ পুরুলিয়ার জামতোড়িয়ার কাছে 'লেওয়া গোড়া' গ্রাম। পৌষ মাসে বাবুরাম হেমব্রমের একটি মোষ মারা যায়। গ্রামের লোকেরা সখার কাছে গেলে সখা ৭০ টাকা ফি নিয়ে বলেন বাবুরামের এক নিকট আত্মীয়া শ্রীপতি হেমব্রমের স্ত্রী ডাইনী। সখার নির্দেশে গ্রামবাসীরা সবশুদ্ধ ৩৪০ টাকা জরিমানা এবং যে বাড়ীর মোষ মারা গেছে সে বাড়ির শান্তি স্বস্ত্যয়ন করার জন্য মেয়েটিকে বাধ্য করল। ঐ বিধবা মেয়েটি আবার সখার বাড়ি যায় গ্রামের লোকেদের নিয়ে। সখার বাড়ি বাঁকুড়া জেলার ছোটগড়া অঞ্চলে। বিধবা মেয়েটির কাছ থেকে ১০৫০ টাকা ফি বাবদ সখা নিয়ে তাকে নির্দোষ ঘোষণা করে। এরপর গ্রামবাসীরা পথ খরচ 'ধুলো উড়ানী' বাবদ আরও ১০৫০ টাকা আদায় করে। নির্দোষ প্রমাণ করার জন্য বিধবা মেয়েটিকে (১০৫০+১০৫০+৩৪০)=২৪৪০ টাকা দিতে হয়। গ্রামবাসীরা বাবুরাম হেমব্রমের কাছ থেকে ২১০০ টাকা আদায় করে। কেননা মিথ্যে একজন মেয়েকে ডাইনী করা হয়েছিল।

বাবুরাম আবার সখার বাড়িতে গেলে ঐ সখা ঝাড়গ্রামের 'সাজধরা' গ্রামের এক অপদেবতাকে দোষী করে। তা সত্ত্বেও সেই বিধবা মেয়েটির উপর গ্রামবাসীরা ক্রমাগত চাপ সৃষ্টি করল। কারণ ঐ অপদেবতা নাকি বিধবা মেয়েটির বাড়ির কাছাকাছি ঘুরছে। ঘটনার বিশ্লেষণ করলে এ ধারণা করা যেতে পারে যে শুধু টাকা খাওয়ার লোভে সখা থাকে তাকে ডাইনী সাজাচ্ছে। ব্যক্তিগত আক্রোশ মেটাবার জন্য সখার মাধ্যমে একজন আর একজনকে ডাইনী বানিয়ে নির্যাতন চালাচ্ছে। বৃহৎ আদিবাসী সমাজ সখার এই নির্যাতন মেনে চলছে। সভ্যতা বিকাশের এতগুলি বছর পেরিয়েও সভ্যতার আলো অন্য সম্প্রদায়ের মত আদিবাসী সমাজের মধ্যে সামান্যতম ছড়িয়েছে। চিকিৎসার সুব্যবস্থা আদিবাসী সমাজের মধ্যে এখনও বিস্তৃত হয়নি। ফলে চিকিৎসার অব্যবস্থার সুযোগ নিয়ে নিরক্ষর আদিবাসী সমাজকে 'ডাইনী' কুসংস্কারে বিশ্বাসী করিয়ে জমি-জমা সম্পত্তি হাতিয়ে নিয়ে গোটা আদিবাসী সমাজের মাথার উপর ছড়ি ঘোরাচ্ছে 'সখা' নামক ব্যক্তিটি।

তবে আশার কথা আদিবাসী সমাজের কিছু কিছু শিক্ষিত যুবক ও প্রধান লেখকদের মধ্যে সচেতনতাবোধ জাগ্রত হওয়ায় ডাইনী প্রথা যে ভ্রান্ত, ভুয়ো এবং ভাঁওতা তা তারা বুঝতে পেরেছে। এবং এই ধারণা জন্মাবার সঙ্গে সঙ্গে এই প্রথার বিরুদ্ধে সংঘবদ্ধ হয়ে লড়ার মনোভাব দেখা দিয়েছে। কিন্তু এর জন্য আন্দোলনকারীদের বিপদের সম্মুখীন হতে হয়েছে। 'সখা'র বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ালেই 'সখা'র লোকেরা প্রতিবাদাকাঙ্ক্ষী পক্ষের ঘর বাড়ি পুড়িয়ে ছারখার করে দেওয়ার চেষ্টা করছে। প্রকাশ্যে হত্যা করা হবে বলে শাসাচ্ছে। উল্লেখ্য দক্ষিণ পুরুলিয়ায়

মানবাজার ২নং ব্লকের অধীন বসন্তপুর, ছোটরাঙ্গা, রয়না, দাড়িকাডোবা, কুলবেড়িয়া মুকুন্দপুর, পাঁড়রা প্রভৃতি গ্রামগুলোয় ব্যাপক হারে ডাইনী প্রথা বিরোধী আন্দোলনকারীদের উপর নির্যাতন চলছে। এ প্রসঙ্গে কয়েকটি ঘটনার কথা উল্লেখ করে আমরা বইয়ের মূল বিষয়ের প্রতি ফিরে যাচ্ছি। দঃ পুরুলিয়ার বড়দহি গ্রামের লড়িরাম টুডু বহুদিন যাবৎ শয্যাশায়ী। ডাক্তার, বদ্যি দেখানো সত্ত্বেও কোন কাজ হয় না। গত ৬ মার্চ ১৯৮৪, বুড়িবাঁধ গ্রামের লিলুসখা 'ভাও' করে গ্রামের ললিন টুডুর স্ত্রীকে ডাইনী করে। লগিন টুডু সামাজিক প্রথা অনুসারে জরিমানার টাকা দিয়ে দেন। কিন্তু তিনি বাঁকুড়া জেলার কোন এক বড় সখার কাছে আবেদন 'জানান' এই রায়ের বিরুদ্ধে। এই দ্বিতীয় সখা যাকে ডাইনী সাব্যস্ত করল গ্রামের লোকের তা মনঃপুত না হওয়ায় তারা মানবাজার ব্লকের রয়না গ্রামের সূর্য বেশরার নামে এক নামী সখাকে নিয়ে আসেন তৃতীয়বার বিচারের জন্য। সে এসে গ্রামের সুধীর টুডুর স্ত্রী নীলমণি টুডুকে ডাইনী করে। জরিমানা বাবদ চায় নগদ ৬০০ টাকা। কুচকুচে কালো রঙের একটা বিড়াল, কালো রঙের একটা বড় শুয়োর, নানারঙ মেশানো পাঁচটা মুরগী (রিবা) শিং ও কালো একটা ভেড়া, যার শিং দুটো থাকবে বাঁকানো (কোড়ুম জেরেকানা ভেড়া)। অর্থাৎ সবসমেত যার আনুমানিক মূল্য ১২০০ টাকা। এর সঙ্গে 'সখা' বলে ডাইনী অপবাদ থেকে মুক্তি পেতে গেলে যজ্ঞ শান্তি (নিমছা নিমছি) বাবদ আরও ১০০ টাকা দিতে হবে। এবং গ্রামবাসীগণকে 'সখা'র সমান অর্থ দিতে হবে খাওয়া দাওয়া করে আনন্দফূর্তি করার জন্য।

সুধীর এবং তাদের পরিবারের বন্ধু মিলন টুডু 'সখা'র এই বিধান মানতে রাজী হয় না। এখান থেকেই শুরু হয় ডাইনী বিরোধী আন্দোলন। তারা দুজন বলে সখার এ সমস্ত 'বুজরুকি মানি না মানব না।' ।' তারা প্রচার অভিযানে নেমে পড়ে। প্রচার করে যে লড়িরাম টুডুকে কোন ভাল হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া উচিত, ডাইনী ধরা এক কুসংস্কার ব্যতীত আর কিছু নয়। 'সখা'র দল রেগে গিয়ে ১৬ মার্চ গ্রামের মোড়লকে দিয়ে এক গ্রামসভা ডাকলেন। সেখানে সুধীরের বিচার হল। এই বিচারের দিন সুধীরের এক মামা কালাপতি গ্রামের অধিবাসী প্রাক্তন কংগ্রেস (ই) এম. এল. এ. শীতল হেমব্রমও উপস্থিত ছিলেন। সভায় সর্বসমক্ষে সুধীর, শীতল এবং তাদের অনুগামী চক্রধর টুডু নির্ভয়ে ঘোষণা করলেন তারা ভূত-প্রেত-ডাইনী এসব মানে না। প্রকাশ্যে এই কথা বলার সঙ্গে সঙ্গে সখার দলের লোকেরা ওদের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে। চলে লাথি, জুতোপেটা ও সাইকেলের চেন দিয়ে মার। চক্রধরের নাক ফেটে রক্ত বেরোয়। সঙ্গে সঙ্গে তাকে জামতোড়িয়া হাসপাতালে ভর্তি করা হয়।

সুধীর ও মিলন টুডুও এর প্রতিবাদ করতে গিয়ে বেধড়ক মার খায় সখার পক্ষের লোকদের কাছে। সুধীর বেশি প্রতিবাদ করায় টাঙ্গি দিয়ে সুধীরকে কেটে ফেলতে উদ্যত হলে পর সুধীর মিলন দুজনে পালিয়ে যায়। কিন্তু সুধীরের বদলে সেই

ধারালো টাঙ্গি গিয়ে পড়ে 'সখা'র দলের লোক লক্ষণ টুডুর গলায়, সঙ্গে সঙ্গে সে মারা যায়। সুধীরের বদলে লক্ষণ টুডুকে কেটে ফেলা হয়েছে, এ ধারণা যখন তাদের জন্মায় এবং সুধীর-মিলন পালিয়ে গিয়ে সারদাবাবুর বাড়িতে আশ্রয় নিয়েছে এখবর যখন 'সখা'র লোকদের কাছে পৌছয় তখন তারা ছোটে সারদাবাবুর বাড়ির দিকে। সুধীর-মিলকে না পেয়ে সামনে সারদাবাবুকে পেয়ে সমস্ত রাগ গিয়ে পড়ে সারদাবাবুর উপর। তাকে তখন কেটে ফেলতে উদ্যত হয় সখার লোকজন। বিপদ বুঝে বাড়ির মেয়েরা এগিয়ে আসে। বাধা দেয়। সারদাবাবুকে নিয়ে কিছুক্ষণ টানা হেঁচড়া চলে। সারদাবাবুর বিপদের খবর ইতিমধ্যে জামতোড়িয়া পুলিশ ফাঁড়ির অফিসার ইনচার্জ রামকমল মণ্ডলের কাছে পৌছে যায়। তিনি দুজন কনস্টেবল নিয়ে সাইকেলে করে রওনা হতে প্রস্তুত হওয়ায় গ্রামের একজন মোটর বাইক দিয়ে তাকে তাড়াতাড়ি যাওয়ার জন্য সাহায্য করে। ফলে তড়িঘড়ি পুলিশ এসে পড়ায় আক্রমণকারীরা হতবাক হয়ে যায়। এবং সোজা পালিয়ে বাঁচে। সে যাত্রা সারদাবাবুর প্রাণ বেঁচে যায়।

লক্ষণ টুডুকে হত্যা করার পর সখার দলের লোক এবং স্থানীয় রাজনৈতিক দল (সি-পি-এম) দাবি করে যে লক্ষণ তাঁদের দলের একজন সক্রিয় কর্মী ছিল। কিন্তু গ্রামের লোকেরা জানে যে লক্ষণ কোনদিনই কোন দলের কর্মী ছিল না। আর যদিই বা থাকত তাহলে তিনদিন লোক পড়ে থাকত না, দিনের দিন বা পরের দিনই সেই লাশ নিয়ে বনার্চ্য শোভাযাত্রা বেরুত।

লক্ষণ টুডুর হত্যার ঘটনায় পুলিশ সুধীর ও মিলনকে গ্রেপ্তার করে। তাদের বিরুদ্ধে কেস করা হয় কোর্টে। কয়েক মাসের জন্য জেলে পাঠানো হয়। ২৭ জুন থেকে ইণ্ডিয়ান পেনাল কোডের ৩০২ ধারা অনুযায়ী পুরুলিয়ার ডিষ্ট্রিক্ট জেলে সুধীর ও মিলন আটক ছিল। ১৯৫৪ সালে মহাষ্টমীর দিন সুধীর-মিলন জামিনে খালাস পেয়ে গ্রামে ফেরে। কিন্তু তারা বড়দহি গ্রামের বাড়িতে সোজা যেতে সেদিন পারেনি। এসে উঠেছিল দাড়িকাডোবা গ্রামে সারদাবাবুর বাড়িতে।

সুধীর-মিলন যে গ্রামে ফিরে আসছে এ খবর আগেই পৌছে গিয়েছিল গ্রামে। সকাল থেকেই টাঙ্গি তীর-ধনুক নিয়ে বড়দহি, দারিকাডোবা গ্রামের মধ্যেই কিছু লোককে, সন্দেহজনক ভাবে সারদাবাবুর বাড়ির আশেপাশে ঘোরাঘুরি করতে দেখা গেছে। একথা এক চিঠির মাধ্যমে জামতোড়িয়া পুলিশ ফাঁড়ির ও, সি রামকমল মণ্ডলকে জানান সারদাবাবু।

রামকমলবাবু নিজে ক্ষোভের সঙ্গে জানালেন যে তিনি নিজে উদ্যোগী হয়ে ডাইনী প্রথার পক্ষে ও বিপক্ষে দুই তরফকে ডেকে আপোসে ব্যাপারটা মিটিয়ে নিতে আহ্বান জানিয়েছেন। ডান-ডাইনীর বিপক্ষে যারা, তাঁরা তার কাছে এসেছেন। কিন্তু পক্ষের দলের লোকেরা নানা রকম অজুহাত দেখিয়ে ছল চুত করে এড়িয়ে

গেছেন। কেউ আসেননি। কথা প্রসঙ্গে তিনি একটি কঠিন বাস্তব চিত্রের সঙ্গে পরিচয় করালেন—

জামতোড়িয়া পুলিশ ফাঁড়ি। পুলিশ ফাঁড়ি না গুদাম ঘর তা বোঝা যায় না। কোন দরজায় পাল্লা নেই। জানালার শিকগুলো সবই ভাঙা। সবশুদ্ধ তিনটে ঘরের একটাতে অফিস। দুটোর মধ্যে কনস্টেবল এবং তিনি থাকেন। লোকবলও কম। মাত্র ৭ জন কনস্টেবল থাকারই কথা। ৩ জন তো অর্ডার হওয়া সত্ত্বেও মেডিকেল দেখিয়ে ছুটি নিয়ে বসে রয়েছেন। কাজে যোগ দিচ্ছেন না। একজন এ, এস আই ছিলেন। সম্প্রতি তিনি রাইপুর থেকে বদলি হয়ে এসেছেন। আসামী ধরে এনে আলাদা করে রাখার জায়গা নেই, এক সঙ্গেই থাকতে হয়। যে কোন মুহূর্তে খুন হয়ে যেতে পারেন।

বিরোধীদের আক্রমণের ডায়েরী

* ১৬ মার্চ ১৯৫৪ সারদাবাবুকে আক্রমণ করার পর থেকেই ডাইনী বিরোধী আন্দোলন কারীদের উপর ডাইনীর পক্ষের আক্রমণ আজও তীব্র আকার ধারণ করে। নিত্য নতুন পরিকল্পনা করে চলে নির্যাতন, অত্যাচার এবং প্রাণনাশের চেষ্টা।

* ২২ মার্চ সখার দল সারদাবাবুর এবং চক্রধর টুডুর বিষয় সম্পত্তি লুট করার চেষ্টা করা হয়।

* ২৩ মার্চ গোয়ালাপাড়া প্রাইমারী স্কুলে ডাইনী প্রথা কি করে বন্ধ করা যায় তার সভা সেরে ফেরার পথে সারদাবাবু আক্রান্ত হন।

* ২৩ জুন বরদহি গ্রামের ললিন টুডু ও সুধীর টুডুকে খুন করতে গিয়ে ভুলক্রমে লক্ষণ টুডুকে খুন করার প্রতিশোধ নিতে টাঙ্গি, তীর ধনুক নিয়ে সারদাবাবুর বাড়ি আক্রমণ করে। সারদাবাবু অন্ধকারে চুপিসারে পালিয়ে বাঁচেন।

* ২৮ জুন সারদাবাবুকে খুন করার জন্যে আবার চেষ্টা করা হয় জামতোড়িয়া ফাঁড়ি থেকে ফেরার পথে গোলাপাড়ায়। সারদাবাবু কোনক্রমে সেদিন আবার প্রাণে বেঁচে যান। এরপর থেকে সারদাবাবু ৪ জুলাই পর্যন্ত বাড়িছাড়া হন। তার বাড়ি দারিকাডোবা থেকে ১ কিঃমিঃ দূরে জোরোবারিতে নতুন পুলিশ ক্যাম্প বসেছে দেখে ৫ জুলাই তিনি বাড়ি ফেরেন।

* ৩০ মে 'রয়না' গ্রামের অধিবাসী খেরওয়াল গাঁওতার সম্পাদক সাঁওতালী সাহিত্য পরিষদ পুরুলিয়ার সদস্য মহেশ্বর বেশরাকে তাঁর শ্বশুরবাড়ি 'ছোটরাঙ্গা' গ্রামে হত্যা করার চেষ্টা করা হয়। ক্রমাগত দিনের পর দিন হত্যা, কুপিয়ে খুন হয়ে চলায় স্থানীয় নিরক্ষর, নিরীহ আদিবাসীদের জীবনে নেমে আসে বিপর্যয়। যেকোন মুহূর্তে প্রাণনাশের আশঙ্কায় সবাই শঙ্কিত। ডাইনী বিরোধী আন্দোলনকারীদের সঙ্গে তীর-ধনুক, টাঙ্গি নিয়ে চলা ফেরা করতে হচ্ছে। এমন কি মাঠে পায়খানা করতে গেলেও সঙ্গে অস্ত্র রাখতে হচ্ছে। পুলিশ প্রশাসন এখানে একেবারেই অচল। ছোট একটি

পুলিশ ফাঁড়ির অধীনে যেখানে ৭টা অঞ্চলের প্রায় ৫৬ হাজার মানুষ রয়েছে। সর্বোপরি সেখানে একটা গ্রাম থেকে আর একটা গ্রামে যেতে গেলে প্রায় ৪।৫ মাইল উঁচু নীচু পাহাড়ী পথে, ঘন জঙ্গলের উপর দিয়ে সাইকেল চালিয়ে বা পায়ে হেঁটে যাওয়া ছাড়া কোন গত্যন্তর নেই। মোদ্দা কথা পুলিশের নিজেদেরই কোন নিরাপত্তা নেই। সবচেয়ে বড় কথা মারদাংগা খুনো খুনী হওয়ার সংবাদ পাওয়া গেলেও তড়িঘড়ি করে যাওয়ার কোন উপায় নেই। এছাড়া জামতোড়িয়া ফাঁড়ির অধীনে ঘটনা ঘটছে, কিন্তু ও সি জানতে পারছেন না কতদূর কাজ এগোচ্ছে। কারণ, ফাইল মানবাজার থানার অধীনে চলে যায়। তারা কিছু প্রয়োজনবোধ করে না কিছু জানানোর। আদির্বাসী সমাজের ডাইনী প্রথা নিয়ে স্থানীয় রাজনৈতিক দল ও 'দখা' কে মদত দিচ্ছে। অবাধে প্রকাশ্যে খুন করে চলেছে। কিছু করার নেই। ইতিমধ্যে একটি ঘটনায় স্থানীয় রাজনৈতিক দলের নেপথ্যে কার্যকলাপ ধরা পড়ে যায়। ২০ মে বসন্তপুর নিবাসী জুনিয়র হাইস্কুলের প্রধান শিক্ষক, মানবাজার ২ নং ব্লক কংগ্রেস (ই) কমিটির সম্পাদক, আদিবাসী ও তপশিলী পরিষদ পুরুলিয়া জেলার সম্পাদক, সাওতালী অ্যাসোসিয়েশন সুসার গাঁওতার জেলা সভাপতি এবং ডাইনী বিরোধী আন্দোলনের একজন সহযোদ্ধা জাগরণ সরেনকে প্রকাশ্য দিবালোকে ধারালো টাঙ্গি দিয়ে কুপিয়ে কুপিয়ে হত্যার করে। (পরবর্তী অধ্যায়ে বিস্তারিত রিপোর্ট দেওয়া আছে)

এই রাজনৈতিক দলের লোকেরা এরকম নারকীয় হত্যাকাণ্ড করেছে অথচ সরকারের মন্ত্রীরা প্রকাশ্যে তা অস্বীকার করেছে।

ছোটরাজা গ্রামের প্রাক্তন অঞ্চল প্রধান এবং সি. পি এমের সক্রিয় কর্মী রামদাস বাস্কে গোলাপাড়ায় একটি মিটিং করে ডাইনী বিরোধী আন্দোলনকারীদের হুমকি দেয়। অথচ রাম দাস বাস্কেকে জিজ্ঞেস করাতে তিনি বলেন ডাইনী প্রথাকে তিনি মানেন না। এ প্রথা আদৌ আছে কিনা তা তিনি বিশ্বাসও করেন না। কিন্তু বৃহৎ আদিবাসী সমাজ যেহেতু এই প্রথায় বিশ্বাসী তাই তাকেও মুখ বুজে থাকতে হচ্ছে। রামদাসের একথা কিন্তু গ্রামের শিক্ষিত ব্যক্তিদের কাছ থেকে শোনা গেল না। বরং শোনা গেল তার হুমকি অত্যাচারের কিছু ঘটনা।

কলকাতার ইংরেজী, বাংলা প্রত্যেকটি সংবাদপত্রে, ম্যাগাজিনে এই সমাজের শিক্ষিত বুদ্ধিজীবি লেখক, এবং ডাইনি বিরোধী আন্দোলনকারীদের উপর যে রকম অকথ্য নির্যাতন চলেছে তার আলোকপাত হওয়ায় এবং সবক্ষেত্রে সি. পি. এমের দুর্নীতির বিভিন্ন তথ্য ফাঁস হয়ে যাওয়ায় সি. পি. এম পার্টি থেকে প্রচারিত এক লিফলেটে বলা হয়েছে কলকাতার পত্রপত্রিকাগুলো এলাকার কয়েকজনের ভাবমূর্তি উজ্জ্বল করার চেষ্টা করছে। কংগ্রেসের প্রচারিত লিফলেটে ডাইনী প্রথা ও তার বিরোধী আন্দোলনকে সমাজের সামাজিক সমস্যা বলে বর্ণনা করা হয়েছে। খুন আর নির্যাতন সামাজিক বিচারের নামে যে রেহাই পেতে পারে পুরুলিয়ায় না গেলে তা বোঝা যাবে না। কারণ আদিবাসীদের মতে পুরুলিয়া জেলার এম. এল. এ আদিবাসী হলেও কংগ্রেস, সি. পি. এম ও ঝাড়খণ্ড মুক্তি মোর্চাকে নিয়ন্ত্রণ করছে মাহাতোরা।

সামাজিক অবিচারের নামে যে অবিচার দীর্ঘদিন চলছে সে সবের কোন প্রতিবাদ সি-পি-এম এম-এল এ সুধাংশু মাঝি এবং প্রাক্তন কংগ্রেসের এম-এল-এ শীতল হেমব্রম করেন নি। যদিও শীতল হেমব্রম ঘটনাচক্রে তার ভাগ্নে সুধীর টুডুর 'শশুরাল' উৎসবের আমন্ত্রণ রক্ষা করতে গিয়ে ডাইনী প্রথা মানেন না বলে সি-পি-এম গোষ্ঠীর কাছে ভীষণ মার খেয়েছেন।

ডাইনী প্রথা নিয়ে খুনো খুনি বন্ধ করার জন্য সরকার একেবারেই নীরব। পশ্চিমবঙ্গ সরকার কর্তৃক ডাইনী প্রথার বিরুদ্ধে বাংলা ও সাঁওতালী ভাষায় পোস্টার ছাপা হয়েছে কিন্তু বাঁকুড়া, পুরুলিয়ায় ঐ পোস্টার পৌঁছিয়েছে বহুদিন পরে। রাইটার্স বিল্ডিং-এর চার দেওয়ালের মধ্যে আটকানো ছিল। সরকার ডাইনী অপবাদ মিথ্যা নামে পোস্টার ছাপিয়েছেন বটে কিন্তু আদিবাসী অধ্যুষিত এলাকায় গেলে দেখবেন দেওয়ালে মারা পোস্টার দেখে বাচ্চারা পোস্টারের উপর একটি মেয়েকে জলন্ত পোড়ানোর ছবি দেখিয়ে বলছে হ্যাঁ ডাইনী আছে। সরকার তো বলেছে ডাইনী আছে। ঐ তো ডাইনীকে পুড়িয়ে মারা হচ্ছে। ডাইনী যদি না থাকত তাহলে ঐ মেয়েটাকে পোড়ানো হচ্ছে কেন?

ডাইনী বিরোধী আন্দোলনকারীদের চাপে পড়ে 'সথাদের ডাইনী ধরার নামে গরিব ও নিরক্ষর আদিবাসীদের ভারতীয় ফৌজদারী আইনের ৪২০ ধারায় প্রতারণার অভিযোগে গ্রেপ্তার করে মামলা রুজু করা হয়। জামতোড়িয়া পুলিশ ফাঁড়িতে এরকম অভিযোগ করা হয়েছে রয়না গ্রামের সূর্য সথার বিরুদ্ধে। কিন্তু আদালত অবধি তা পৌঁছয়নি। মাঝপথে চেপে দেওয়া হয়েছে। এসবের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়া, নিরক্ষর আদিবাসীদের শিক্ষিত করে তোলা এবং সর্বোপরি চিকিৎসার ব্যবস্থা করা দরকার। কেননা চিকিৎসা ব্যবস্থার সুরাহা হলে রোগ ব্যাধি হলে পর কেউ সথার কাছে না গিয়ে ডাক্তারের কাছে যাবে। ওষুধ ব্যবহার শিখবে। মৃত্যুর হারও কমবে এবং সথা নামক ব্যক্তিটিরও অশিক্ষিত মানুষদের মাথায় হাত বুলিয়ে জমিজমা হাতিয়ে নেওয়া, জরিমানা বাবদ টাকা পয়সা লুটে নেওয়ার পথ বন্ধ হবে। অবিলম্বে এসব ব্যবস্থার আশু সমাধান করার জন্য সরকারকে অগ্রণী হওয়া উচিত। না হলে ডাইনী বিরোধী আন্দোলনকারী লেখক, কবি, বুদ্ধিজীবী শিক্ষিত, প্রবীন ও যুবকদের কিছু অঘটন ঘটলে সমস্ত দায় বর্তমান সরকারের উপর বর্তাবে। কলকাতার প্রত্যেকটি কাগজ (ইংরেজী ও বাংলা)-এ বার বার একথা লেখা সত্ত্বেও কিন্তু কোন ভূমিকা সরকারি প্রশাসনের ছিল না। নীরব দর্শকের মত চুপ করে বসে আছে প্রশাসন। এর ফলে চরম বিপর্যয়, চরম অঘটন, চরম নৃশংস হত্যাকাণ্ড ঘটে গেল। ডাইনী বিরোধী আন্দোলনকারীদের একজন বড় সংগঠক, বড় যোদ্ধা বসন্তপুর জুনিয়র হাইস্কুলের প্রধান শিক্ষক, সুসার গাঁওতার সভাপতি, লেখক, বুদ্ধিজীবি ও সমাজসেবী জাগরণ সরেনকে হত্যা করা হল প্রকাশ্যে। ডাইনী বিরোধী আন্দোলনকারীদের মনোবলকে ভেঙে দেওয়ার এটা একটা পরিকল্পনা। কেন তাকে হত্যা করা হল? কিভাবে তাকে হত্যা করা হল? এবং কারা তাকে মারল—এর নেপথ্য কাহিনী একমাত্র এই লেখকই সংগ্রহ করেছিল ঐ গ্রামে গিয়ে। নিজের জীবন বিপন্ন করেও একটি সাইকেল নিয়ে একা গিয়েছিলাম ঐ গ্রামে। এবারে সেই ঘটনায় আসি।

সপ্তম পরিচ্ছেদ

জাগরণ সরেন হত্যার নেপথ্য কাহিনী

২০ মে ১৯৫৪ রবিবার। সাত সকালে জাগরণ সরেনের পিসির বাড়ি যাওয়ার কথা। পিসতুত ভাই লালবিহারীর নাকি মাথায় গণ্ডগোল দেখা দিয়েছে। খবরটা আগের দিনই পাঠানো হয়েছিল। লোক মারফত জাগরণ বাবুর যাওয়ার খবর পৌঁছে গেছে পাড়রা গ্রামে। বসন্তপুর থেকে পাঁড়রা গ্রামের দূরত্ব বড়জোর দেড় কিলোমিটার। পাশের ঘোড়ধরা গ্রামে রবিবার হাট বসে। সাঁওতাল সমাজে এসময় মহুয়া ফুল বিক্রি করার ধুম পড়ে যায়। হাটেই কানাঘুষায় খবর পাওয়া যায় প্রথমে। তখন বেলা এগারোটা হবে। পাঁড়রা গ্রামের কাছে একটি জঙ্গলে কেনাকি খুন হয়েছে? কে খুন হয়েছে তা জানতে পারা যায়নি প্রথমে। একটা ভীত সন্ত্রস্তভাব সারা হাটে ছড়িয়ে পড়ে মুহূর্তের মধ্যে।

খারাপ খবর ছড়িয়ে পড়তে সময় লাগে না। সমস্ত এলাকায় জাগরণ সরেনের মৃত্যুর সংবাদ ছড়িয়ে পড়ে কয়েক ঘণ্টার মধ্যেই। সারা বসন্ত পুরের মানুষ সেদিন ছুটেছিল পাঁড়রা গ্রামের দিকে। কলকাতায় 'আজকাল' পত্রিকা দপ্তরে সংবাদটা পৌঁছয় সংবাদপত্র দপ্তরের টেলিপ্রিণ্টারের মাধ্যমে। এছাড়া ব্যাক্তিগত ভাবে সাঁওতাল সমাজের সর্বজন শ্রদ্ধেয় বরেণ্য কবি সারদাপ্রসাদ কিসকু যিনি ডাইনী বিরোধী আন্দোলনের প্রধান পথপ্রদর্শক, উনি আমাকে চিঠি লিখে এই নৃশংস হত্যাকাণ্ডের সংবাদ জানান। অন্যদিক বন্ধুবর মহাদেব হাঁসদাও খবরটা আমাকে জানান। এদের চিঠি পাওয়ার পর হত্যার রহস্য সন্ধানে ঐ এলাকায় যাই।

বসন্তপুর পুরুলিয়ার দক্ষিণের প্রত্যন্ত অঞ্চলের একটি গণ্ডগ্রাম। গ্রামটা ঘিরে রেখেছে পাঁড়রা, জামতোড়িয়া, ধরমপুর, ডাঙ্গরডী, মুকুন্দপুর, বরো, ছোটরাঙ্গা, দাড়িকাডোবা রয়না প্রভৃতি গ্রাম। এগুলো সবই মানবাজার ২নং ব্লকের অধীন। পুরুলিয়া শহর থেকে সোজা বসন্তপুর যেতে গেলে তিনদিন লেগে যায়। বাঁকুড়া থেকে বাসে ঝিলিমিলি গিয়ে, সেখান থেকে ১৭/১৮ মাইল পায়ে হেঁটে গেলে একদিনে বসন্তপুর পৌঁছন সম্ভব। খুব ভোরে একটা সাইকেল নিয়ে, নিজে চালিয়ে উঁচু নিচু দুর্গম পথ অতিক্রম করে প্রায় ১ ঘণ্টায় পৌঁছলাম বসন্তপুর গ্রামে। গ্রামটি ছোট। লোকবসতি প্রায় ৫০০০। জাতিতে সবাই আদিবাসী। সাঁওতাল সম্প্রদায়ের সংখ্যাই বেশি। কিছু আছে ভূমিজ, লেপচা, খেড়িয়া প্রভৃতি।

জাগরণ বাবুর বাড়িতে ঢোকা মাত্র একজন মহিলা প্রশ্ন করলেন—'কোইথা থাককে আসছ বটে'। সাংবাদিক হিসাবে পরিচয় দেওয়ার আগে বললাম মুকুন্দপুরের কবি বালেশ্বর পাঠিয়েছে। একজন খাটিয়া এনে দিল বসার জন্য। পরিশ্রান্ত শরীরের ঘাম

মুছছি এমন সময় ১৬/১৭ বছর বয়সের একটি মেয়ে এসে এক ঘটি স্বচ্ছ জল পায়ের কাছে রাখল। মাটিতে কপাল ঠেকিয়ে নমস্কার করল। প্রতি উত্তরে আমাকেও উঠে দাঁড়িয়ে নমস্কার করতে হয়। সাঁওতালী প্রথা অনুযায়ী অতিথিকে সর্বপ্রথমে এরকম ভাবেই অভ্যর্থনা জানানো হয়। শুধু তাই নয়, সঙ্গে দেওয়া ঐ জল নিয়ে মুখ হাত পায়ে জল দিতে হবে। দেরি করলে ওরা ভাবে তাদের প্রতি অশ্রদ্ধা করা হচ্ছে। তারা সাঁওতাল বলে জল ছুঁতে ঘৃণা হচ্ছে।

মেয়েটিকে ডেকে জিজ্ঞেস করলাম। জাগরনবাবু তার কে হন? মেয়েটি জানাল যে সে জাগরনবাবুর ছোট মেয়ে। নাম অমলা সরেন। মানবাজার গার্লস্ স্কুলে নবম শ্রেণীতে পড়ে। ওখানকার হোস্টেলেই থাকে। ওঁরা পাঁচ ভাই বোন। সবাই পড়াশুনা করে। দিদির বিয়ে হয়ে গেছে।

অমলা যখন আমায় নানা প্রশ্নের উত্তর দিচ্ছিল। এই ফাঁকে লোক জড় হতে শুরু করেছে। ক্ষেতের কাজ ফেলে শিশু থেকে ছেলে বুড়ো সবাই এসে ভিড় করেছে বাড়ির উঠোনে। ইতিমধ্যে চাপাকান্নাও শোনা যায়।

পরিস্থিতি ক্রমশঃ এমনই করুণ হয়ে উঠল যে তখনই কোন প্রশ্ন করার ইচ্ছে থাকলেও অবকাশ হয়নি। অবস্থা যখন একটু থিতিয়ে এল, উঠোনের এক কোনায় শাল কাঠের একটা খুঁটি ধরে বিধবার বেশে দুজন সাঁওতাল মহিলাকে দেখলাম। ওরা দাঁড়িয়ে আঁচলের খুঁট দিয়ে চোখ মুছছে, এঁরা দুজনেই জাগরনবাবুর স্ত্রী। বয়সের ছাপ চোখে মুখে ফুটে উঠেছে। বড় পানসড়ি সরেন আর দ্বিতীয় জন কর্ণলতা সরেন। এঁরা দুজনই সহোদরা। ঘটনার বিবরণে জানা যায়, পাঁড়রা গ্রামে লালবিহারীকে দেখে বাড়ি ফিরছিলেন জাগরনবাবু। বেলা তখন সাড়ে ন'টা। পাঁড়রা গ্রামে ঢোকার মুখে পায়ে চলা ও সাইকেল চলায় রাস্তার পাশে একটা ছোট জঙ্গল পড়ে। তার যে কেউ প্রাণনাশ করবে! কোনদিন কেউ ঘুনাক্ষরে ভাবেননি। বাড়ীর কেউই কোনদিন সন্দেহ করেননি। জাগরনবাবুও কোনদিন কোন সন্দেহ প্রকাশ করেননি।

পুলিশের জেরার ফলে প্রত্যক্ষদর্শী এক কাঠুরের জবানবন্দী থেকে জানা যায় জাগরনবাবু যখন জঙ্গলের পাশ দিয়ে সাইকেল চালিয়ে বাড়ি ফিরছিলেন, তখন কয়েকজন ষণ্ডা মার্কা চেহারার লোক তীর ধনুক, টাঙ্গি দিয়ে জঙ্গলের মধ্যেই পিছন দিক থেকে ছুটে আসে। তার কাছাকাছি এসে তাকে লক্ষ্য করে প্রথমে তারা তীর ছোঁড়ে। পর পর তিনটি তীর গিয়ে তার পিঠে ও শেষে বুকে লাগে। তীরে এফোঁড় ওফোঁড় হয়ে যায় তার বুক। ফিনকি দিয়ে রক্ত ঝরতে থাকে। জাগরনবাবুর সারা শরীর তখন রক্তে লাল। ক্ষতবিক্ষত হয়েও তিনি শেষ পর্য্যন্ত পালিয়ে আসার চেষ্টা করেন। কিন্তু বেশিদূর এগোতে পারেন না। টাঙ্গি দিয়ে সজোরে কোপ মারে তার গলায়। দেহ থেকে মুণ্ডুটাকে আলাদা করে দেয় গুণ্ডরা। হত্যাকারী লোকগুলো সোজা চলে যায় উত্তর দিকে।

পুলিশের ভূমিকা কি ছিল? এ প্রশ্নে স্থানীয় এক ক্ষোভান্বিত যুবককে জিজ্ঞেস

করতে সে বলে—পাঁড়রা গ্রাম থেকে পুলিশ ফাঁড়ি অনেক দূরে। খুন হওয়ার সংবাদ পৌঁছয় সেখানে অনেক দেরিতে। জামতোড়িয়া পুলিশ ফাঁড়ির ভারপ্রাপ্ত ইনচার্জ তখন ছিলেন রামকুমার মণ্ডল। এখন তিনি বদলি হয়ে গেছেন। সেই সময় তিনি ওয়ারলেসের মাধ্যমে মানবাজার থানা এবং পুরুলিয়া জেলে খবর পাঠিয়েছিলেন এবং গাড়ির রিকুইজিসন করেন। মানবাজার থেকে গাড়ী এলে পর, লাশ তুলতে গেলে বসন্তপুর এবং পাঁড়রা গ্রামের লোকেরা প্রতিবাদ করে, এবং বাধা দেয়। তারা লাশকে ঘিরে দাবি করে পুলিশ কুকুর এনে আসামীদের ধরতে হবে।

পুলিশ এবং গ্রামবাসীদের মধ্যে বাকবিতণ্ডা ক্রমশ যখন তুঙ্গে ওঠে তখন পুরুলিয়া, মানবাজার থেকে পুলিশ চলে আসে। এস-পি পুরুলিয়া, অ্যাসিষ্ট্যাণ্ট এস, পি পুরুলিয়া, ও, সি জামতোড়িয়া ফাঁড়ি সবাই মিলে অবস্থা আয়ত্বে আনার আপ্রাণ চেষ্টা করে এবং গ্রামবাসীদের বোঝাতে থাকে কুকুর এনে এখনই তদন্ত করা কি করে সম্ভব ? লাশটাকে আগে মর্গে পাঠানোর ব্যবস্থা করা প্রয়োজন কিন্তু গ্রামবাসীরা কিছুতেই তা মানতে রাজী হয়না। অগত্যা পুলিশ পরে কুকুর আনতে বাধ্য হয়। জামতোড়িয়া ফাঁড়ির ও, সি জানিয়েছিলেন—সেদিন অবশ্য নয় পরে কুকুর আনা হয়েছিল আসানসোলের বার্ণপুর থেকে। ওখানে কোন এক আসামীকে ধরার জন্য কলকাতা থেকে কুকুর আনা হয়েছিল। 'অত্যন্ত জরুরী' এই তারবার্তা পাঠিয়ে শেষ পর্যন্ত কুকুর নিয়ে আসা হয়, জাগরণ সরেনের খুনীকে ধরার জন্য। গ্রামবাসীদের চাপে পুলিশ কুকুর আনায়, অভিযুক্তরা ধরা পড়ে। এরা পাঁড়রা গ্রামেরই বাসিন্দা। নাম বুদ্ধেশ্বর পাল ও লক্ষণ সরেন। উভয়েই সি-পি-এম সমর্থক। এরপর পুলিশ বুদ্ধেশ্বরের দাদা ভোলানাথ সরেনকেও গ্রেপ্তার করেছিল। পুলিশের কাছে ধৃত আসামীদের জবানী অনুসারে সবশুদ্ধ ২১ জন দুষ্কৃতকারীর নাম পাওয়া যায়। এর মধ্যে পঞ্চায়েত প্রধান লক্ষণ হাঁসদা ও পঞ্চায়েত সমিতির সদস্য পরমেশ্বর মুর্মুও ছিল। অন্যান্য ধৃত আসামীদের তালিকায় উল্লেখযোগ্য আসামীরা হল উমেস মাণ্ডি, শ্যামাপদ টুডু, অশ্বিনী হেমব্রম, রমেশ মাণ্ডি প্রমুখ।

জাগরন সরেনকে তার নিজগ্রাম বসন্তপুর জুনিয়র হাইস্কুলের সংলগ্ন ফাঁকা জায়গায় কবর দেওয়া হয়। এবং স্মৃতির উদ্দেশ্যে একটি সমাধি নির্মাণ করা হয়েছে।

জাগরন সরেনের হত্যাকাণ্ড সংঘটিত হওয়ার পর থেকে বসন্তপুরের গ্রামবাসীদের মনে একটা ভ্রান্ত ধারনা ঢুকিয়ে দেওয়া হয়েছে যে এই খুন রাজনৈতিক রেশারেশির ফল। কিন্তু জামতোড়িয়া, ফুলবেড়িয়া, ধরমপুর ডাঙরডী, বসন্তপুর ও পাঁড়রা গ্রামের সচেতন শিক্ষিত আদিবাসী যুবক ও প্রবীনবৃদ্ধরা তা মানতে রাজি নন। ঘণ্টার পর ঘণ্টা তাদের সঙ্গে কথা বলে দেখেছি যে জাগরন সরেন রাজনৈতিক দল কংগ্রেসের সক্রিয় কর্মী হলেও সমাজ উন্নয়নমূলক যে কোন কাজে দলমত নির্বিশেষে যে কোন রাজনৈতিক দলের নেতাদের সঙ্গে হাত মিলিয়ে কাজ করতে সমান আগ্রহী ছিলেন। কাজও করেছেন প্রচুর। ব্যক্তি হিসাবে জাগরনবাবু সবার প্রিয় ছিলেন। তিনি কোন জাত বা বিশেষ সম্প্রদায় নিয়ে আলাদা কোন আন্দোলন করেননি। পঞ্চায়েত

প্রধান বা ঐ ধরনের ক্ষমতায় তিনি কোনদিনই ছিলেন না অথচ বহু গ্রামোন্নয়ণ মূলক কাজ করেছেন। 'মাস্টার' বলেই তিনি পরিচিতি ছিলেন বেশি। গরিব দুঃখীদের জন্য তার মন সবসময় কাঁদত। যখন, যে কোন মুহূর্তে তার দরবারে সাহায্য প্রার্থী হলে বিফল হয়ে কেউ ফিরে আসত না। রাত দুটোর সময় গেলেও তিনি উপকার করার জন্য অগ্রণী হতেন।

জাগরন সরেনের পরিবারের প্রায় প্রত্যেকেই সদালাপী, পরোপকারী, লোকের সঙ্গে কথা বলতে ভালবাসে। এহেন মানুষটিকে কেউ কোনদিন এরকম নৃশংসভাবে খুন করবে তা বসন্তপুর, পাঁড়রা গ্রামের মানুষ ভাবতে পারেনি। তাদের মুখে একটা কথা 'এ সমাজে সংব্যক্তির কোন মূল্য নেই।'

জাগরণ সরেন জনপ্রিয় সাহিত্য পত্রিকা তেতরে'র সম্পাদক এবং অ্যামনেষ্টি ইন্টারন্যাশনলের সদস্যও ছিলেন। ডাইনী বিরোধী আন্দোলনে এর বলিষ্ঠ ভূমিকা ছিল।

মানবাজার ২নং অঞ্চলে কংগ্রেসের শক্তি সম্প্রতি বৃদ্ধি পাচ্ছিল। দ্বিতীয় পঞ্চায়েত নির্বাচনে বেশ কয়েকটি আসন এখানে কংগ্রেসের দখলে যায়। গ্রাম পঞ্চায়েত ও পঞ্চায়েত সমিতিতে (জামতোড়িয়া ও বড়গোড়িয়া) কংগ্রেস সংখ্যাগরিষ্ঠতা পায়। 'সুসার গাঁওতা' নামে একটি সংস্থা অ-রাজনৈতিক দল হিসাবে প্রতিষ্ঠিত হয়। কিন্তু অনেকে কংগ্রেস সমর্থিত দল হিসাবে চিহ্নিত করে। এই সংস্থার সঙ্গে যুক্ত ছিলেন সারদাপ্রসাদ কিসকু, গোমস্তাপ্রসাদ সরেন, মহাদেব হাঁসদার মত বিশিষ্ট বুদ্ধিজীবীরা। কোন কারণে 'সুসার গাঁওতা' থেকে এঁরা চলে যান। এঁরা বেরিয়ে যাওয়ার পর থেকে সংস্থাটি ক্রমশঃ দুর্বল হতে থাকে। তখন জাগরনবাবু নিজে উদ্যোগী হয়ে সুসার গাঁওতার উপর সদস্যদের আস্থা ফিরিয়ে আনার জন্য নিরলস প্রচেষ্টা চালান। ঘন ঘন গাঁওতার মিটিং ডেকে চাঁদা তুলতে থাকেন। সাধারণ বার্ষিক সম্মেলন নিজ গ্রাম বসন্তপুরে করার সিদ্ধান্ত পাকা করে নিয়েছিলেন। এর জন্য অভ্যর্থনা কমিটিও গঠন করেছিলেন। সম্মেলন হওয়ার কথা ছিল জুন মাসে। স্বভাবতই জাগরনবাবুর এই বলিষ্ঠ পদক্ষেপ ও উদ্যমের কথা জেনে বিরোধী পক্ষর মনে ভীতি সঞ্চার হবার কথা। জাগরনবাবুর প্রভাবে তাদের মনে সংশয় দেখা দেয়।

গোয়ালাপাড়া ল্যাম্পস্ সমিতির অফিস বর্তমানে শুশুনিয়া গ্রামে হয়েছে। জাগরন-বাবুও এর একজন সদস্য। আগামী কিছুদিনের মধ্যে সমিতির বার্ষিক সম্মেলন হওয়ার কথা ছিল। তৎকালীন বিধানসভা নির্বাচনে জয়লাভের জন্য জাগরণবাবু জোর তৎপরতা করেছিলেন। তার ব্যাপক প্রচার অভিযান দেখে তখনই ধরে নেওয়া হয়েছিল জয় অবশ্যম্ভাবী।

জাগরন সরেনের হত্যার উল্লেখযোগ্য সূত্র পাওয়া যায় ২৯ এপ্রিলের এক ঘটনায়। সাঁওতালী মহাকবি সাধুরামচাঁদ মুর্মুর ৮৮তম জন্মজয়ন্তী উৎসব পালন উপলক্ষে সাঁওতালী সাহিত্য পরিষদ, পুরুলিয়ার উদ্যোগে জামতোড়িয়া পুলিশ ফাঁড়ির সামনে 'হাট' মাঠে সারাদিন ধরে কবির কবিতা পাঠ ও জীবনী আলোচনা এবং রাত্রে

সাঁওতালী নাটক মঞ্চস্থ করা হয়। ঠিক ঐ দিনই পাঁড়রা গ্রামে সাধুরাম চাঁদের জন্ম জয়ন্তীকে উপলক্ষ করে রাত্রে নাটক মঞ্চস্থ হয়। নাটকটির নাম 'রড়চ্ মায়াম হেড্চে জিউরি' (শোষিত রক্ত ফুটন্ত প্রাণ)। লেখক মনীন্দ্রনাথ মুর্মু। নাটকটির কয়েকটি দৃশ্যে স্থানীয় রাজনৈতিক দল সি-পি-এমের সন্দেহ হয় যে নাটকটিতে ঝাড়খণ্ড পার্টির আন্দোলনকে সমর্থন করা হয়েছে। এবং এর সঙ্গে সি-পি-এমের দুর্নীতিকে তুলে ধরা হয়েছে। কাজেই ঐ নাটক মঞ্চস্থ করতে দেওয়া হবে না। লেখক মনীন্দ্রনাথ সেদিন অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন। নাটক মঞ্চস্থ করতে দেওয়া হবে না দেখে তিনি প্রতিবাদ করে ওঠেন। তিনি জানতে চান এতদিন আপনারা চুপ করে ছিলেন কেন? নাটকের কোন কোন অংশ আপত্তিজনক তা এই মুহূর্তে জানানো প্রয়োজন। প্রয়োজন-বোধে এক্ষুনি তা সংশোধন করা হবে। কিন্তু নাটক কিছুতেই বন্ধ করতে দেওয়া হবে না, কেননা দূর দূর গ্রাম থেকে জঙ্গলের দুর্গম পথ পায়ে হেঁটে মানুষ এসেছে নাটক দেখতে। নাটক না হলে তাদের আর করার কিছু থাকবে না। সারা রাত মাঠে-ঘাটে শুয়ে কাটাতে হবে। বড় অদ্ভুত ঘটনা ঘটল। মনীন্দ্রবাবুর এই কথার পর প্রতিবাদ মুখর রাজনৈতিক দল কোন কথা বলতে নারাজ হয়। তারা শুধু বললে— এ নাটক বন্ধ করতে হবে এক্ষুণি। শেষ পর্যন্ত নাটক দলের লোকেরা সশস্ত্র প্রহরার মাধ্যমে তাদের অনুষ্ঠান শেষ করে। এদিকে ক্ষিপ্ত সি-পি-এম দলের লোকেরা আক্রমণের জন্য প্রস্তুত হয়। তবে সেই মুহূর্তে কিছু করতে তারা সম্ভবত সাহস পায়নি।

পাঁড়রার ঐ দিনের ঘটনার সংবাদ যখন জামতোড়িয়ার উৎসব অনুষ্ঠানে এসে পৌছয় তখন কলকাতা থেকে একজন মাত্র সাংবাদিক হিসাবে সেদিন উপস্থিত ছিলাম। সি-পি-এমের এরকম গণ্ডগোল বাধাবার খবরে গোটা জামতোড়িয়া সন্ত্রস্ত হয়ে পড়ে। কয়েক মুহূর্তের জন্য অনুষ্ঠানের ছন্দপতন ঘটে। পাঁড়রা গ্রামের ঢেউ এ গ্রামে আছড়ে পড়তে পারে এই ভয়ে সবাই তখন সদা সতর্ক। যাই হোক, শেষপর্যন্ত কিছু হয়নি।

তিনমাস পর যখন আবার এসব অঞ্চলে এসে পর পর ঘটে যাওয়া মর্মান্তিক ঘটনা-গুলো এবং জাগরনবাবুর হত্যার প্রকৃত কারণ খুঁজছি তখনই কথা প্রসঙ্গে জানলাম যে মনীন্দ্রবাবু আগে সি. পি. এম সমর্থক ছিলেন। ১৯৮২ সালের ১৯ সেপ্টেম্বর পাঁড়রা গ্রামেরই এক নিরীহ আদিবাসী গুহিরাম সরেনের পরিবারের বিষয়সম্পত্তি লুট, নষ্ট এবং তাঁর বাড়িতে আগুন ধরিয়ে দিয়ে তাঁকে সপরিবারে ১৩ জন পুষ্যিসমেত ভিটে মাটি ছাড়া করার ঘটনার পর থেকে, পার্টির সক্রিয় কর্মী হয়েও পার্টির এরকম জঘন্যতম ক্রিয়াকলাপে নিদারুণ তিনি মর্মাহত হন। অবশ্য প্রকাশ্যে সেদিন তিনি কিছু বলতে সাহস করেননি। পাঁড়রা, বসন্তপুর, ধরমপুর, ডাঙ্গড়ী গ্রামের প্রায় অর্ধশতাংশ মানুষ জানে পার্টি ছেড়ে দেওয়ার ফলে মণীন্দ্রবাবুর উপর আক্রোশ জন্মায়। আক্রোশের আকার এমন অবস্থায় পৌছোয় যে তাকে খুন করার পরিকল্পনা ইতিমধ্যে হয়ে গেছে। অন্ততঃ এলাকার অধিবাসীদের তাই ধারণা ছিল।

গুহিরাম সরেনের ঘটনা এবং মনীন্দ্রবাবুর পার্টি ছাড়ার ঘটনার পর সি-পি-এম দলের মধ্যে বিভেদ সৃষ্টি হয়। কিছু লোক মনীন্দ্রবাবুর পক্ষ সমর্থন করে। একদিকে মনীন্দ্রবাবু আর অন্যদিকে গ্রাম পঞ্চায়েত লক্ষণ হাঁসদা, পঞ্চায়েত সমিতির সদস্য পরমেশ্বর মুর্মু প্রমুখ।

যে গ্রামের প্রায় শতকরা ৯৯ ভাগ মানুষ ১৯৭৭ সালের পর থেকে লাল পতাকার নিচে ছিল। সেখানে হঠাৎ ভাঙন দেখা দেওয়ায় সি-পি-এম সমর্থকদের মনে ভীতির সঞ্চার হয়। তাদের সন্দেহ হয় এ ব্যাপারে বিরোধী দলের নেতা জাগরন সরেনের হাত নিশ্চয়ই আছে। এই অনুমানের উপর ভিত্তি করেই জাগরন সরেনকে মারা হয়েছে বলে বরো, শুশুনিয়া, বসন্তপুর, কুমারী, ভাকরডী, গোয়ালাপাড়ার মানুষ মনে করে। তাদের এই মনে করা আরও দৃঢ়ভাবে বদ্ধমূল হয় যখন তারা দেখে পুলিশ 'কুকুর' আনিয়ে পাঁড়রা গ্রামেরই বাসিন্দা সি-পি-এম এর সক্রিয় দুই কর্মী বুদ্ধেশ্বর পাল ও পরমেশ্বর মুর্মুকে ধরা হয়। তখন থেকেই তারা ধরে নেয় যে এর পিছনে ক্ষমতাসীন রাজনৈতিক দলের কারসাজী আছে।

জাগরনবাবুকে হত্যা করার পিছনে যে দুজনকে ধরা হয়েছে, এদের দুজনের রাজনৈতিক হাতেখড়ি জাগরণবাবুর কাছে। এমন কি বুদ্ধেশ্বর পালের চাকরির ব্যাপারেও জাগরনবাবুর হাত ছিল। তখন বুদ্ধেশ্বর কংগ্রেসের লোক। ১৯৭৭-এর পর থেকে সি. পি. এমের সঙ্গে হাত মেলায়। এখন সি. পি. এম পার্টি ছাড়া ঝাড়খণ্ড মুক্তি মোর্চার দলেও আছে। এই দুজন ছাড়া বসন্তপুর, পাঁড়রা গ্রামের প্রায় প্রত্যেক যুবকদের, রাজনৈতিক জীবনের হাতে খড়ি জাগরনবাবুর হাতে। এ প্রসঙ্গে উল্লেখ করা যেতে পারে ঝাড়খণ্ড মুক্তি মোর্চার নেতা হরিপদ হাঁসদা (বসন্তপুর গ্রাম) সত্যনারায়ণ মুর্মু (চিরুডী, রাধানগর গ্রাম) সি-পি-এম নেতা এবং ঝাড়খণ্ড মুক্তি মোর্চার গত বিধানসভার প্রার্থী একজন বড় নেতা কালিপদ কিসকু (দুন্দলু) এবং কংগ্রেসের বর্তমান অনেক নেতাই জাগরনবাবুর সঙ্গে ঘুরে ঘুরে রাজনীতি শিখেছেন। কংগ্রেস ক্ষমতায় এলে এসব নেতারা আবার কংগ্রেসে ফিরে আসার চেষ্টা করতেন এ বিশ্বাস স্থানীয় রাজনৈতিক সচেতন মানুষের ছিল এবং আছেও। জাগরনবাবুকে হত্যা করার আরও একটি কারণ, জাগরনবাবু ডাইনী প্রথার বিরোধী আন্দোলনকারী সারদবাবুদের দলের একজন ছিলেন। তাঁর সংগঠন শক্তি এবং জনপ্রিয়তা এত ছিল যে তাকে যদি কোনরকমে ঘায়েল করা যায় তাহলে সারদাবাবুর আন্দোলন পঙ্গু হয়ে যাবে। সেই উদ্দেশ্যেই এ হত্যা বলে মনে করেন ডাইনী বিদ্বেষী আন্দোলনকারীরা।

জাগরণবাবুকে হত্যা করার পর পুলিশ প্রশাসন আজ প্রায় অকেজো হয়ে পড়েছে। পাঁড়রা গ্রাম জামতোড়িয়া পুলিশ ফাঁড়ির অধীনে। কিন্তু জাগরনবাবুর তদন্ত করছেন মানবাজার থানার ও, সি। আজও তার কোন সুরাহা হয়নি। বরং জাগরনবাবুর হত্যাকারীদের চাকরি মিলেছে। বেশ বহাল তবিয়তে তারা ঘরে বেড়াচ্ছে।

অষ্টম পরিচ্ছেদ

কয়েকটি ঘটনা ও সুধীর-মিলনের মামলা

১৯৮৪ সালের অষ্টমী পুজোর দিন জামিনে সুধীর মিলন ছাড়া পাওয়ার পর বাড়ি চলে আসে (যে কথা আগেই বলা হয়েছে)। তখন থেকে আদালতে আর কোন মামলা চলেনা। কেসটা ধামা চাপা পড়ে যায়। এরপর ওদের উপর বহুবার আক্রমণ করার চেষ্টা করে সখার দল। প্রত্যেকটি বিপদ থেকে ওরা বেঁচে যায়। ইতিমধ্যে ডাইনী বিরোধী আন্দোলনের প্রধান পথপ্রদর্শক সারদাপ্রসাদ কিসকু হঠাৎ পক্ষাঘাতে আক্রান্ত হন। তার ডানদিক পুরোপুরি অকেজো হয়ে পড়ে। আন্দোলন-কারীদের মনোবল ভেঙে যায়। 'সখার' দৌরাত্ম্য বেড়ে ওঠে আরও চরমে। তীব্র আন্দোলনের ফলে 'সখারা' বিপর্যস্ত হয়ে পড়েছিল। এলাকায় তেমন ঘটনা ঘটত না। প্রায় বন্ধই হয়ে গিয়েছিল। কিন্তু সারদাবাবুর অসুস্থতার সুযোগে পরপর ঘটে গেছে অনেক ঘটনা। সেই ঘটনাগুলো উল্লেখ করে সুধীর-মিলনের মামলার ফলাফল কি হল সে সম্পর্কে ফিরে যাব।

বড়কদম গ্রাম

১৯৮৪-র আগস্ট মাসের শেষ সপ্তাহে পুরুলিয়া জেলার মানবাজার ২নং ব্লকের অধীন বরকদম গ্রামের এক দরিদ্র চাষী লালমোহন মাণ্ডির স্ত্রী চুনুমণি মাণ্ডিকে প্রথমে ডাইনী বলে চিহ্নিত করে, পরে তাঁকে ডাইনী বদনাম থেকে মুক্তি দেওয়ার পণ হিসেবে ৬০০০ টাকা জরিমানা করে জোরবাঁধের লীলু সখা। লালমোহন ছাগল-ভেড়া বন্ধক রেখে ৩০০০ টাকা দিয়েছেন। কিন্তু বাকি ৩০০০ টাকা এখনও দিতে না পারায় আবার তাঁর স্ত্রীর প্রাণনাশের হুমকি দেওয়া হয়েছে। ফলে লালমোহন প্রাণ ভয়ে তাঁর পরিবার নিয়ে ভিটে মাটি ছেড়ে পালিয়ে আসেন পাশের গ্রামে।

ঘটনাটি ঘটে শ্রাবণ মাসের শেষ দিকে। অর্থাৎ ইংরেজী আগস্টা মাসের ১৩-১৪ তারিখে। সেপ্টেম্বরের শেষ দিকে খবরটা দেন সাঁওতালী লেখক মহাদেব হাঁসদা। খবর পেয়ে আমি ৭ অক্টোবর বরকদমে যাই। আমাকে সাইকেলে চাপিয়ে নিয়ে যান বড়দহি গ্রামের যুবক সুধীর টুডু।

অনেক চেষ্টা করে গুপ্ত স্থান থেকে লালমোহনকে উদ্ধার করি। ভয়ে সন্ত্রস্ত। কারুর সঙ্গেই দেখা করতে চান না। তাঁর কাছ থেকে জানতে পারলাম, কিছুকাল আগে বরকদম গ্রামের ডুংরিপাড়ায় লীলু টুডু নামে একজন টাইফয়েড রোগে মারা যায়। গ্রামবাসীরা এই মৃত্যুকে স্বাভাবিক মৃত্যু বলে ধরেন না। ফলে তাঁরা সন্দেহ করেন, লীলুকে ডাইনিতে খেয়েছে। ঠিক হয়, জোরবাঁধের গণক আরেক লীলু হেম-

ওমকে দিয়ে গুনিয়ে দেখতে হবে। লীলু গণক মন্ত্র পড়ে গুণে বলে যে লালমোহনের স্ত্রী চুনুমণি নাকি আগের লীলুকে খেয়েছে। অথচ এর আগে আরেক গণক নাকি গুণে বলেছিল, লীলুকে খেয়েছে কোন এক ফুলমণি টুডু। কিন্তু ফুলমণির ক্ষেত্রে নাক শোকাশুকি হয়ে যায় এবং চুনুমণির ওপর অত্যাচার শুরু হয়।

বরকদমের এই ঘটনায় খবর জামতোড়িয়া ফাঁড়িতে ঠিক সময়ে পৌছে যায়। মেজবাবু সঙ্গে সঙ্গে আসেন মীমাংসার জন্য। কিন্তু সখার দল এসব তোয়াক্কা করে না। পুলিশ এখানে সম্পূর্ণ অসহায়। লালমোহনকে পরিবার সমেত গ্রামে ফিরিয়ে নিয়ে যেতে পুলিশও সাহস পাচ্ছে না। কেসটা এখন মানবাজার থানার বড়বাবুর হাতে। স্থানীয় রাজনৈতিক দল সি পি এমের অঞ্চল প্রধান রাধানাথ মাহাতো নিজে না এসে লোক পাঠিয়েছিলেন মীমাংসার জন্য। কিন্তু কিছুই হয় নি আজ পর্যন্ত। স্থানীয় লোকেদের অভিযোগ ঝাড়খণ্ড মুক্তি মোর্চা প্রকাশ্যে এই সখাদের সমর্থন করছে।

লালমোহন-চুনুমণিদের চোখে মুখে এখনও আতঙ্কের ছাপ। যে কোন মুহূর্তে মৃত্যু ঘটতে পারে। তাঁদের আবেদন, পশ্চিমবঙ্গ সরকার কি এসব নিয়ে কিছুই করতে পারেন না?

টিপুড়ি গ্রাম

পুরুলিয়ার মানবাজার। ২ নং ব্লকের জামতোড়িয়া পুলিস ফাঁড়ির কেষ্টপুর মৌজায় 'টিপুড়ি' গ্রামের বাসিন্দা লম্বধর কিসকু। তাঁর স্ত্রী টুসুবালা কিসকুকে ডাইনি করে একঘরে করে রাখা হয়েছে। জরিমানা বাবদ অনেক টাকা জিনিস দেওয়া সত্ত্বেও মুক্তি হয়নি। কবি সারদাপ্রসাদ কিসকুর একটি চিঠি ২৮ জুন ১৯৮৯ পেয়ে ৩০ জুন ওখানে যাই। টিপুড়ি গ্রামটি এমনই জায়গায় যে, সেখানে একা হাওয়া খুবই কষ্টকর। জামতোড়িয়া ফাঁড়ি থেকে ৮ কিঃমিঃ দূরে গ্রামটি। 'খেরওয়াল গাঁওতা' নামে একটি সংস্থা তাদের এক সদস্য মন্মথ বাস্কের মোটর বাইকে যাওয়ার ব্যবস্থা করেছিলেন। পথ পেরতে কখনও জঙ্গল, কখনও নদী বা পাহাড়। ক্ষেতের মাঝখানে আলের পথ ধরে হেঁটে, মোটরবাইক টেনে একেবারে সন্ধ্যের মুখে হাজির হলাম টিপুড়ি গ্রামে। নিস্তব্ধতা ভেঙে যখন মোটরবাইক গ্রামের মধ্যে ঢুকল, তখন এঘর ওঘর থেকে উৎসুক মেয়েবউরা উঁকিঝুঁকি মারছে। একটা বাড়ির সামনে একজন লোককে দেখে জিজ্ঞেস করলাম লম্বধরের বাড়িটা কোথায়? ও হাত নেড়ে একটা বাড়িকে দেখিয়ে চুপ হয়ে গেল। বাড়িটার কাছে গিয়ে ডাকাডাকি করছি, কিন্তু কোন সাড়া নেই। দেখলাম দরজা বন্ধ। ঠেলা দিতে একটু ফাঁক হল। একটা বাচ্চা ছেলে এসে পাশে দাঁড়াতে ওকে বললাম ভেতরে গিয়ে ডাকতে। ও একছুট মারল, পালানোর সময় বলল 'নাই যাবেক ওদের ঘর, ওরা···।' বাচ্চা ছেলেটাও খুবই সচেতন এই ব্যাপারে। দরজা ঠেলে সঙ্গী মন্মথ বাস্কে ভেতরে গেল। ঘরে এসে বলল কেউ নেই। প্রতিবেশী একজন এলেন। তিনি এসে বললেন মনে হচ্ছে ক্ষেতে গেছে। পেছনের দরজা দিয়ে বেরিয়ে এদিক ওদিক কিছুক্ষণ তাকিয়ে বললেন না কেউ নেই। এত কষ্ট করে এসে ফিরে

যেতে হবে জেনে খুবই খারাপ লাগছিল। ফেরার প্রস্তুতি নিচ্ছি, এমন সময় লোকটা ছুটে এসে জানাল যে ডাইনি হয়েছে তার মেয়ে আসছে। আবার দাঁড়ালাম। ওকে জিজ্ঞেস করে বাবা মার সন্ধান পেতে পারি ভেবে। মেয়েটি জল আনতে গিয়েছিল। তাকে বাবা-মার সংবাদ জিজ্ঞেস করাতে সে জানাল মা-বাবা দুজনেই বিক্রম ভিটা গেছে। বিক্রম ভিটা কোথায়? জেনে নিল মন্মথবাস্কে। এদিকে অন্ধকার হয়ে আসছে। এরকম দুর্গম রাস্তা দিয়ে আবার ফিরতে হবে। ওর সঙ্গে কথা বলে তেমন আশানুরূপ কোন খবর না পেয়ে ফেরার আবার প্রস্তুতি নিচ্ছি, এবার দেখা গেল দূরে মেয়েটির বাবা-মাকে আসতে। ওরা এলে ঘরের খাটিয়ায় বসে কথা হল। লম্বধর জানালেন "চৈত্র মাসে তাঁদের গ্রামের হারাধন মাণ্ডির মেয়ে কাজল মাণ্ডির বসন্তরোগ হয়। বোঙার কাছে মানসিক করেছিল সেরে যাবার জন্য। কাজল মাণ্ডি ভাল হয়ে যায়। কিন্তু গ্রামের একের পর এক বাড়িতে রোগটা ছড়াতে থাকে। পাঁঠাবলি দেওয়া হয়। বহু রক্তপাত হয়েছে গ্রামে। গাঁয়ের লোক মনে করল গ্রামে ডাইনি আছে এবং সেই এসব করছে। তারা সব 'সখা ঘর' গেল। বিহারের 'মেঘাদা'র সখার কাছে গেল। সখা শুনে লম্বধর কিসকুর স্ত্রী টুসু-বালা কিসকুকে ডাইনি করল। ডাইনি যখন করা হয়েছে তখন জরিমানা দিতে হবে। গাঁয়ের লোককে আধমন চাল, একটা খাসি, ওঝাকে ১৫০ টাকা নগদ, একটা ছাগল, ৭টে কুক্‌রা (মুরগি) ১টা শুয়োর, চাল ৫ সের, ৪ কেজি গুড়, এসব নিয়ে পঞ্চায়েতের কাছে যাই। জামাই দুলাল মুর্মু বাড়িতে ছিল। ওকে ওরা ধরে নিয়ে গিয়ে এক রাতের মধ্যে ১২৫০ টাকা আদায় করে। এত সব নিয়েও তারা আমাদের বয়কট করে, একঘরে করে রাখে, লম্বধর আবার জানালেন, একঘরে করে রাখা অবস্থাতেই ১১ জুন গ্রামের দুজন তুলসী মাণ্ডি, তুলা মাণ্ডি তাঁর বাড়িতে চড়াও হয়। ঘর থেকে টেনে বার করে বেদম প্রহার করে তাঁকে। ঘর থেকে সদর দরজা পর্যন্ত হিঁচড়ে নিয়ে গিয়ে বাইরে বের করার চেষ্টা করে। লম্বধর বাধা দিলে মোটা লাঠির বাড়ি মেরে মাথা ফাটিয়ে দেয়। পিঠেও জখম করে।

কোনরকমে লম্বধর সে যাত্রা প্রাণে বেঁচে যান। যেদিন এ ঘটনা ঘটে সেদিনই লম্বধর জামতোড়িয়া ফাঁড়িতে যান। কিন্তু পুলিস আজও আসামীদের ধরেনি। ওটা সাঁওতালদের সামাজিক সমস্যা বলে এড়িয়ে যাচ্ছে। আসামী দুজন ঝাড়খণ্ডের সমর্থক। পুলিস এদের দুজনকে কিছু করছে না দেখে খেরওয়াল গাঁওতার তরফ থেকে সম্পাদক মহেশ্বর বেশরা ও সভাপতি মনোহর কিসকু জামতোড়িয়া ফাঁড়িতে ডেপুটেশন দেন। লম্বধরের স্ত্রী টুসুবালা কিসকু জানালেন, গ্রামের পুকুরে জল নিতে দেয় না। দূরে বহাল থেকে জল নিয়ে আসতে হয়। পাড়ার লোকদের সঙ্গে ওরা মেশে না। সামনের দরজা বন্ধ থাকে, পেছনের দরজা দিয়ে ক্ষেতে যায়, যাতায়াত করে। লম্বধর জানালেন বেদম প্রহারে ১৩দিন মানবাজার হাসপাতালে তিনি ভর্তি ছিলেন। লম্বধরের ব্যাপারে জামতোড়িয়া ফাঁড়িতে খোঁজ নিতে গিয়ে দেখলাম, এস আই বংশীলাল মাহাতো নেই। অসুস্থ, বাড়িতে আছেন। ডেকে আনা হল তাঁকে। তিনি সম্পূর্ণ মিথ্যা

তথ্য দিলেন। বললেন লম্বধরের কেসটা মিটমাট হয়ে গেছে। ও বিষয়ে আর না লেখাই ভাল। অথচ লম্বধর পরিষ্কার জানালেন, কোন মিটমাটই হয়নি। গণ্ডগোলের সময় পুলিস এসেছিল। বলেছিল মিটমাট করে দেবে। কিন্তু পাঁচ/ছয় মাস হতে চলল পুলিস আর এদিকে আসে না। মিটমাট হওয়া তো দূরের কথা, লম্বধরের সামনে এখন সমূহ বিপদ। ওদের গ্রামছাড়া করে দেবার চেষ্টা চলছে। গ্রামছাড়া করলে লাভ কি? লাভ এটাই যে লম্বধরের কোন ছেলে নেই। একটি মাত্র মেয়ে, তার বিয়ে দিয়ে দিয়েছে। ২ বিঘে জমি আর এই বাড়িটা আছে। ওদের তাড়ালে এগুলো সব হাতানো যাবে। 'খেরওয়াল গাঁওতা'র সম্পাদক মহেশ্বর বেশরা ও সভাপতি মনোহর কিসকু জানালেন যতদিন না লম্বধরের টাকা ফেরত দেওয়া হচ্ছে ততদিন তার সংগঠন আন্দোলন চালিয়ে যাবে।

৬ জুলাই ১৯৮৯। 'আজকাল' পত্রিকায় প্রকাশিত আমার এই রিপোর্টটি সারদাবাবু বা খেরওয়াল গাঁওতার কর্মীদের কাছে ১৮ জুলাই পর্যন্ত পৌঁছয়নি। ফলে ১৮ জুলাই সারদাবাবু আমাকে একটি চিঠি লেখেন। চিঠিতে তিনি লেখেন—'টিপুড়ির লম্বোধর কিস্কু সস্ত্রীক আমাদের কাছে এসেছিল। তার এখনও মনের জোর আছে। গোপালপুর গ্রামেও কিছুদিন আগে একটা ডাইনীর ব্যাপার ঘটেছে। এখন ডাইনীর বাড়ীর সকলেই ঘরছাড়া হয়ে আছে। দেখা যাক, ব্যাপারটা কতদূর গড়ায়। শুনেছি, টিপুড়ি গ্রামের ব্যাপারটা 'আজকালে'-এ প্রকাশিত হয়েছে। অনেক চেষ্টা করেও ঐ কাগজ যোগাড় করতে পারিনি। সম্ভব হলে দয়া করে একটা পাটিয়ে দিবেন। ইতি আপনাদের সারদাপ্রাসাদ কিসকু। (১৮।৭।৮৯)। চিঠির সঙ্গে সারদাবাবু লম্বোদর কিস্কুর সই করা একটি চিঠির কপি পাঠান। লম্বোদর কিস্কুর চিঠিটি পুরুলিয়া জেলার পুলিশ সুপারিনটেণ্ডেনকে লিখেছেন। এই চিঠির কপি জেলা শাসক, পুরুলিয়াকেও পাঠানো হয়। চিঠিটি নিচে উল্লেখ করা হচ্ছে—

To
The Superintendent of Police
Purulia,
Sir,

পুরুলিয়া জেলা ও মানবাজার থানার অন্তর্গত কেষ্টপুর মৌজার টিপুড়ি গ্রামনিবাসী আমি শ্রীলম্বোধর কিস্কু পিতা ৺রেংটা কিস্কু আমার সবিনয় নিবেদন এই যে, এই এলাকায় অন্যান্য গ্রামের মত আমাদের টিপুড়ি গ্রামেও এবৎসর পানিবসন্ত হইয়াছিল। তাড়াতাড়ি রোগ সারিতেছে না বলিয়া গ্রামবাসীরা পড়শী গ্রামগুলিতে তেল দেয় এবং গত মার্চ মাসে সিংভূম জেলার মেঘাদহ গ্রামে এক সখার কাছে গিয়া আমাকে ডাইনী ধরিয়া আনে। গ্রামে ফিরিয়া আসিয়া গ্রামবাসীরা আমার কাছে ১২৫০ (বারশত পঞ্চাশ টাকা জরিমানা আদায় করে এবং শুদ্ধিকরণে আমার মোট ব্যয় হয় ৮০০.০০ (আটশত) টাকার মত। কিন্তু আশ্চর্যের বিষয়, তথাপি আমাকে ও আমার

পরিবারের লোকজনকে একঘরে করিয়া রাখা হয়। এমতাবস্থাতেই গত ১ জুন তারিখে আমাকে ঘর হইতে টানিয়া বাহির করিয়া গ্রামবাসীরা আমাকে বেদম প্রহার করে। প্রহারের চোটে আমি অচৈতন্য হইয়া পড়ি। আমার আত্মীয় স্বজনেরা লোকের সহিত পরামর্শ করিয়া উক্ত ১১।৩।৮৯ তারিখেই আমাকে জামতোড়িয়া ফাঁড়িতে (আই-সি লইয়া যায়। ততক্ষণে আমি চৈতন্য ফিরিয়া পাইয়াছি। ফাঁড়িতে আমি যথারীতি ডায়েরী করি এবং আমাকে প্রহার করার জন্য আমাদের গ্রামের ১। তুলসী মাণ্ডি, পিতা ৺গহন মাণ্ডি। ২। রামজিৎ মাণ্ডি, পিতা ৺বিষ্টু মাণ্ডি। ৩) বুলা মাণ্ডি পিতা ভিবুটি মাণ্ডি। ৪) শিবলাল কিস্কু পিতা ৺সরকার কিস্কু। ৫). হারাধন মাণ্ডি পিতা ৺সাহেবরাম মাণ্ডি। ৬) ঈশান কিস্কু পিতা ৺জগেশ্বর কিস্কু। ৭) জাগরণ মুর্মু পিতা ৺বাদল মুর্মু। এই সাতজনের বিরুদ্ধে অভিযোগ করি। তৎসঙ্গে দোষীদের শাস্তির দাবী ও আমার নিরাপত্তার দাবীও আমি ফাঁড়িতে করিয়াছি। সেইদিনই আমাকে মানবাজার হাঁসপাতালে ভর্তি করিয়া দেওয়া হয়। হাঁসপাতাল হইতে ১৩ দিন পরে আমি ছুটি পাই। কিন্তু দুঃখের বিষয় পুলিশ আজ পর্যন্ত দোষীদের গ্রেপ্তার করেন নাই। এবং আমরা আজ পর্যন্ত একঘরে অবস্থাতেই সন্ত্রাসের মধ্যেই বহুকষ্টে দিন যাপন করিতেছি।

অতএব মহোদয়ের নিকট বিনীত নিবেদন, দোষীদের শাস্তির দাবী ও আমার ও আমার পরিবারের লোকদের নিরাপত্তার দাবী করিয়া আপনার কৃপাদৃষ্টি আকর্ষণ করিতেছি। নিবেদন ইতি—

তারিখ—১২।৭।৮৯ শ্রীলম্বোধর কিস্কু

[সম্যক অবগতি ও প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য এই আবেদন পত্রের প্রতিলিপি পুরুলিয়া জেলার মাননীয় জেলা শাসক মহোদয় ও সাংবাদিক শ্রীলক্ষ্মীন্দ্রকুমার সরকারের নিকট প্রেরিত হইল।] নিবেদন ইতি—

শ্রীলম্বোধর কিস্কু

চাকিবাইদ গ্রাম

পুরুলিয়া জেলার বলরামপুর থানার তেঁতলো অঞ্চলে গ্রামটির অবস্থান। বলরামপুর থানা থেকে গ্রামটি ৩ কি. মি. দূরে। এটি একটি বর্ধিষ্ণু গ্রাম। লোকসংখ্যা প্রায় ২ হাজার। আদিবাসী সম্প্রদায়ের সংখ্যাই বেশি। ১৯৮৯-র জুলাই মাসে গ্রামের এক প্রতিবেশিনী মুংলি কিস্কু ৮ মাসের গর্ভবতী। হঠাৎ পেটে ব্যথা ওঠায় ওকে নিয়ে পুরুলিয়া হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। কিন্তু সে প্রসব করে মরা শিশু। হাসপাতাল থেকে ছাড়ার পর গ্রামের বাড়িতে মুংলিকে নিয়ে আসা হয়। গ্রামের লোক মুংলির মরা শিশু প্রসব করাকে সাদা চোখে দেখে না। তাদের ধারণা জন্মায় যে, মুংলির বাচ্চাকে ডাইনীতে খেয়েছে। অগত্যা ডাইনী ধরতে হবে। মুংলির স্বামীর সাগর কিস্কুর জামাইদা মাহিন্দী হাঁসদা ১৩/৮ তারিখে নেতৃত্ব দিয়ে গ্রামবাসীদের

জড়ো করেন। ঐ সভায় মাহিন্দী ঘোষণা করে যে নীলমণি কিসকু ডাইনী। সাঁওতাল সমাজে যারা ডাইনী ধরে তারা তিনরকমের। প্রথম ওঝা, এর কাজ গ্রামের মধ্যে থেকে চিকিৎসা করা এবং ডাইনী ধরা। তবে এর ডাইনী ধরার ক্ষমতা সামান্য। দ্বিতীয় সখা। ওঝার ওপরে এর শুধুমাত্র ডাইনী ধরায় পারদর্শী। এ যাকে ডাইনী বলবে সে ডাইনী নির্ঘাত। তৃতীয় জানগুরু। এর ক্ষমতা সবচেয়ে বেশি। ওঝা, সখা, ডাইনী কাউকে সাব্যস্ত করলে ডাইনী যে হবে, সে বা তার পক্ষের লোক জানগুরুর কাছে বিচারের জন্য আবেদন করতে পারে। এর আদেশ উপেক্ষা করার উপায় নেই। প্রয়োজনবোধে সখা যাকে ডাইনী করেছে তাকে ডাইনী অপবাদ থেকে মুক্তি জানগুরু দিতে পারে। আসলে এসব ব্যবস্থাটাই একটা ধান্দাবাজী এবং টাকা রোজগারের পথ ছাড়া কিছুই নয়। (যা আগে বলা হয়েছে)। চাকিবাইদ গ্রামের ঘটনাটাও এইরকম। মাহিন্দী হাঁসদা গ্রামের লোকদের নিয়ে শালপাতায় তেল সিঁদুর মাখিয়ে গুনে বলে ডাইনী গ্রামেরই বিধবা নীলমণি কিসকু। ১৫ তারিখ গ্রামবাসীরা ওঝার কাছে যায়। ওঝা জানায় ডাইনীতে খেয়েছে মুংলির ছেলেকে। গ্রামবাসীরা যেদিন তেল সিঁদুর শালপাতায় মাখে, সেদিন নীলমণিকে ডেকে পাঠানো হয়। গ্রামের মেয়েদেরও সেদিন ডাকা হয়। নীলমণিকে কেউ জানায় না। নীলমণি রোজকার মত মাঠে কাজ করতে গিয়েছিল। ফিরতে দেরি হচ্ছে দেখে সবাই ক্ষেপে ওঠে। মাঠে লোক পাঠিয়ে নীলমণিকে ডেকে আনা হয়। নীলমণি আসার পর রোগী মুংলিকে দেখিয়ে মাহিন্দী হাঁসদা এবং তার দলের লোক গ্রামবাসীদের সামনে নীলমণিকে বলে, 'রোগী মুংলিকে বচাইবে না মরাইবে'। ইহাকে খাবে না বচাবে।' প্রসঙ্গত বলে রাখি মুংলি নীলমণির ভায়াদ অর্থাৎ আত্মীয়া। নীলমণির দেওরের স্ত্রী এই মুংলি। কাজেই নীলমণিকে দেখে মুংলি বলে 'দিদি তুই ডাহিন বটে—গ্রামের লোক বলাইছে।' নীলমণি অবাক হয়ে বলে, 'আমি যদি ডাহিন বটে! তবে তোর কোন দিক খাচ্ছি বলে দে'। মুংলি তখন চুপ। নীলমণি জানায় যে, বাচ্চাটি মারা যাবার পর থেকে মুংলির মাথাটা খারাপ হয়ে যায়। ফলে যাকে তাকে ডাইনী বলে ও। যাইহোক, ১৭ তারিখে গ্রামবাসীরা আবার জড়ো হয়। ১৮ তারিখে বিহারের ধানবাদের এক সখার কাছে যায়। ১৯ তারিখে গ্রামে ফিরে দুপুর বেলায় গ্রামের পাশে ছোট একটা ডুংরীর নিচে কুসুম গাছের তলায় গ্রামবাসীরা জড়ো হয়। সখার বাড়ি থেকে ফিরে ১৯ তারিখে বিধবা নীলমণি কিস্কুকে ডাইনী ঘোষণা করে জড়িমানা দাবি করে। ২৮০ টাকা নগদ চায়। এবং সখা ঘর যাবার জন্য ধুলো ওড়ানীর খরচ বাবদ ৯৬০ টাকা দাবি করে। সঙ্গে সঙ্গে টাকা দিতে হয়। এই টাকা দেবার পরের দিন অর্থাৎ ২০ তারিখে আরও ২০০ টাকা নেওয়া হয় রোগীর শান্তি স্বস্ত্যয়নের জন্য। রোগীর শান্তি স্বস্ত্যয়নের টাকা রোগীর বাড়ি থেকে দেবার কথা কিন্তু সেটা নীলমণির কাছ থেকে জোর করে আদায় করা হয়। নীলমণির মেজ ছেলে রণজিৎ কিস্কুর কাছ থেকে জোরকরে ২৮০ +৯৬০+২০০=১,৪৪০ টাকা মাহিন্দী হাঁসদার দল আদায় করে এবং বলে ৭ দিনের

মধ্যে গ্রামের লোকদের জড়ো করতে হবে এবং ৩,০০০ টাকা জড়িমানা দিতে হবে। না হলে দেওয়ানী করতে হবে। নীলমণির বড় ছেলে পদক কিস্কু সেই সময় বাড়িতে ছিল না। চাকরির ইন্টারভিউ দিতে খড়্গপুরে গিয়েছিল। নীলমণির তিন ছেলে এক মেয়ে। বড় ছেলে পদক কিস্কু এবছর কলা বিভাগে পুরুলিয়ার জে, কে, কলেজ থেকে স্নাতক হয়েছে। মেজ ছেলে রণজিৎ কিসকু বি-এ পড়ছে। প্রথম বছর চলছে তার। ছোট ছেলে সত্যজিৎ কিস্কু ৭ম শ্রেণীতে পড়ে। আর মেয়ে শান্তি কিস্কুর অক্ষর পরিচয় হয়নি। বাড়ির কাজ, মাঠের কাজ করে। পদক কিস্কু সাহিত্যচর্চা করে। বলরামপুর খেরওয়াল ক্লাবের সেক্রেটারি এবং ত্রৈমাসিক 'রায়বার' পত্রিকার সঙ্গে ঘনিষ্টভাবে যুক্ত। ইতিমধ্যে পদক একজন আদর্শবান ছেলে হিসাবে সুনাম অর্জন করেছে। পদক ডাইনী প্রথার বিরুদ্ধে। গ্রামবাসীদের ঘোষণার বিরুদ্ধে সে রুখে দাঁড়ায়। ২৭ তারিখে পঞ্চায়েত থেকে মিমাংসার জন্য উদ্যম নেওয়া হয়। দুপক্ষের মতামত পঞ্চায়েত শোনে। কিন্তু ফয়সালা কিছু হয় না। আবার একদিন বসা হবে বলে জানান হয়। পদক কিস্কুর মাকে ডাইনী করা হয়েছে। এ সংবাদ জানিয়ে দক্ষিণ পূর্ব রেলওয়ের আদ্রা শাখার একাউন্টস্ বিভাগের কর্মী এবং ডাইনী বিরোধী আন্দোলনের যোদ্ধা কলেন্দ্রমাণ্ডি চিঠি লিখে মহাশ্বেতাদেবী, নিরঞ্জন হালদার এবং আমাকে জানায়। মহাশ্বেতা দেবী চিঠি পাওয়া মাত্র একটি দীর্ঘ চিঠি স্বরাষ্ট্র সচিবকে লেখেন। তিনি তাঁর চিঠিতে দুটি ঘটনার উল্লেখ করেন। এক, মানবাজার ২নং ব্লকের কেষ্টপুর মৌজার জামতোড়িয়া ফাঁড়ির টিপুড়ি গ্রামের লম্বধর কিস্কু এবং বলরামপুরের পদকদের ঘটনা। পুলিশ যাতে দ্রুত ব্যবস্থা নেয় তার জন্য এস, পি পুরুলিয়াকে নির্দেশ দেবার অনুরোধও জানান তিনি। এই কপি তিনি মন্ত্রী বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য, এস-পি-পুরুলিয়া, সারদাপ্রসাদ কিস্কু ও কলেন্দ্রনাথ মাণ্ডির কাছে পাঠায়। মহাশ্বেতা দেবীর চিঠি হল এইরকম—

To

Home Secretary,

N. Krishnamurty,

Dear Krishua murty

The following matter is most urgent. It's life or death. Please ask the S. P. Purulia to take immediate action and direct O-C Balarampur and Manbazar P. S. to give immediate shelter to the persecuted ones, and, punish the guilty.

In this context, I'd beg to bring to your notice that the Police of Purulia always prosecute the tribals who fight against witch-practice and give support to the killers. Else, how come that Manbazar P. S. had framed two such conscientions tribals-Sudhir Tudu and

Milan Tudu in a false murder case ? How come that the govt lawyer of Purulia fortnight creation of Public opinion, raising fund, running to Purulia. The State Government lost the care and the boys were acquintled on 14.6.89. Has it helped the fruit-up at image of the state lawyers. Instead of helping the courageous tribals who fight against witch-belief are out to hang them.

I state the 2 cases.

Case No. 1 :

MANBAZAR P. S. / MOUJA-KISHTOPUR / VILLAGE TIPUDI Person branded as witch a Santhal male Lambodar Kisku. In March & April there was an out break of Chicken Pox in Tipudi 4 adjacent villages. The villagers wanted Lambodar to be branded as a witch, a L is better placed in life. Note the fact that these days tribals will brand a percon as witch, with the help at the witch doctor / Jaan / Sokha, which Person has some money cattle, land. The Tipudi tribals began the usual rites. (i) They sent oil-smeared —tree leaf to villages. (2) Went to nearly MEGHADAHA village at Singbhum to the 'Jaan'. The Jaan' took about a thousand. and obayed the village decision. Lambodar Kisku, the witch was responsible for chicken pox out break. (3) The villagers made kisku pay a fine of 1250 Rs. (4) Kisku had to undergo a purifying ceremony spending 800 Rs. (5) Kisku and his Family was severely beates up and was taken to Manbazar hospital. (7) V.I. MP : From the very beginning Lambodar Kisku sent appeals to (a) **O. C. Manbazar** (b) **S. P.—Purulia** ; (c) **DT. T. W. officer** ; (d) **Gilla Parishad** (8) On 24-6-89. Kisku returned home. No response from P.S. or S.P. He is still ostracised.

My sermise : Lambodar Kisku will be killed on ericted the day he cannot pay more.

Please take immediate action. Purulia S. P. and the O. C. S. will have to treat **applications from tribals with respect.** Do they think that the life of a Lambodar Kisku is worse than dirt on their Shoes ? And, Krishnamurti at the age of 64 (on 14-1-90 I will be 65) do I have to speak for them ? Why should not your Police

admn. DT. do the right thing towards the tribals ? The situation is truly desperate. Action is urgent. MANBAZAR P.S. has the worge record of tribal torture, arrest and exploitation. This P. S. is out to crush the 6 kheries as I wrote to your in June and you took neither notice nor action why ? Where are the tribals to go ?

CASE NO. 2 :

BALARAMPUR P.S. / VILLAGE-DHAKIBAID.

Sagar Kisku's Wife Mangali Kisku had a misscarriage when eight month's pregnant in Jully 89. She was iil. MAHINDI HANSDA Sagars relative collected villagers, decided it is doings of a witch and decided upon NILMONI KISKU, a widow. NILMANI was threatened by the villagers "cure her, or kill her." (1) In this case the villagers branded Nilmani as a witch without first going to a JAAN / SOKHA (2) On 18/8/89 they went to a Sokha who agreed with the villagers. (3) The reason behind branding Nilmoni as a witch :–(a) Her husband Jugal died in March '89 widows are usually best faits. (b) Nilmani has some cultivable land. (c) She has 3 sons. The eldest Padak Kisku is an unemployed graduate+secretary of Balarampur kherwal club+closely connected with a Journal 'RAIBAR'.

(d) The second son studies at XI class, and the third one at class VII.

(e) facts related froms'.

(f) Some wity ones are outo to crush the family.

(4) Padak has informed the Panchayet.

(5) The Panchayet has a helpful attitude.

(6) Then a sabha was held in DHAKIBAID. Nilmani was declared a witch. Dhiren Murmu and Mrityunjoy Soren spoke against witch belief. They were severely beaten up. Padak has been fined 3000 Rs. 1370 Rs. have he exterted. If Padak fails to to pay the remaining 1630 Rs. by 27. 8. 89, the family will be tortured and evicted.

(7) Padak has filed a diary with Balarampur P.S. on 21-8-89, clearly the Panchayet could not help.

My sermise : (a) Balarampur P. S. area has a history at about

a hundred witch killing and witch family eviction. (b) There has never been an anti witch-belief movement as under Manbazar P. S. led by the courageous poet Sarada Prasad Kisku. (c) Since the witch-hunters have always gone scot-free, this case will bad to ugly, brutal outcomes. So, **please take steps so that O. C. Balarampur P. S. and S. P. Purulia take every** step **to bring the culprits to notice**.

Culture Information ministry took a kindable step when an anti-witch seminar was held in Bolpur P. S. area.

In Purulia, strong administrative and Police measures with give results. The case of Sudhir Tudu & Milan Tudu has created a precedence.

Awaiting action
with regards

Mahasweta Debi

With copies to :

(1) Hon'ble Buddhadev Bhattacharya.

(2) S. P. Purulia.

(3) Sarada Prasad Kisku.

(4) Kalendra Mandi.

What it Nilmoni or Lambodar or Padak is killed ? family eriected ?

Money + land is the motivating force.

BAN THE JAAN / SOKHA.

কলেন্দ্রমাণ্ডির চিঠি পাওয়ার পর ঘটনার সরেজমিন তদন্তের জন্য চাকিবাইদ গ্রামে যাই। বলরামপুর চিনি, কিন্তু চাকিবাইদ গ্রাম কতদূর ? তা জানা নেই। অগত্যা কলেন্দ্রর কাছে যাওয়া ছাড়া উপায় নেই। ফটোগ্রাফার গৌতম দাসকে নিয়ে প্রথমে আদ্রা, সেখান থেকে গ্রামে যাই। এবং পদকের বাড়িতে বসে ঘটনাগুলো শুনি পদকদের ওপর মাহিন্দী হাঁসদার দলের আক্রোশ কেন ? খোঁজ করতে গিয়ে জানা গেল, পদকদের আর্থিক অবস্থা ভাল। জমি জায়গা যা আছে তাতে বছরে ১০০ মন ধান হয়। অথচ পদকরা বেকার। বেকারদের কি করে অবস্থা ভাল হয় ? সুতরাং একটা কিছু ত করতে হবে ? পদকের মাকে ডাইনী কর। পদকের মা বিধবা। ১৯৮৯ মার্চ মাসে ওঁর স্বামী মারা যান। সংসারে পদকরা তিনভাই, মা, আর বোন ছাড়া কেউ নেই। কাজেই এদের যদি কোনরকমে বেকায়দায় ফেলা যায় তাহলে গোটা সম্পত্তি পাওয়া যাবে। পদক কিন্তু গ্রামবাসীদের এই মায়ের বিরুদ্ধে জেহাদ ঘোষণা করে। পদকের এই বিরুদ্ধ মনোভাবকে গ্রামবাসীরা ভাল চোখে দেখেনা।

তারা গোটা পরিবারটাকে একঘরে করে রাখে এবং হুমকি দেয়। পদক যদি বাইরে থেকে লোক আনে তাহলে মারদাঙ্গা হবে। ১ সেপ্টেম্বর যখন আমরা ঘটনার খোঁজ খবর নিতে যাই তখন পদক ভীষণ ভীত হয়ে পড়ে পার্টির অনুমতি ছাড়া আমাদের নিয়ে যেতে সে ভয় পায়। যদি কোন অঘটন ঘটে এই ভয়ে সে প্রথমে দোনামনা করে। কিন্তু তাকে সাহস দিয়ে যখন বলি চল আমাদের নিয়ে, কোন ভয় নেই। আমরা কাগজের লোক, ওরা যদি টের পায় তাহলে আর এগোবে না। পদক ভয়ে ভয়ে আমাদের পথ দেখিয়ে নিয়ে যায়। পদক আমাদের থেকে অনেক দূরে দূরে এগিয়ে যায় সাইকেল চালিয়ে। আমরা পদকের পরিচিত একটা রিক্সায় উঠি। পদকের বাড়িতে বসে যখন ঘটনার বিবরণ শুনছি, ফটোগ্রাফার গৌতম সেই ফাঁকে গ্রামের ছবি তুলতে বেরিয়েছিল। এক সময় সে ছুটে এসে জানায় যে আমার সঙ্গে গ্রামেরই একটি ছেলে দেখা করতে চায়। পদকদের ব্যাপারে তার অনেক কিছু বলার আছে। গৌতমকে বললাম ডেকে আনতে। গৌতম জানাল যে ছেলেটি এখানে আসবে না। কারণ সে পদকের বন্ধু। পদকের মাকে ডাইনী করা তো হয়েছেই উপরন্তু জড়িমানার টাকা পুরো না দেওয়াতে একঘরে করে রাখা হয়েছে। এই সময় যদি সে আসে তাহলে তার বিপদ আছে। বাঁধের কাছে সে দাঁড়াচ্ছে আমি যেন সেখানে যাই। গৌতমের মাধ্যমে খবর পাঠালাম এখানকার কাজ সেরে যাচ্ছি। ও যেন অপেক্ষা করে। পদক জানায় ২২ তারিখে তার কয়েকজন বন্ধু এসেছিল। সে তাদের নিয়ে বলরামপুর থানায় যায়। এবং একটা দরখাস্ত দেয়। তাতে সে অভিযুক্ত করে—বরাবাজার থানা তুমড়াশোল গ্রাম পঞ্চায়েতের তুইমা (বাডাম্ভি) গ্রাম নিবাসী মাহিন্দী হাঁসদার নেতৃত্বে সাগর মাঝি, সরাবল মাঝি, জাগর মাঝি, লাগর মাঝি, হপন মাঝি, মণ্ডল মাঝি ও কালিপদ মাঝি প্রভৃতিকে। পদকের এই অভিযোগের দরখাস্ত থানা কিন্তু নেয়না। দরখাস্তর ওপর কোন সীল এবং ডায়েরী নম্বরও তারা দেয় না। ডায়েরী নম্বর পদক পুলিশের কাছে চেয়েছিল। কিন্তু পুলিশ ও লাগবে না বলে বুঝিয়ে দিয়েছে।' পদকের বাড়িতে বসে সব খবরা খবর নিয়ে যখন আমরা ফিরছি, গ্রাম ছেড়ে অনেক দূরে চলে এসেছি।' এমন সময় জোরে সাইকেল চালিয়ে একটি ছেলে আমাদের পাশে এসে থামল। চলতে চলতে সে জানাল তার নাম ধীরেন্দ্রনাথ মুর্মু। এ বছর উচ্চ মাধ্যমিকে কেমিস্ট্রিতে কম্পার্টমেন্টাল পেয়েছে। পদকদের ব্যাপারে সে এর বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করতে গিয়ে মার খায়। হপন মাঝি তাকে মারে। লাথালাথি করে বসিয়ে রাখে। বলে 'পালাবি কোথায়। পালালে মেরে ফেলব। তুই বিজ্ঞান পড়ছিস্, বল ডাইনী আছে কিনা? ধীরেনকে প্রশ্ন করি ওর বাবা মা কি বলেন? তারা কি ডাইনী আছে বলে বিশ্বাস করেন? ধীরেন জানায় যে তার বাবা-মাও বিশ্বাস করেন না কিন্তু ভয়ে মুখ খুলতেও চাইছেন না। কারণ সথার দল ঘোষণা করেছে যারা প্রতিবাদ করবে তাদেরকেও ৩০০০ টাকা দিতে হবে। ধীরেনদের অর্থ নৈতিক অবস্থা খুবই খারাপ। কোন জমি জায়গা নেই। দাদা খগেন্দ্র নাথ

মুর্ জন মজুরের কাজ করে। তাতেই চলে। রাস্তায় দাঁড়িয়েই ধীরেন ঘটনার বর্ণনা দিচ্ছিল। কিন্তু তার চোখে মুখে সব সময়ই আতঙ্কের চিহ্ন ফুটে উঠছিল। বার বার ঘাড় ঘুরিয়ে এদিক ওদিক দেখছিল, কেউ তাকে দেখে ফেলল কিনা! ধীরেনের আতঙ্কের কারণ যদি গ্রামের কেউ তাকে দেখে যে, সে পদকের সঙ্গে কথা বলছে তাহলেও ওদেরকেও ৩০০০ টাকা জরিমানা দিতে হবে।

পদকদের ব্যাপারে বলরামপুর থানায় খোঁজ নিতে যাই। ভারপ্রাপ্ত ইনচার্জ ছিলেন না। ছিলেন সেকেণ্ড অফিসার অনাদি নাথ পাণ্ডে। শ্রীপাণ্ডে এমনভাব দেখালেন যেন ডাইনী ঘটনাটা কোন ঘটনাই নয়। অবজ্ঞা ভরে উড়িয়ে দিয়ে বললেন 'ওগুলো মাঝি মেঝেনদের ব্যাপার। ওনিয়ে মাথা ব্যথার সময় নেই।' দেখুন একজন পুলিশ অফিসারের কর্তব্য! স্থানীয় সি-পি-এম পার্টি অফিসে যোগাযোগ করি এবং ঘটনার ব্যাপারে তাদের ভূমিকা কি সে সম্পর্কে খোঁজ নিতে যাই। ঐদিন নেতৃবৃন্দ খুবই ব্যস্ত ছিলেন। ৩০ আগস্ট ভারত বন্ধের দিন বিহারের পুলিশের গুলিতে সি-পি-এমের ৪ জন কর্মী নিহত হওয়ার প্রতিবাদে মিছিল, পথ সভা চলছিল। ফলে পার্টি অফিসে অপেক্ষা করতে হচ্ছিল। নেতাদের ফিরতে দেরি হচ্ছে দেখে পার্টির পক্ষে কৃষ্ণকিশোর মহান্তী আমাদের সঙ্গে কথা বললেন। তিনি জানালেন তারা খুবই উদ্বিগ্ন, চিন্তিত। ইতিমধ্যে মিমাংসার চেষ্টাও করেছেন। তিনি খোলাখুলি বললেন—চাকিবাইদ গ্রামটায় সি-পি-এমের কোন আধিপত্য নেই। ওখানে সবাই ঝাড়খণ্ডের লোক। তবু তারা চেষ্টা করেছে মিমাংসার। কৃষ্ণবাবুকে প্রশ্ন করেছিলাম পদক মোট ১,৪৪০ টাকা দিয়েছে। আরও ৩,০০০ টাকা তাকে দেবার জন্য ৭ দিন সময় দেওয়া হয়েছে। ঐ টাকাটা কি তাকে দিতে হবে? কৃষ্ণবাবু জানিয়েছিলেন তার দল কোনমতেই টাকা দিয়ে মিমাংসায় বিশ্বাসী নয়। তার দল এজন্য সবসময় সজাগ থাকে। পদককে যাতে ৩,০০০ টাকা দিতে না হয় তার চেষ্টা করবেন। কিন্তু শেষ পর্যন্ত পার্টি কথা রাখেনি। ক্রমাগত প্রাণনাশের হুমকির ভয়ে পদক ৩,০০০ টাকা দিতে বাধ্য হয়। ৩০।৯।৮৯ তারিখে পদক চিঠি লিখে আমাকে সে কথা জানায়। তাহলে পাঠক দেখলেন ব্যাপারটা, পার্টিও জীইয়ে রাখল গোটা ব্যাপারটা।

গ্রামে আরও অনেক লোক থাকা সত্বেও পদকদের কেন এভাবে আক্রমণ করা হল? সে কারণগুলো খুঁজতে গিয়ে পেলাম অভিযুক্ত মাহিন্দী হাঁসদার তিনটে বউ। চাকিবাইদ গ্রামে তার দুটো শ্বশুর বাড়ি। ৪।৫ বছর আগে এই গ্রামেরই বাসিন্দা রমণ কিসকু (২০) নামে একটি মেয়ের শ্লীলতাহানির চেষ্টা করে সে। গ্রামের লোক হাতে নাতে ধরে ফেলে। অপমান করে। পদকের বাবা যুগল কিসকু তখন জীবিত। উনি 'লায়া' অর্থাৎ পুরোহিত ছিলেন। মান্যগণ্য ব্যক্তি। মাহিন্দীর বিচার সভায় তিনি বিচারক ছিলেন। মাহিন্দীর নিজের গ্রাম এবং শ্বশুরবাড়ির এই গ্রামের বাসিন্দাদের মধ্যস্থতায় ওকে যুগল কিসকু ছেড়ে দেয়। কিন্তু মাহিন্দীর আক্রোশ যুগল কিস্কুর ওপর পড়ে। সুযোগ খোঁজে। এসেও যায়। যুগল কিস্কু মারা যাওয়ায় তার বিধবা স্ত্রী নীলমণিকে সে ডাইনী বানায়। মাহিন্দী নিজে একজন জোতদার।

বন্দুক আছে, তার উপর ওঝা গিরিও করে। কাজেই আক্রোশবর্শত মাহিন্দী পদকের হেনস্তা করে চলেছে। জরিমানা বাবদ ৪,৪৪০ টাকা দেওয়া সত্ত্বেও পদকদের ভয় কাটেনি। একঘরে তো রয়েছেই, প্রাণনাশের হুমকিও চলছে। এলাকার পরিস্থিতি ক্রমশ জটিল হয়ে উঠছে। প্রশাসন সম্পূর্ণ নীরব থাকছে।

অযোধ্যা পাহাড়

অসংখ্য পায়ে-চলা পথ চলে গেছে অযোধ্যা পাহাড়ের জঙ্গলের ভিতরে। এই সমস্ত পথেরই শেষে পাওয়া যাবে একটি করে সাঁওতাল গ্রাম। অযোধ্যা পাহাড়ের শহরে বসতি অঞ্চল থেকে তার দূরত্ব দু'কিলোমিটার থেকে বারো কিলোমিটার। ৮০ খানা গ্রামের ৮০০০ সাঁওতালের পাহাড় অযোধ্যা। এইসব অরণ্য-নির্ভর মানুষের গ্রামগুলোতে আজও রাজত্ব চলছে নানান জানা-অজানা দেব-দেবী ভূত আর ডাইনীর। এছাড়া গত বিধানসভা নির্বাচনের সময় থেকে মাঝে মাঝে কলকাতার খবরের কাগজে পুরুলিয়া জেলার আদিবাসী গ্রামগুলোতে 'ডাইনী সন্দেহে হত্যা এবং এর পেছনে রাজনৈতিক উদ্দেশ্য কাজ করছে—এমন উত্তেজক খবর প্রকাশিত হচ্ছিল। এই খবরগুলোর মূল বক্তব্য ছিল বামপন্থী রাজনৈতিক দলগুলো মানুষের কুসংস্কারকে রাজনৈতিক উদ্দেশ্যে ব্যবহার করছে। প্রধানত ডাইনী-ওঝার অলৌকিকতা ও কুসংস্কারের বিষয়ে তথ্য সংগ্রহের জন্য এবং একই সঙ্গে রাজনৈতিক ডাইনীর অস্তিত্ব খোঁজা, এ দুটো কারণেই এই অনুসন্ধানটি চালানো হয়। শহর থেকে বিচ্ছিন্ন এলাকা, এবং শুধুই অরণ্য-নির্ভর সাঁওতালদের বসতি বলেই পুরুলিয়া জেলার মানচিত্র খুলে অযোধ্যা পাহাড়কে আমরা বেছে নিলাম তদন্তের জন্য।

অযোধ্যা পাহাড়ে ঝর্ণার জল ঢাল বেয়ে নানাদিকে বয়ে গেছে। পাহাড়ের মাঝে মাঝে উপত্যকা অঞ্চলে এই স্রোতকে বহাল নামে ডাকা হয়। সন্ধ্যার অন্ধকারে টর্চের আলো ফেলে চলতে চলতে হঠাৎ এক ছোট উপত্যকা আর খোলা আকাশের নিচে এসে পড়েছি। এইখানে অরণ্য শেষ হয়ে বেশ কিছু দূর থেকে আবার তার শুরু। সামনে ঝর্ণা স্রোতের বহাল। তার ওপারে ছোট গ্রাম, পুনিয়াশাসন। এতক্ষণ বিলাপের সুরে যে গান ভেসে আসছিল হাওয়ায়, মনে হচ্ছিল তার উৎস দূরের কোন গ্রাম। ভুল ভাঙল। চাঁদের আলোয় দূরে ছায়া ছায়া, চলমান কিছু মানুষ গান গেয়ে ঝর্ণা পেরোচ্ছে। গ্রামে পৌঁছে ডাইনী বিষয়ে প্রশ্ন করতে প্রথমেই ধাক্কা খেলাম। দুর্বোধ্য ভাষায় এক সাঁওতাল তরুণ যা বলল, তা শুনতে অনেকটা এরকম—'আমদো দিকু ইন্দো বাং বড়ায়া।' আমার মুখের ভাবে সম্ভবত না বোঝার ছাপ পড়েছিল, ফলে সে আবার স্থানীয় চলতি বাংলায় বলল, 'তুরা দিকু আছিস, তুদের নাহি বুলব।' তবে এ বাধা কাটাতে তেমন সময় লাগেনি। যদিও সে রাতে গ্রামের জাহু মুর্মুর বিয়েতে শালপাতায় হাড়িয়া চুমুক দিতে এতই ব্যস্ত তিন-চার বছরের শিশু থেকে বৃদ্ধ বৃদ্ধারা পর্যন্ত, যে-কেউই আর বেশিক্ষণ কথাই বলতে চায় না। ফলে, পরদিন সকালে আসব, এই ঠিক করে আমাদের ফেরার পথ ধরতে হল।

সাঁওতাল গ্রাম বুঝতে, জানা প্রয়োজন সাঁওতাল গ্রামের গঠন। প্রাথমিকভাবে আমাদের হাতে দুটো খবর ছিল। প্রথম, গ্রাম পঞ্চায়েতের সদস্য কানাই মাণ্ডির স্ত্রীকে ডাইনী অভিযুক্ত করার। সে যে তার চার বছরের শিশুটির অলৌকিক মৃত্যুর কারণ, এটা গ্রামের মানুষের বিশ্বাস। কানাই মাণ্ডির বৃদ্ধা মাকে পাওয়া গেল ঘরের পাশের গাছতলায় হাতে তৈরি খাটিয়ায় শুয়ে। ভয়ঙ্কর রকম রিকেট-আক্রান্ত একটি মাস চারেকের শিশুকে ফিডিং বোতলে দুধ খাওয়াতে ব্যস্ত। আমাদের দেখে সেই বৃদ্ধ কাতরভাবে ওষুধ চাইল। গায়ে হাত দিয়ে দেখি জ্বরের তাপে গা পুড়ে যাচ্ছে শিশুটির। কথায় কথায় জানা গেল কানাই মাণ্ডির স্ত্রীর দ্বিতীয় সন্তান এটি। বৃদ্ধাকে কিছুতেই বোঝানো গেল না দু'মাস বয়সে মা-ছাড়া হওয়ায় শিশুটির অসুস্থতার কারণ। যদিও সাধারণ অভিজ্ঞতা থেকেই বৃদ্ধা এটা বুঝতে পেরেছে যে শিশুটির মৃত্যু আসন্ন। তার কারণ হিসেবে সে বলল কানাই-এর স্ত্রী, গ্রামের মানুষ যাকে ডাইনী বলে গ্রাম-ছাড়া করেছে, সেই ডাইনীই রক্ত শুষে নিচ্ছে এ শিশুটির শরীর থেকে প্রতিদিন। প্রথম সন্তানটি কিভাবে মারা গেল এ প্রশ্ন করতে উত্তেজিত জবাব এল, 'ও হি খাইল, টাটকাভাই মরি গেল, তু হি বল কেটা খাইল…?' বৃদ্ধার মুখ থেকে আরও জানা গেল, শিশুটিকে শেষ মুহূর্তে স্থানীয় লুথেরান ওয়ার্লড সার্ভিস-এর হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল। কিন্তু ডাক্তাররা তার রোগ নির্ণয়ে ব্যর্থ হয়। যদিও আমরা পরে খবর নিয়ে জেনেছি, শিশুটির মৃত্যুর কারণ এক বিশেষ ধরনের ম্যালেরিয়া।

কানাই-এর স্ত্রী যেহেতু ডাইনী হয়েছে, ফলে গ্রামের ষোলআনা প্রচলিত নিয়ম অনুসারে কানাইকে বার কুড়ি টাকা জরিমানা করেছিল। সব সময়ই জরিমানার টাকায় ষোলআনার সদস্যরা রাত দিন হাড়িয়া আর মহুয়া খেয়ে চব্বিশ ঘণ্টা ঝিম মেরে পড়ে থাকে। এমনকি কানাইও বাদ দেবে না নিজেকে এমন ফূর্তি থেকে। এর পরের ঘটনা কানাই তার স্ত্রীকে প্রচণ্ড মারধর করে বাড়ি থেকে তাড়িয়ে দিয়ে মহা ধুমধামে নতুন বিয়ে করল। দ্বিতীয়বার বিয়ে করার দোষে আবার বসল ষোল-আনার সভা। জরিমানা ধার্য হল এগার শ টাকা। এর এক সামান্য অংশ পেল প্রথম স্ত্রী মুরগী আর ছাগল কেনার দাম বাবদ। বাকিটা দিয়ে চলল তিন দিন টানা হাড়িয়া উৎসব। সাধারণত এত বেশি টাকা জরিমানা করার রেওয়াজ সাঁওতালদের দরিদ্র গ্রামগুলোতে নেই। এক্ষেত্রে পঞ্চায়েত সদস্য কানাই মাণ্ডি এই অস্বাভাবিক পরিমাণ টাকা কোথা থেকে সংগ্রহ করেছিল তার উত্তর পাওয়া যায়নি। তবে এমন ইঙ্গিত মিলেছে যে ষোলআনা জানতে পেরেছিল কানাই মাণ্ডি ও সরকারি তহবিলের কোনো গোপন সম্পর্কের সূত্রে। তবে একটি বিষয়ে পরিষ্কার জানা গেল কানাই মাণ্ডির স্ত্রীকে ডাইনী ঘোষণার পেছনে কোনোই রাজনীতি কাজ করেনি। গ্রামে কানাই মাণ্ডি ছাড়া আর কারও বামপন্থীর সমর্থক বলে পরিচিতি নেই। অর্থাৎ বামপন্থীদের চক্রান্ত নয়, এক্ষেত্রে একজন বামপন্থী সমর্থকই আক্রান্ত। ষোলআনার বেশ কিছু সদস্যের সঙ্গে কথা বলে তাদের কোনো নির্দিষ্ট রাজনৈতিক ভাবনার সামান্য আভাসও পাওয়া যায়নি।

অনেক চেষ্টা করেও যোগাযোগ সম্ভব হল না কানাই মাণ্ডির প্রথম স্ত্রীর সঙ্গে। সে গেছে দূরের জঙ্গলে ঠিকাদারের কাঠ কাটতে। তার বৃদ্ধা মা'র সঙ্গে কথা হল আমাদের।

— তোমরা ষোলআনাকে বলনি তোমার মেয়ের কোনো দোষ নেই?

·· হামরা গরিব আছি বটে·· উহি সব বলল, উহি করল···

— তোমার কি মনে হয় এটা ঠিক কাজ হয়েছে?

তুহি বুঝনা, এমোন, একটা ঘর সুধানা যিথানে ছা নাই মইরচে·

— তুমি কি মেয়ের আবার বিয়ে দেবে?

— দিব নাই কেনে কুটুম লাইগল্যেই দিব।

— ওরতো ডাইনী নাম হয়েছে, অন্য কেউ ওকে বিয়ে করবে?

বৃদ্ধা হাতের পাতার উল্টো পিঠ দিয়ে চোখের জল মুছে নিল, উত্তর দিল না।

অন্য ঘটনাটি সাম্প্রতিককালের। গ্রামের দু'তিনটে গরু-মোষ হঠাৎ মরে যাবার পর, কালোমণির বৃদ্ধা মাকে ডাইনী অভিযুক্ত করা হল। তার উপর চালানো হল অত্যাচার। জরিমানা হল একশ টাকা। ওঝা, মন্ত্র-তন্ত্র, মুরগী, হাড়িয়া সহযোগে চলল পূজা এবং উৎসব। রোগমুক্ত হল গ্রাম। আমাদের প্রথমেই ধারণা হয়েছিল নিশ্চয়ই কোনো বিশেষ ধরনের মড়কই গরু মোষের মৃত্যুর কারণ। প্রশ্ন করতে করতে জানা গেল, কয়েকটি গরু মোষ মরার পরই শহরের ডাক্তার এসে গরু-মোষকে ইঞ্জেকশন দিয়েছিলেন। গ্রাম থেকে প্রায় বারো কিলোমিটার দূরে বাগমুণ্ডি থানার বি-ডি-ও'র সঙ্গে যোগাযোগ করতে তিনি আমাদের জানালেন, তাঁর ওখান থেকেই ডাক্তার পাঠানো হয়েছিল গ্রামের সমস্ত গরু-মোষকে এইচ. এস. ভ্যাকসিন ইঞ্জেকশন দেবার জন্য। যার ফলে মড়ক ছড়িয়ে পড়তে পারেনি তীব্রভাবে। কিন্তু গ্রামবাসী বিশ্বাস করে না মড়ক থেকে মুক্তির কারণ ভ্যাকসিন। ওঝার ঝাড়ফুক আর গ্রাম থেকে ডাইনী তাড়িয়েই গরু-মোষগুলোকে তারা বাঁচিয়েছে। এটাই তাদের বিশ্বাস।

সখাদের কাছে মন্ত্র-তন্ত্র অত্যন্ত গোপনীয়তার সঙ্গে রক্ষা করবার বিষয়, কিন্তু জিলিংটার গ্রামের এক ভূমিজ আদিবাসী যে প্রথম জীবনে সখা হবার চেষ্টায় এক প্রতিষ্ঠিত সখার শিষ্যত্ব নিয়েছিল এবং পরবর্তী জীবনে সে একাজ ছেড়ে দেয়, তার থেকে আমরা এই সব মন্ত্র যোগাড় করেছি। যার অলৌকিকতায় আদিবাসী সমাজ বিশ্বাস করলেও, আসলে তা ভাঙাচোরা বাংলায় কিছু সাদামাটা কথামাত্র। নিচের দু'টো এধরণের মন্ত্র থেকে তা বোঝা যাবে।

(ক) আগুই আগুই গুরু যায়
গুরুর চেলা আমি যায়
আমার গাটি লোহার বন্ধা
সব লোককে লাগুক ধান্দা
লাগ লাগ লাগ শিল পাথর জুড়ে লাগ

ডান চালায় যুগিন চালায়
শিক্ষাগুরুর মাথা খায়
আমকার জিউ আমকার জিউ
আমকার ঠিনকে আয়
অন্য জিউ আছিস তো কাটিয়ে
পলাই যা
দোহাই বড় বাবা নীর নর শিং গুরুর
রাজা ভোজের দোহাই ॥
(খ) এতদ চুড়ি বিতব চুড়ি
চামের চুড়ি চাই
আগে আগে বন্ধি তো থাপরে পড়িস
এ বান্ধন লড়ি চড়িস তো মা কালিকে
থাপরে পুরিস ॥

॥ অযোধ্যা পাহাড় ও সন্নিহিত অঞ্চলের কিছু সখা ও ওঝার ঠিকানা ॥

নাম	গ্রাম
গুরুয়া সোরেন	খেরঘু টু
জোলান হেমব্রম	ছাতনি
বাজ্জু মুর্মু	চিরুগোরা
গৌর হাজরা	জামঘুটু
হাগরু টুডু	শুষান
রামনাথ কুমার	বীরগ্রাম
নন্দ মাঝি	বাগমুণ্ডি
বিষ্টুপদ কুমার	বাগমুণ্ডি
নাপভাণী সখাইন	জোড়ডি

(অঞ্চলের সবথেকে নামী সখা) ● **

লক্ষ্মণ টুডু হত্যা মামলার রায়

৬ বছর ধরে ঝুলে থাকা মিথ্যা অভিযোগে আনা একটি খুনের মামলার অবসান হল। বেকসুর খালাস পেল দক্ষিণ পুরুলিয়ার বড়দহি গ্রামের দুই বিবেকবান নিরপরাধ সাঁওতাল যুবক সুধীর ও মিলন টুডু। এদের দুজনের বিরুদ্ধে অভিযোগ ছিল ঐ গ্রামেরই বাসিন্দা লক্ষ্মণ টুডুকে হত্যা করেছে ওরা দুজন। (ঘটনার সূত্রপাত অধ্যায়ে বিস্তারিত আলোচনা করা আছে। তবু এখানে কিছুটা পুনরাবৃত্তি করছি)

** প্রতিক্ষা, ২ আগস্ট ১৯৮৩-তে প্রকাশিত সাংবাদিক শুভাশিস মিত্রর প্রতিবেদন 'অযোধ্যা পাহাড়ে ডাইনী সমস্যা'।

ঘটনাটি ছিল ১৯৮৪ সালের। দক্ষিণ পুরুলিয়ার মানবাজার ২নং ব্লকের অধীনে বড়দহি গ্রামের দুই তরুণ সুধীর টুডু ও তাঁর কাকা ও বন্ধু মিলন টুডু ডাইনির অস্তিত্ব মানে না। ডাইনি ধরার নামে সর্বস্বান্ত করা, হত্যা করা বা জরিমানা বাবদ বহু টাকা আদায় করার বিরুদ্ধে তারা দুজন জেহাদ ঘোষণা করেছিল। তাদের এই জেহাদ সখার দলের মনঃপুত না হওয়ায় গ্রামের মোড়ল বা মাঝিকে দিয়ে একটা সভা ডাকে ওদের দুজনের বিচারের জন্য। সভায় সিদ্ধান্ত নেওয়া হয় সুধীর ও মিলনকে শায়েস্তা করতে হবে। জরিমানা দিতে হবে। সুধীর গাঁয়ের লোকেদের এসব বিচার না মানায় তাকে কেটে ফেলার তোড়জোর চলে। একদিন সুধীরকে কেটে ফেলার জন্য ডাইনির অস্তিত্বে বিশ্বাসী পক্ষের দল ওর বাড়ি আক্রমণ করে। কিন্তু সুধীর বাড়িতে না থাকায় হৈচৈ হট্টগোলের মধ্যে সুধীরের বদলে টাঙ্গি দিয়ে গ্রামের এক নিরীহ মানুষ লক্ষ্মণ টুডুকে কেটে ফেলে। সুধীরের বদলে অন্যকে মেরে ফেলা হয়েছে, তা পরের দিন সকালে জানতে পেরে খুনীর দল কোন উপায় না দেখে রটিয়ে দেয় যে লক্ষ্মণকে সুধীর ও মিলনই খুন করেছে। পুলিস সুধীর ও মিলনকে গ্রেপ্তার করে পুরুলিয়া জেলে চালান করে। দণ্ডবিধির ৩০২ ধারায় ওদের বিরুদ্ধে খুনের অভিযোগ আনা হয়। এরপর কয়েকদিন পুরুলিয়া জেলে রেখে ১৯৮৪ সালের অষ্টমী পুজোর দিন ওদের ছেড়ে দেওয়া হয়। কেসও ধামা চাপা পড়ে। ৬ বছর পরে হঠাৎ আবার কেস মাথাচাড়া দিয়ে ওঠে। ওদের কেস নং ১০২৬। গত কয়েকমাস ধরে ঐ দুর্গম অঞ্চল থেকে ওরা যাতয়াত করত পুরুলিয়া কোর্টে।

সাংবাদিক ব্রিক্রমণ নায়ার, নিরঞ্জন হালদার, মহাশ্বেতা দেবী ও এই প্রতিবেদকের কাছে চিঠি লিখে আবেদন জানায় সাহায্যের। মহাশ্বেতা দেবী আজকালের মাধ্যমে দেশের জনসাধারণের কাছে ওদের দুজনের সাহায্যের জন্য আবেদন করেন। দেশের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে বহু টাকা সাহায্য আসে। বিভিন্ন সময়ে খেপে খেপে ঐ টাকা তাদের হাতে তুলে দেওয়া হয়। উকিল অরূপ ভট্টাচার্য অবশ্য পরে তাঁর ফি নেননি। বিনা ফিতে তিনি এবং জুনিয়র নন্দলাল সিংহানিয়া এই কেসে অভিযুক্তদের পক্ষ সমর্থন করেন। ১৪ জুন ছিল রায় দেবার দিন। ১৩ জুন রাত্রে সুধীর ও মিলন তাদের গ্রাম থেকে পুরুলিয়ায় চলে আসে। ৭ মে মহাশ্বেতা দেবী সারদাবাবুর বাড়ি গিয়েছিলেন সংগৃহীত আরও কিছু টাকা নিয়ে। সেই সময় তিনি ব্যবস্থা করে এসেছিলেন ১৪ জুন সুধীর ও মিলন পুরুলিয়ায় গেলে তাদের প্রাথমিক নিরাপত্তার। স্থানীয় সাংবাদিক প্রশান্ত রক্ষিত দায়িত্ব নিয়েছিলেন ওদের নিরাপত্তার। ১৩ তারিখ পুরুলিয়ায় পৌছান মাত্রই বাস স্ট্যাণ্ড থেকে মুন্সেফ ডাঙায় 'শ্যাম' ধর্মশালায় ওদের এনে রাখা হয়। সুধীর ও মিলনকে গ্রাম থেকে আগলে নিয়ে এসেছে বড়দহি, গোলাপাড়া, বড়গড়িয়ার, বিপিন টুডু, ফকির সরেন, ভুটি মাণ্ডি, মনোহর কিসকু, চিন্তাহরণ মাহাতো, শশধর মাহাতো। যাইহোক, দায়রা বিচারক দীনদয়াল সিনহা আসন গ্রহণ করেই পড়া শুরু করলেন পুরো মামলার নথিপত্র, সাক্ষ্যপ্রমাণ। মাঝে মাঝে 'কোয়ারি' করে ঠিক আছে কিনা জিজ্ঞেস করলেন উকিল অরূপবাবুকে।

তিনি সম্মতি জানালেন। বিচারক রায় পড়ে শেষ কথা বললেন 'খালাস'। আসন ছেড়ে উঠে দাঁড়ালেন এবং চলে গেলেন'। সুধীর মিলন এবং সঙ্গের লোকদের তখন আত্মহারা অবস্থা। সুধীর, মিলনকে নিয়ে অরূপবাবুর ছবি তোলা হল। এই কেসে অরূপবাবু অসামান্য ভূমিকা নিয়েছেন।

পাশাপাশি অন্যান্য উকিলেরা ছিলেন পাবলিক প্রসিকিউটর মনোরঞ্জন রায়, নন্দলাল সিংহানিয়া ও ল'ক্লার্ক তারাপদ মাহাতো। সুধীর, মিলন কেসে জিতেছে ঠিকই কিন্তু ভয় তাদের যায়নি। এই মুহূর্তে তাদের অন্য ভয় আবার নতুনভাবে দেখা দিচ্ছে।

সুধীর ও মিলন টুডুর রায় বের হওয়ার আগে প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে এই দুই যুবকের কেস আদালতে ৬ বছর পরে থাকার পর আদালতে ওঠার সঙ্গে সঙ্গেই ওদের দুজনের প্রাণে মেরে ফেলার চেষ্টা হয়। মধ্যযুগীয় ডাইনী-প্রথা না মানার অপরাধে ঘাতকদের মুখোমুখি হতে হচ্ছে এই দুই যুবককে। ৮ মার্চ ১৯৮৯ আজকালের 'প্রিয় সম্পাদক' কলমে মহাশ্বেতা দেবীর একটি চিঠি ছাপা হয়। (পরিশিষ্টতে তা ছাপা হয়েছে) ঐ চিঠি ছাপার ক'দিন পর ১০ মার্চ রাত্রে আততায়ীদের খপ্পর থেকে কোনমতে পালিয়ে বাঁচেন সুধীর ও মিলন। তাদের খুন করতে সে রাত্রে প্রায় একটা জহ্লাদ বাহিনীই নেমে পড়েছিল। এরপর ২৫ মার্চ দুই সাঁওতালা যুবকের এক আকুল চিঠি এসে পৌছয় আমাদের হাতে। ১৩ তারিখ রাত্তিরে কীভাবে তাদের হত্যা করার চেষ্টা হয়েছিল ঐ চিঠিতে তার সংক্ষিপ্ত বিবরণ ছিল। ঘটনাটা বিশদভাবে জানার জন্য চিঠিটি হাতে নিয়েই রওনা হলাম বরদহির দিকে। দক্ষিণ পুরুলিয়ার দুর্গম প্রত্যন্তের বডদহি, মানবাজার ২ নং ব্লকের ছোট একটি গ্রাম। ২৯ মার্চ ভোর রাতে কলকাতা থেকে রওনা হয়ে পরের দিন রাত সাড়ে ন'টা নাগাদ জঙ্গলের পথ ধরে পৌছলাম সারদাবাবুর বাড়ি। মিলন, সুধীর ওরা দুজন তখন ওখানেই ছিল। ওদের সঙ্গে আমার যোগাযোগ প্রায় ১০ বছর ধরে। রোজ রাতেই ওরা সারদাবাবুর বাড়ি চলে আসে। আতঙ্ক ওদের মনে সব সময়।

কী হয়েছিল সেদিন? ১৩ মার্চ? সুধীর জানাল—'সেদিন আমরা দুজন পুরুলিয়ার বাসে উঠেছিলাম। বড়গোড়িয়ায় বাসটা যখন এসে পৌছল, রাত তখন প্রায় সাড়ে ন'টা। হাঁটা শুরু করলাম। হঠাৎ দেখি পেছনে মোটর-সাইকেলের আলো। চটপট রাস্তার ডানদিকে আলের ধারে চলে গেলাম। একটু পরেই আবার একটা জিপ। অন্ধকারেই বুঝলাম লোকভর্তি। ফের সরে গেলাম আলের দিকে। পাঁচ মিনিটের মধ্যে আবার একটা গাড়ি। সন্দেহ হল নিশ্চয়ই ওরা আমাদের খুঁজে বেড়াচ্ছে। কোনমতে লুকিয়ে সে রাতে বাড়ি চলে আসি। একটুর জন্য প্রাণে বেঁচে গেছি।' সুধীর-মিলনের অপরাধ কী? সাঁওতাল হয়েও ডাইনী প্রথাকে ওরা মানেন না। প্রকাশ্যে প্রতিবাদ করেন। সাঁওতাল সমাজের এক প্রভাবশালী গোষ্ঠীর মতে, ওদের বাঁচারই অধিকার নেই।

নবম পরিচ্ছেদ

ডাইনী বিরোধী আন্দোলনকারীদের সংক্ষিপ্ত পরিচিতি

সারদাপ্রসাদ কিস্কু : ১৯২৯ সালের ২রা ফেব্রুয়ারি জন্ম। সাঁওতাল সমাজের একজন বিশিষ্ট কবি। বয়স এখন ৬০। ১৯৪৩-এ এম ইতে মেরিট স্কলারশিপ পান। বিনা বেতনে হাইস্কুলে পড়ার সুযোগ ঘটে। হাইস্কুলের হোস্টেলেও বিনা খরচায় থাকার ব্যবস্থা হয়। বৃত্তি বাবদ তখন মাসে ৪ টাকা পেতেন। ১৯৪৮-এ ম্যাট্রিক পরীক্ষা দেন। শারীরিক অসুস্থতার জন্য দীর্ঘদিন রোগে ভোগেন। তা সত্ত্বেও প্রথম বিভাগে পাশ করেন। এবং লেটারও পান। বিষ্ণুপুর রামানন্দ কলেজে বিজ্ঞান বিভাগে পড়ার জন্য আই, এস-সি ক্লাসে ভর্তি হন। কিন্তু পড়া তাঁর আর শেষ হয় না। কর্মজীবনে তিনি প্রবেশ করেন। এতদসত্ত্বেও তাকে সাহিত্যচর্চা থেকে দমিয়ে রাখা যায়নি। সমান তালে সঙ্গীত চর্চাও করতেন। ১৯৫০ সালে তিনি শিক্ষকতা শুরু করেন। ১৯৬৪ সাল পর্যন্ত তিনি একই স্কুলে থাকেন। এই বছর তিনি স্কুলের চাকরি ছেড়ে সক্রিয় রাজনীতিতে নেমে পড়েন। ভোটে দাঁড়ান। হেরেও যান। এরপর তিনি অন্য স্কুলে চাকরি নেন। ১৯৫৩ সালে তাঁর প্রথম বই 'ভুরকা ইপিল, (কবিতা), দেওঘর থেকে প্রকাশিত হয়। ১৯৬৬ সালে দ্বিতীয় বই 'কুহুবাও (কবিতা), ১৯৬৭ তে তৃতীয় বই 'গাম গঁদার', ১৯৮৫-তে 'লাহাঃ হররে' (কবিতা) ১৯৮৮তে 'সলমলটম' (গল্পের) ছাপা হয়। এখনও প্রচুর লেখা পড়ে রয়েছে প্রকাশক এবং অর্থাভাবে ছাপা হচ্ছে না।

সামাজিক সমস্যার মোকাবিলা করার জন্য সারদাবাবুর ভূমিকা অসামান্য। কবি এবং লেখদেরও যে সামাজিক দায়িত্বপালনে অধিকার ও কর্তব্য আছে তা তিনি দেখিয়ে দিয়েছেন। পরিশিষ্টতে প্রকাশিত সারদাবাবুর চিঠিগুলো পড়লেই বুঝতে পারা যাবে তিনি কত বড় মাপের মানুষ। সারদাবাবু এখন গুরুতর অসুস্থ। পক্ষাঘাতে আক্রান্ত হয়ে তাঁর শরীরের ডান দিক অকেজ। ১৯৮৬ সালের ১৩ মার্চ তিনি পক্ষাঘাতে আক্রান্ত হন। সারদাবাবু সম্পর্কে আরও বিশদ জানার আগ্রহ থাকলে আমার লেখা- **সাঁওতালী ভাষা, লিপি ও সাহিত্যচর্চার ইতিবৃত্ত** বইটি পড়ে দেখতে পারেন।

মহাদেব হাঁসদা : তরুণ লেখক, সম্পাদক এবং সমাজসেবী। পুরুলিয়ার দক্ষিণে বান্দোয়ান থানার এক প্রত্যন্ত ও দুর্গম অঞ্চলের রাইকা পাহাড়ের নিচে 'কায়রা' নামে এক গ্রামে বাস করেন। মহাদেব একজন শিক্ষকও। ১৯৭১ সালে বি-এ পাশ করেন। ১৯৭৯ সালে, জে, বি, টি (জুনিয়র বেসিক ট্রেনিং নেন)। ১৯৭২ সালে কর্মাটার প্রাথমিক বিদ্যালয়ে শিক্ষকের চাকরি পান। প্রতিদিন ১২-১৪

মাইল উঁচু নিচু পাহাড়ী রাস্তায় সাইকেল চালিয়ে স্কুলে যান। ডাইনী বিরোধী আন্দোলনের একজন বড় সংগঠক। মহাদেব একজন ভাল অভিনেতা ও নাটক পরিচালক। এবং আকাশবাণী কলকাতার সাঁওতালী বিভাগের নিয়মিত সঙ্গীত শিল্পী। অনেক পুরস্কার পেয়েছেন। জীবনে কারুর কাছে হারেন নি। রাজনীতিও করেছেন। বর্তমান যুবক সমাজের কাছে মহাদেব প্রেরণার উৎস। মদ ও হাঁড়িয়া খাওয়ার বিরুদ্ধে মহাদেব লড়াই করে চলেছে। সাঁওতালী সাহিত্য পরিষদ (পুরুলিয়া) এর সম্পাদক। জনপ্রিয় সাহিত্য পত্রিকা 'তেতরে'-র তিনি প্রতিষ্ঠাতা ও সম্পাদক। গোটা সাঁওতাল জাতির মধ্যে মহাদেবের মত ছেলে পাওয়া বিরল।

কমলেন্দ্রনাথ মাণ্ডি: দক্ষিণ পূর্ব রেলওয়ের 'আদ্রা' শাখার একাউন্টস্ বিভাগের করনিক। চাকরির সূত্রে এখন আদ্রায় থাকলেও তার আসল বাড়ি বান্দোয়ান থানার শিরীষ গোড়া গ্রামে। জন্ম সেখানে। এক গরিব কৃষক পরিবারে। ১৯৫৩ সালে জন্ম। উচ্চ মাধ্যমিক পাশ করেন ১৯৭৫ সালে। বি, এস, সি পাশ করেন ১৯৭৮ সালে বিষ্ণুপুর রামানন্দ কলেজ থেকে। স্কুলে পড়বার সময় নিয়মিত 'সুসার ডাহার', 'পছিমবাংলা,' 'হড় সম্বাদ' প্রভৃতি পত্রিকার নিয়মিত পাঠক। লেখা শুরু সেই সময়েই। 'সিলি' নামে একটি পত্রিকা তিনি নিজে বের করেন। ওর সম্পাদক তিনি নিজেই। সাঁওতালী সাহিত্য পরিষদের তিনি সহ-সম্পাদক। ডাইনী বিরোধী আন্দোলন কারীদের মধ্যে তিনিও একজন যোদ্ধা।

রূপচাঁদ হাঁসদা: তরুণ লেখকদের মধ্যে রূপচাঁদ হাঁসদা একটি বিশিষ্ট নাম। মহাদেব হাঁসদার ভাই। বান্দোয়ান ব্লকের মধ্যে এই যুবক একধারে বিতর্কিত কবি, নাট্যকার প্রাবন্ধিক ও অনুবাদক। মাধ্যমিক পর্যন্ত বাড়ি থেকে ৬ কি. মি. হেঁটে চিরুডি বিবেকানন্দ হাইস্কুলে পড়াশুনা করেছেন। ১৯৮২ সালে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বি-এ পাশ করেন। দারিদ্র্যের জন্য পড়াশুনা বেশি করেতে পারেননি। ১৯৮৪ সালে রেলদপ্তরে চাকরি পান। প্রথমে তাঁকে ত্রিরুচিরাপল্লী যেতে হয়। এখন খড়্গপুরে বদলি হয়ে এসেছেন। ছাত্র-জীবনে আবৃত্তি ও বিতর্কে অংশগ্রহণ করে দুইটির প্রত্যেকটি বিষয়ে ২৫-৩০ টা পুরস্কার পেয়েছেন। সাঁওতালী ভাষায় গীতা অনুবাদ করেছেন। বই হয়েও তা বেরিয়েছে। বাংলা থেকে সাঁওতালীতে অনুবাদ করেছেন 'মিৎজড় কলম' (নিরঞ্জন হালদার ও বিক্রমণ নায়ারের ডাইনী সম্পর্কিত এবং এই লেখকের ডাইনী সম্পর্কিত একটি লেখা। দুখণ্ডে প্রকাশ করেছেন প্রাচীন সাঁওতালী কবিতার সংকলন 'মায়ে সহরায় সেরেঞ'। প্রকাশক সাঁওতালী সাহিত্য পরিষদ-পুরুলিয়া শাখা। পশ্চিমবাংলা থেকে ১০-১২টি পত্রিকার তিনি নিয়মিত লেখক। অর্থাভাবে ১০০ টি কবিতা, ২০ টি প্রবন্ধ বই আকারে ছাপা সম্ভব হয়নি। একসময়ে অ্যামনেষ্টি ইণ্টার ন্যাশনাল নামে একটি সংস্থার সক্রিয় কর্মী ছিলেন। ডাইনী বিরোধী আন্দোলনে রূপচাঁদের ভূমিকা অসামান্য।

মহেশ্বর বেশরা: মানবাজার ২নং-এর বুড়িবাঁধ অঞ্চলের ময়না গ্রামের এক তরুণ স্নাতক। বহুদিন ধরে বেকার। চাকরি জুটছে না। 'খেঁরওয়াল গাঁওতা'

নামে একটি সংস্থার সম্পাদক। ডাইনী বিরোধী আন্দোলনের একজন বড় কর্মঠ যোদ্ধা। ডাইনী প্রথার বিরুদ্ধে কথা বলার জন্য বার বার তাকে আক্রমণ করা হচ্ছে। অনেকবার প্রাণনাশের চেষ্টাও হয়েছে।

মনোহর কিস্কু ঃ মানবাজার ২নং-এ বড়গোড়িয়ার ছেলে মনোহর। জীবনে হারতে শেখেননি। চাকরি না পাওয়ার জ্বালা তো আছেই, তা সত্ত্বেও সামাজিক আন্দোলনে এগিয়ে গেছেন, এবং যাচ্ছেনও। বহু বাধা এসেছে সামনে। প্রাণনাশেরও চেষ্টা হয়েছে বহুবার। প্রত্যেকবারই বেঁচে গেছেন। ডাইনী বিরোধী কথার জন্য ডাইনী প্রথার পক্ষের লোকেরা তাকে সব সময় বাঁকা চোখে দেখে। মনোহর খেঁরওয়াল গাঁওতার সভাপতি।

বালেশ্বর সরেন ঃ একজন কবি হিসাবে খ্যাত। 'জিরিহিরি' নামে একটি পত্রিকা বের করত। বালেশ্বর এমন এক যুবক যে তার এক ডাকে ৪০ হাজার লোক জমায়েত হয়ে যায়। একবার এক গণ্ডগোলে বালেশ্বর তা প্রমাণ করে দেখায়। বালেশ্বর গ্রাজুয়েট ছেলে। দীর্ঘদিন চাকরি পাচ্ছিলেন না। এখন সে একটি স্কুলে চাকরি পেয়েছেন। একটি ছেলেও হয়েছে তার। বালেশ্বর ডাইনী প্রথার বিরোধী। আন্দোলনের একজন সক্রিয় কর্মী।

(এছাড়া আরও অনেক যুবক আছেন যাঁদের পুরো পরিচয় না পাওয়ায় উল্লেখ করা গেল না—এজন্য ক্ষমাপ্রার্থী)।

পরিশিষ্ট—১

সারদাপ্রসাদ কিসকুর পত্রাবলী

To

The Special Officer,
Tribal welfare
PURULIA

Sir,

সবিনয় নিবেদন এই যে, 'আজকাল', 'আনন্দবাজার পত্রিকা', পশ্চিমবঙ্গ সংবাদ' ইত্যাদি বহুল প্রচারিত দৈনিক পত্রিকাগুলিতে প্রতিবেদন প্রকাশিত হওয়ার পরেও সম্ভবতঃ আপনার মনোযোগ আকৃষ্ট হয়নি। যে, গত মার্চ ১৯৮৪ থেকে মানবাজার থানার অন্তর্গত বড়দহি গ্রামে ডাইনীর ব্যাপারকে কেন্দ্র করে একটা ঘটনা প্রবাহ চলেছে এবং পরিস্থিতি ক্রমশঃ জটিল থেকে জটিলতর হচ্ছে। এই ব্যাপারে উল্লেখযোগ্য ঘটনাগুলি হচ্ছে :—

১। ১৬ মার্চ তারিখে বড়দহি গ্রামে ডাইনীর বিচার সভায় উক্ত গ্রামবাসী চক্রধর টুডু ও প্রাক্তন এম. এল এ. শীতল হেমব্রমকে প্রচণ্ড প্রহার এবং বড়দহি গ্রামে সুধীর টুডুর বাড়ীতে আমার উপর লাঞ্ছনা।

২। ঐ তারিখেই বড়দহি-গ্রামের মোড়ল লড়িরাম টুডুর ও ডাইনী ধরার জান-সখা রয়না গ্রাম নিবাসী সূর্য্য বেশরার পুলিসের হাতে গ্রেপ্তার।

৩। ১৭ মার্চ তারিখে ডাইনী প্রথার সমর্থক সাঁওতালগণ কর্তৃক জামতোড়িয়া পুলিশ ফাঁড়ি ঘেরাও।

৪। (ক) ২২ মার্চ তারিখে বড়দহি গ্রামনিবাসী ঠাকুরদাস বেশরার আহ্বানে (মহলগিরা) বড়দহি গ্রামে সাঁওতালদের সমাবেস এবং বড়দহি গ্রামের সুধীর টুডু ও চক্রধর টুডু এবং দাড়িকাডোবা গ্রামে আমার বাড়ী লুঠ করার অপচেষ্টা। অতঃপর জামতোড়িয়া পুলিশ ফাঁড়ি ঘেরাও।

(খ) ২৩ মার্চ তারিখে কালাপতি গ্রামে শীতল হেমব্রমের বাড়ী লুঠ করার অপচেষ্টা।

৫। ২৫ এপ্রিল তারিখে আমাকে খুন করার জন্য গোলাপাড়া থেকে আমার ফিরবার রাস্তায় আততায়ীদের অপচেষ্টা।

৬। ২০ মে তারিখে পাঁড়রা গ্রামে প্রকাশ্য দিবালোকে জাগরণ সরেনের হত্যা। হত্যার কারণ হিসাবে ডাইনী প্রথাকে দায়ী করে প্রচার করায় সি. পি. এম. দের ব্যর্থ চেষ্টা।

৭। ৩০ মে তারিখে জামতোড়িয়া খেরওয়াল গাঁওতার সেক্রেটারি মহেশ্বর বেশরাকে ছুরিকা দ্বারা হত্যার চেষ্টা। অপরাধীদ্বয় ঘটনাস্থলে ধৃত এবং তারা উভয়েই সি. পি. এম পার্টির কর্মী।

৮। ২৩ জুন বড়দহি গ্রামের লক্ষণ টুডুর অস্ত্রাঘাতে মৃত্যু। মৃত্যুর পরে সি. পি. এম পার্টিতে তাঁর স্থানলাভ এবং বরণীয় নেতার মর্যাদা প্রাপ্তি।

৯। ২৮ জুন তারিখে জামতোড়িয়া থেকে (আমার) ফিরবার রাস্তায় আমাকে হত্যা করার অপচেষ্টা।

১০। ১০ জুলাই তারিখে লক্ষ্মণ টুডুর হত্যার প্রতিবাদে সি পি. এম. কর্তৃক আহুত জনসভা। স্থান জামতোড়িয়া।

১১। ১: জুলাই তারিখে কালাঝর্ণা স্কুলের শিক্ষক হরিচাঁদ বেশরাকে রাস্তায় হত্যা করার অপচেষ্টা। উল্লেখিত ঘটনাপঞ্জীতে মিথ্যা ও অতিরঞ্জন আদৌ নেই এবং এটা পর্যালোচনা করলে সহজেই বুঝতে পারা যাবে যে, শুরুতে সাঁওতালদের সামাজিক ব্যাপার থাকলেও এক্ষণে এটা আর সামাজিক ব্যাপারের মধ্যে সীমাবদ্ধ নেই—সামাজিক ব্যাপার গৌণ হয়ে গেছে এবং রাজনীতি ও রাজনৈতিক চক্রান্ত প্রাধান্য পেয়েছে। চক্রান্তের উদ্দেশ্য হচ্ছে হত্যাকাণ্ড। বলা বাহুল্য, আক্রমণের লক্ষ্যবস্তু হচ্ছেন নিঃসন্দেহে আদিবাসী বুদ্ধিজীবীরা। বাঁচবার অধিকার ও বংশরক্ষার অধিকার সর্বজনীন অধিকার। এ দুটি অধিকার কেউ হরণ করতে পারে না। হরণ করাটা একটা গুরুতর অপরাধ। শুভবুদ্ধি সম্পন্ন মানুষ মাত্রেই স্বীকার করবেন, অপরাধ চিরকালই অপরাধ। অন্যায় চিরকালই অন্যায়। ঘটনা প্রবাহ কোথা থেকে কোথা যাবে—বলা সম্ভব নয়। দেশের অধিকাংশ লোক যদি বিচার বুদ্ধি ও মানবিক মূল্যবোধ হারিয়ে ফেলেন, তাহলে দেশের ভবিষ্যত অন্ধকার।

বড়দহি গ্রামের ডাইনীর ব্যাপারকে কেন্দ্র করে যে সমস্যা দেখা দিয়েছিল, তা ক্রমশ বিরাট ও ব্যাপক আকার ধারণ করেছে। এর পরিণতি কোথায়—কেউ বলতে পারে না।

আপনি আদিবাসীদের মঙ্গলাকাঙ্ক্ষী, রক্ষক ও পথপ্রদর্শক। কাজেই আপনি আদিবাসীদের ধ্বংসের হাত থেকেও রক্ষা করতে পারেন। শুনেছি, উত্তরবঙ্গে আদিবাসী মঙ্গল বিভাগের আধিকারিকরা আদিবাসীদের সামাজিক বিচারও নিষ্পত্তি করে থাকেন।

এত লেখার অর্থ উপদেশ দান নয়। আপনি সবই জানেন সবই বুঝেন ; একটু স্মরণ করিয়ে দিচ্ছি মাত্র।

যদি আপনি উদ্যোগী হয়ে এবং দয়া করে ডাইনীর ব্যাপারে মধ্যস্থতা করেন এবং অবিলম্বে মীমাংসার পথ তৈরি হতে সাহায্য করেন, তাহলে সংশ্লিষ্ট আদিবাসীরা শুধু

উপকৃতই হবে না, চিরকাল কৃতজ্ঞ হয়ে থাকবে। আশা করি আমার বিনীত অনুরোধ আপনি সত্বর বিবেচনা করে দেখবেন। নিবেদক ইতি—

স্বাঃ সারদাপ্রসাদ কিস্কু
সাং দাঁড়িকাডোবা
পোঃ জোরোবাড়ী
জেঃ পুরুলিয়া

To

The Governor, West Bengal
Raj Bhawan, Calcutta-700001.

Sir,

সবিনয় নিবেদন এই যে, আপনি অবশ্যই অবগত আছেন যে, গত ২০ মে ১৯৮৪ পুরুলিয়া জেলা ও মানবাজার থানার অন্তর্গত পাঁড়রা গ্রামে লোকালয় থেকে একশ গজের মধ্যে প্রকাশ্য দিবালোকে সুপরিকল্পিতরূপে আততায়ীর আক্রমণে বসন্তপুর গ্রামনিবাসী জাগরণ সরেন নির্মমভাবে খুন হয়েছেন। তিনি একজন শিক্ষকমাত্র ছিলেন না, তিনি ছিলেন পুরুলিয়া জেলা সুসার গাঁওতার সভাপতি, বসন্তপুর জুনিয়র হাইস্কুলের প্রতিষ্ঠাতা ও সেক্রেটারী, পশ্চিমবঙ্গ তপসীলী জাতি ও আদিবাসী পরিষদের পুরুলিয়া জেলা কমিটির সেক্রেটারি এবং মানবাজার ২নং ব্লক কংগ্রেস (ই কমিটির সেক্রেটারি। তিনি পঞ্চায়েত প্রধান, সভাপতি কিংবা তজ্জাতীয় কোন পদে কোন দিনই ছিলেন না, তথাপি গ্রামোন্নয়নের ক্ষেত্রে তিনি যে স্বাক্ষর রেখে গেছেন, তা সকলেরই বিস্ময় জাগায়। তিনি এক সময় 'সুসার ডাহার' নামক সাঁওতালী পত্রিকার সম্পাদকও ছিলেন। (অধুনালুপ্ত)

জাগরণ সরেন উক্ত তারিখে কিছুক্ষণ আগেই তাঁর বাড়ী থেকে কয়েক কিলোমিটার দূরে এক আত্মীয়ের বাড়ী গিয়েছিলেন। সেখান থেকে তিনি সাইকেল চড়ে একাকী বাড়ী ফিরছিলেন। আততায়ীরা তাঁর ফিরবার রাস্তায় ওঁৎ পেতে ছিল।

একশ্রেণীর লোক এই হত্যাকাণ্ডটাকে আদিবাসীদের ডাইনী প্রথার বিষময় পরিণতি বলে উদ্দেশ্য প্রণোদিত হয়ে অপপ্রচার শুরু করে দিয়েছিল। কিন্তু গোয়েন্দা কুকুরের সাহায্যে যে ক'জন দুষ্কৃতকারী ধরা পড়ে এবং পরে যে সমস্ত অপরাধীদের নাম জানা যায়—তারা সকলেই বিশেষ একটা রাজনৈতিক দলের লোক। কাজেই পরিষ্কারভাবে প্রমাণিত হয়ে গেল যে, এটা একটা নির্ভেজাল রাজনৈতিক হত্যাকাণ্ড। কিন্তু অপরাধীরা আদিবাসীদের ডাইনা প্রথার আড়ালে আত্মগোপন করার ব্যর্থ চেষ্টা করেছিল।

গত মার্চ মাসে ডাইনী প্রথার সমর্থকদের সমাবেশে নেতৃত্ব দিয়ে সি-পি-এম পার্টির প্রাক্তন পঞ্চায়েত প্রধান রামদাস বাস্কে ঘোষণা করেছেন যে, যাদের অচিরে পৃথিবী থেকে সরান হবে, তন্মধ্যে নাকি কংগ্রেসের প্রাক্তন এম. এল, এ শীতল হেমব্রম,

'তেতরে' পত্রিকার সম্পাদক মহাদেব হাঁসদা, জিরিহরি পত্রিকার সম্পাদক বালিশ্বর সরেন, জামতোড়িয়া খেরওয়াল গাঁওতার সেক্রেটারি মহেশ্বর বেশরা এবং আমার নাম রয়েছে। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য গত মার্চ মাস থেকে মানবাজার ২নং ব্লকে ডাইনী প্রথা বিরোধী আন্দোলন চলছে এবং আমরা এই আন্দোলনের নেতৃত্ব দিয়ে আসছি। নিহত জাগরণ সরেনও এই আন্দোলন থেকে খুব একটা দূরে ছিলেন না। সাঁওতালদের মধ্যে ডাইনী প্রথা বিরোধী আন্দোলন চলছে বলে এই সময় সাঁওতালেরা অন্য কারণে খুন হলেও দোষ হবে ডাইনী প্রথা বিরোধী আন্দোলনের এই মানসিকতা নিয়ে সি-পি-এম পার্টির লোকেরা এগিয়ে এসেছে। তারা এই অপূর্ব সুযোগ হাতছাড়া করবে কেন? আমাকে খুন করার জন্য কিছুদিন আগে থেকেই তৎপরতা শুরু হয়ে গেছে। গত ২৫ এপ্রিল তারিখে আমার গ্রামান্তর থেকে ফিরবার রাস্তায় আততায়ীরা ওঁৎপেতে ছিল। সেদিন দৈবক্রমে রক্ষা পেয়ে যাই। অতঃপর ছুরিকাঘাতে মহেশ্বর বেশরার প্রাণনাশের জন্য গত ৩০ মে তারিখে ২জন আততায়ী তাঁকে আক্রমণ করেছিল। তারা অবশ্য ধরা পড়ে গেছে। বলা বাহুল্য, তারাও ঐ বিশেষ রাজনৈতিক দলেরই লোক।

এই পরিস্থিতিতে আমরা যারপরনাই ভীত, সন্ত্রস্ত ও আতঙ্কগ্রস্ত। তাই আমাদের স্বাভাবিক জীবনযাত্রা বলতে কিছু নাই।

প্রসঙ্গত অপর একটা মর্মান্তিক হত্যাকাণ্ডের কথা উল্লেখ করছি। ১৯৮৩ সালের ২২ এপ্রিল বাঁকুড়া জেলার ঢেংগাআম হাইস্কুলের শিক্ষক ও বাঁকুড়া জেলা পরিষদের সদস্য ধনঞ্জয় হাঁসদা, স্কুলের মধ্যে পাঠদানরত অবস্থায় প্রকাশ্য দিবালোকে সুপরিকল্পিতভাবে খুন হয়েছেন। তিনি এক সময় বাঁকুড়া জেলা আদিবাসী মহাসভার সাধারণ সম্পাদক ও স্থানীয় ল্যাম্প সমিতির প্রতিষ্ঠাতা চেয়ারম্যান ছিলেন। এবং সর্বোপরি ডাইনী প্রথার বিরোধী ছিলেন। সি-পি-এম দলত্যাগী এই ব্যক্তির খুনের নেপথ্য কোন রাজনৈতিক দলের হাত ছিল না বললে ভুল বলা হবে।

পশ্চিমবঙ্গের আদিবাসী খুন সম্পর্কে সীমীত জ্ঞান সম্বল করেও, কয়েকটা নমুনা দিয়েই বলতে পারা যায়। পশ্চিমবাংলার আদিবাসী বুদ্ধিজীবীদের হত্যা করার কাজ শুরু হয়ে গেছে এবং সুকৌশলে এগিয়ে চলেছে। রক্ষক যেখানে ভক্ষকের ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়, তার ফল অবশ্যই ভয়াবহ। আশু এর প্রতিরোধ ব্যবস্থা গড়ে না উঠলে আদিবাসীদের অস্তিত্বই বিপন্ন হয়ে পড়বে। তাই আদিবাসীদের চিন্তান্বিত হবার যথেষ্ট কারণ আছে।

অতএব বিনীত নিবেদন, আদিবাসী বুদ্ধিজীবীদের প্রাণরক্ষার্থে আপনার কৃপাদৃষ্টি আকর্ষণ করছি। নিবেদক ইতি—

স্বাঃ সারদাপ্রাসাদ কিস্কু
সাং– দাড়িকাডোবা
জেঃ– জোরোবাড়ী, পুরুলিয়া

সান্তালী লিটারেরি কাউন্সিল, পুরুলিয়া
পোঃ অঃ—জামতোড়িয়া, জেলা—পুরুলিয়া,
পিন—৭২৩১৩১

মাননীয় লক্ষ্মীন্দ্রবাবু,

পত্রে আমার নমস্কার জানবেন। অনেকদিন গত হল, আপনার সঙ্গে পত্রালাপ করা সম্ভব হয়নি। আশা করি, কুশলে আছেন।

আপনার প্রেরিত পত্র পত্রিকাগুলি পেয়ে আসছি, হ্যাঁ 'সত্যকাহিনীর' জেরক্স কপিটিও। সাঁওতাল সমাজ থেকে ডাইনী প্রথার উচ্ছেদকল্পে আপনি যে অক্লান্তভাবে পরিশ্রম করে চলেছেন, তার জন্য আপনাকে অশেষ ধন্যবাদ জানাই। আমি মনে করি, আপনার এই মহৎ কাজের জন্য সাঁওতালদের চিরকাল আপনার কাজে কৃতজ্ঞ হয়ে থাকা উচিত।

আইন প্রণয়ন ছাড়াই সাঁওতালদের ডাইনী প্রথার এখনই অবসান ঘটবে—এ রকম মনে করার কোন কারণ নেই। কিন্তু আমাদের হতাশ হলে চলবে না, প্রচেষ্টা অব্যাহত রাখতে হবে। সত্যের জয় হবেই।

বাইরে থেকে বুঝবার কোন উপায় নেই, আসলে সাঁওতালদের প্রতি সাঁওতালেরা ভয়ানক ঈর্ষাপরায়ণ। একজন অপর একজনের সুনাম, প্রতিপত্তি সহ্য করতেই পারে না।

গ্রামের ওঝাদের উপর ভিত্তি করেই ডাইনীপ্রথা প্রতিষ্ঠিত। প্রতিটি সাঁওতাল গ্রামেই ২/১ জন করে ওঝা আছে। তারাই ডাইনী সম্পর্কে মিথ্যা ও আজগুবি গালগল্প করে ডাইনীর অস্তিত্ব বিষয়ে লোকের মনে বিশ্বাস জন্মায়। ওঝা যাকে ঈর্ষা করে, ওঝা যার প্রতি বিরাগভাজন হয়, তার আর নিস্তার নেই—তাকে কোন দিন না কোন দিন ডাইনী অপবাদ পেতেই হবে। কোন কোন ওঝারা রোগীর বিরাগভাজন ব্যক্তিদের ঘাড়েও এই দোষ চাপিয়ে দিয়ে থাকে। অবশ্য রোগীর ভায়াদ অর্থাৎ সগোত্রীয় অথবা একই গোষ্ঠীর লোকেদেরই বেশি ভয় ডাইনী হবার। কারণ, জমি, ভূমি ও নানাকারণে সগোত্রীয় লোকেদের মধ্যে সম্প্রীতি ও সুসম্পর্কের অভাব থাকেই। ডাইনীর ব্যাপারে ওঝাদের কার্য্যকলাপ সম্বন্ধে পরে আপনাকে সাবিস্তারে জানাব।

বলছিলাম, সাঁওতালদের ঈর্ষাপরায়ণতা সম্বন্ধে। আপনি শুনে থাকবেন, প্রদীপবাবু নামে এক সাংবাদিক জুলাই মাসের তৃতীয় সপ্তাহে আমাদের এলাকায় এসেছিলেন। তিনি উত্তর ভারতের হিন্দী ও ইংরেজী কাগজে লিখে থাকেন, বাংলাতেও তিনি লিখতে অভ্যস্ত। বিভিন্ন পত্রপত্রিকায় ডাইনী সম্পর্কে লেখা দেখে তিনি এ বিষয়ে আগ্রহী হয়ে উঠেন। তিনি অনেক পত্র পত্রিকা সাথে করে নিয়েও এসেছিলেন,

'সত্যকাহিনী'ও তাঁর কাছে ছিল। পশ্চিমবাংলায় এসে আপনার সংগে তাঁর কোন যোগাযোগ হয়েছিল কিনা জানি না; তবে কাঁথিতে শিবনাথ হাঁসদার সঙ্গে তার পরিচয় হয়। শিবনাথ কাঁথিতে চাকরি করে, তার বাড়ি চিরুডি গ্রামে। ডাইনী প্রথার বিরুদ্ধে আমাদের আন্দোলন সমর্থন করে ৯ ফেব্রুয়ারি তারিখের 'আজকাল'-এ তার একটি লেখাও বেরিয়েছিল। তার ধারণা হয়েছিল মাহাত গড়ার শ্রীকান্ত হাঁসদা, চিরুডির বিরসিং মুর্মু, লাউপালের সত্যনারায়ণ মুর্মু প্রভৃতিও ডাইনী প্রথার বিরুদ্ধেই রয়েছেন; যেহেতু প্রথম দুজন হচ্ছেন হাইস্কুলের শিক্ষক এবং শেষোক্ত ব্যক্তি হচ্ছেন প্রাথমিক শিক্ষক ও ল্যাম্প সমিতির সেক্রেটারি। সেইজন্য শিবনাথ প্রদীপবাবুকে আমাদের সঙ্গে যেমন দেখা করতে বলেছিল, তেমনি তাঁদের সঙ্গেও চিরুডিতে দেখা করতে বলেছিল।

প্রদীপবাবু প্রথমেই চিরুডিতে তাঁদের সঙ্গে দেখা করলে তাঁরা তাঁকে বলেন— 'আদিবাসীদের এত এত সমস্যা থাকতে আপনারা ডাইনী ব্যাপারে এত মাথা ঘামাচ্ছেন কেন?' তা ছাড়া ডাইনী প্রথা কোন সমস্যাই নয়। তাঁর হাতে একটা 'ঝাড়গ্রাম হিতৈষী' পত্রিকা তুলে দিয়ে তাঁরা আরও বলেন যে, দেশের অনেক গুনিমানী ব্যক্তি ডাইনী প্রথা সমর্থন করেন। ঝাড়গ্রাম হিতৈষীতে প্রাক্তন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী শ্রীসুবোধ হাঁসদার ডাইনী সম্পর্কে একটা বক্তব্য ছাপা হয়েছিল। বক্তব্যটি মোটামুটি হচ্ছে— ডাইনীপ্রথা একটা কুসংস্কার ঠিকই, কিন্তু যেহেতু অনেকেই এটা বিশ্বাস করেন। সেইজন্য তিনিও বিশ্বাস না করে পারেন না।

কিন্তু সুবোধবাবুর বক্তব্যের উপর আমি বক্তব্য রাখছি—যেহেতু আমাদের প্রধান-মন্ত্রী রাজীব গান্ধীর অথবা মুখ্যমন্ত্রী জ্যোতি বসুর সমস্ত বক্তব্য সকলেই একবাক্যে মেনে নেন না কিংবা মেনে নিতে পারেন না, সেইহেতু সুবোধবাবুর বক্তব্যও সকলেই নতমস্তকে মেনে নেবেন না। তাছাড়া সুবোধবাবুর মত একজন আদর্শস্থানীয় ব্যক্তিও ডাইনীর ব্যাপারে দ্বিমত পোষন করেন। তিনি ডাইনী বিশ্বাস করেন, আবার কুসংস্কারও বলছেন! সুবোধবাবু একজন রাজনীতির লোক। পারতপক্ষে কোন রাজনীতিকই চান না, ভোটাররা বিরূপ হোক। আমাদের এম. এল. এ সুধাংশু মাঝির কাণ্ডকারখানাটা দেখুন,—'ডাইনী বলে কিছু নেই' পোস্টারটি তিনি নিজে বিলি করেছেন, আবার ডাইনী প্রথার সমর্থকদের উস্কানি দিয়েও বলেছেন। ১০।৭।৮৪ তারিখে তিনি জামতোড়িয়াতে যে জনসভার ডাক দিয়েছিলেন, তার প্রচারপত্রে খোলাখুলিভাবেই ডাইনী প্রথা সমর্থন করা হয়েছে। এই তো ব্যাপার।

আদিবাসীদের সমস্যা অজস্র, এতে আমিও একমত। একটা বিরাট আদিবাসী এলাকা জামতোড়িয়াতে কিংবা বড়গড়িয়াতে একটা হাইস্কুল নেই—এইটা আঞ্চলিক সমস্যা। এই সমস্যা শিলদা কিংবা রাণীবাঁধের নয়। আমাদের বাস ধরতে ১৩ মাইল পায়ে হাঁটতে হয়—এটাও আঞ্চলিক সমস্যা। অশিক্ষা অনেকের সমস্যা হলেও মেদিনীপুরের বিলাত ফেরৎ ইঞ্জিনীয়ার নিত্যানন্দ হেমব্রমের পরিবারের সমস্যা নয়। বিভিন্ন সমস্যার ব্যাপারেও তাই। কিন্তু ডাইনী প্রথা সমগ্র সাঁওতাল জাতিরই

সমস্যা। যাঁরা বলেন—ডাইনী কোন সমস্যা নয়; এক দিক দিয়ে তাঁদের কাছে সেটাও ঠিক। গ্রামে ও সমাজে তাঁদের যথেষ্ট প্রভাব ও প্রতিপত্তি রয়েছে। এমন কোন ওঝা নেই যারা তাঁদের ডাইনী অপবাদ দিতে পারে। সুতরাং তাঁদের ক্ষেত্রে সথাও অক্ষম। আসলে ডাইনী হচ্ছে অপরের সমস্যা, তাঁদের নয়। অপরের জন্য ক'জন মাথা ঘামায়? মহাদেবের বাড়ি থেকে কোথায় ১২ মাইল দূরে বড়দাহিতে ডাইনীর ব্যাপার ঘটল, মহাদেব দৌড়ে এল। তাঁদের কাছে মহাদেব আহাম্মক ছাড়া কি?

সারাদেশে সাঁওতালদের সংখ্যা অন্ততঃ ৫০ লক্ষ। আমরা মোটামুটিভাবে দেখেছি, প্রতি বছর গড়ে প্রতি ৫০০ জনে অন্ততঃ একজন ডাইনী বলে চিহ্নিত হয়ে থাকেন। তাহলে এই হিসাবে সারা দেশে প্রতি বছর ডাইনীর সংখ্যা পাওয়া যায় ১০ হাজার। আজ অবধি সর্বাধিক ১০ হাজার টাকা জরিমানা আদায়ের কথা শোনা গেছে। কিন্তু জরিমানা, গৃহ শুদ্ধিকরণ ইত্যাদি মিলে কোন ডাইনীরই ৫০০ টাকার নিচে খরচ হয় না। ডাইনী প্রতি এই ৫০০ টাকা ব্যয় ধরলেও ১০ হাজার ডাইনীর ব্যয় ৫০ লক্ষ টাকা। বলা বাহুল্য, এই টাকায় সবটাই—মদ ও মাংসে ব্যয়িত হয়ে থাকে। তা ছাড়াও বসেছে বিভিন্ন প্রকারের শারীরিক নির্যাতন, এমন কি প্রাণদণ্ড পর্যন্ত। এই তো সেদিন ২৮।৫।৮৫ তারিখে ডাইনী অপবাদ দিয়ে মেদিনীপুর জেলা ও গোপীবল্লভপুর থানার ভাতিনিয়া গ্রামের এক মহিলা ও তার মেয়েকে কুপিয়ে হত্যা করা হল। আর একটা উদাহরণ, ১৯৮৪ সালের অক্টোবর মাসে চিরুডি গ্রাম থেকে মাত্র তিন মাইল দূরে কপাট ডাঙ্গা গ্রামের এক মহিলাকে ঝাটা পরতে বাধ্য করে গ্রামের প্রতি বাড়িতে মলমূত্র খাওয়ান হয়। এই গুলি কি সমস্যা নয়?

শ্রীকান্তবাবুরা নাকি প্রদীপবাবুকে শুধু মহাদেবের কাছেই নয়, আমাদের সংগেও দেখা করতে নিষেধ করেছিলেন। কিন্তু তিনি তাঁদের কথায় কান দেননি। তিনি আমাদের সংগে আলাপ আলোচনা করে খুব খুশি হন। আপনি 'সত্যকাহিনী'তে জাগরণবাবুর হত্যার কারণগুলি সঠিকভাবে বিশ্লেষণ করেছেন যা করার একান্ত প্রয়োজন ছিল।

আজ এই পর্যন্তই। ইতি।

আনন্দবাজার পত্রিকার সাংবাদিক বিক্রমন নায়ার পুরুলিয়ার এই ডাইনী বিরোধী আন্দোলনের উপর বিজনেস্ স্ট্যাণ্ডার্ড পত্রিকায় দুটি কিস্তিতে প্রতিবেদন ছাপেন। তাঁর সেই প্রতিবেদন ১৯৮৬-র শ্রেষ্ঠ লেখা হিসাবে 'স্টেটসম্যান অ্যাওয়ার্ড ফর রুরাল রিপোর্টিং' এর প্রথম পুরস্কার পায়। সেপ্টেম্বরের ১৬ তারিখে কলামন্দিরে এক অনুষ্ঠানের মাধ্যমে পুরস্কার দেওয়া হয়। ঐ পুরস্কার প্রাপ্তি অনুষ্ঠানে উপস্থিত থাকার

জন্য সারদাবাবুকে আসতে অনুরোধ করেন শ্রীনায়ার। সারদাবাবু অসুস্থ থাকায় অনুপস্থিত থাকবেন জেনে শ্রীনায়ারকে চিঠি লিখে জানান।] তাঁর চিঠিটি হল—

মাননীয় নায়ারবাবু,

চিঠিতে আমার নমস্কার জানবেন। বর্ষায় প্রায় এক সপ্তাহ ডাক যোগাযোগ বন্ধ থাকার পর আপনার চিঠি পেয়েছি। তার পরেও নানা কারণে আপনার চিঠির উত্তর দিতে আমার দেরি হয়ে গেল। তার জন্য আপনার কাছে ক্ষমাপ্রার্থী হয়ে রইলাম।

ডাইনী প্রথা বিরোধী আন্দোলনের প্রতিবেদন প্রকাশ করার জন্য আপনি স্টেটস্‌-ম্যান পুরস্কার পাচ্ছেন জেনে স্বাভাবিক ভাবেই খুব খুশি হয়েছি। পুরস্কার গ্রহণকালে আপনি আমাদের সংঘ কামনা করে আমাদেরও আনন্দের অংশীদার করতে চেয়েছেন তাই আমি কৃতজ্ঞ। কিন্তু কলকাতাও আমার পক্ষে নিরাপদ নয়। তার প্রমাণ এর আগেই পেয়েছি। আমার জামাইয়ের (ধনঞ্জয় হাঁসদা মে ২২।৪।৮৩ তারিখে বাঁকুড়া জেলার টাঁগাআম হাই স্কুলে পাঠদানরত অবস্থায় খুন হয়েছে) খুনীদের একজন কলকাতাতেই থাকে। আমার ওপরও তার দারুণ আক্রোশ রয়েছে। তার প্রকৃতি বালেশ্বরও জানে। তাকে ভয় না করে উপায় নেই। তাছাড়াও রাজনৈতিক ব্যাপার তো রয়েইছে। ২।১ জন আমার হিতাকাঙ্ক্ষী বামপন্থী বন্ধু-বান্ধবদের মাধ্যমে খবর পাওয়া গেছে যে, আমি নাকি ভয়ানক সরকার বিরোধী লোক হয়ে গেছি। তারা আমাকে সাবধানে থাকতেও পরামর্শ দিয়েছে। সত্যিই তো, রাজ্যের ক্ষমতাবান একজন পূর্ণ মন্ত্রীকে বহুল প্রচারিত একটি পত্রিকার (আজকাল) মাধ্যমে হামাগুড়ি দিতে বলা— আমার নিশ্চয়ই সরকার বিরোধী কাজ হয়েছে। অবশ্য প্রসঙ্গটা ছিল সাঁওতালী ভাষা, সাহিত্য ও অলচিকি বর্ণমালা বিষয়ক। এ ব্যাপারে সরকার আমাকে মামলায় ঝুলাতে পারত। কিন্তু উপায় ছিল না। আমার যুক্তিটা ছিল অকাট্য। কেঁচো খুঁড়তে খুঁড়তে সাপ বেরিয়ে যেত। তা ছাড়াও আমি আমাদের এলাকায় বহু বড়বড় আন্দোলনে সফল নেতৃত্ব দিয়ে এসেছি যার কোনটাই রাজ্য সরকারের অনুকূলে ছিল না। ফলে বামপন্থীদের একেবারে চক্ষুশূল হয়ে গেছি। সেইজন্য তারা ডাইনী-প্রথার অন্ধ সমর্থকদের আড়াল থেকে আমাকে খুন করার বার-বার অপচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। ডাইনী প্রথা বিরোধী আন্দোলন শুরু হবার আগেও ১৯৮০ সালে বাঁকুড়া জেলায় খোড়াধরা হাট থেকে ফেরার পথে আমাকে খুন করার অপচেষ্টা ব্যর্থ হয়েছে। তাই আমাকে সব সময় অতি সাবধানে থাকতে হয়। এই জন্যেই আমি কলকাতা যেতে পারছি না। আনন্দের দিনে আপনার পাশে থাকতে পারছি না বলে আমাকে ক্ষমা করবেন। বালিশ্বর একদিন আমার কাছে এসেছিল। মহাদেব তাকে সংগে নিলে সে কলকাতা যেতে রাজী আছে। মহাদেব কলকাতা গেলে ও আমার অভাব সে অনেকটাই পূরণ করতে পারবে। বরঞ্চ সে অনেক বিষয়েই আমার চেয়ে বেশি যোগ্যতায় অধিকারী। ডাইনীপ্রথা বিরোধী আন্দোলনে সে যা কাজ করে আসছে, তার তুলনা মেলা ভার।

ডাইনী প্রথা সাঁওতালীদের শুধুমাত্র অন্ধবিশ্বাস ও কুসংস্কারই নয়—একটা বিরাট ও জটিল সমস্যাও বটে। ডাইনী প্রথার প্রকোপ যে হারে বৃদ্ধি পেয়ে চলেছে, তাতে মনে হয়; অতএব বিলোপ সাধিত না হলে সাঁওতাল সমাজ অচিরে ধ্বংস হয়ে যাবে। মোটামুটিভাবে সমীক্ষা করে দেখা গেছে, ফি বছর প্রতি সাঁওতাল গ্রামে অন্ততঃ একবার ডাইনী ধরার ব্যাপার ঘটে থাকে। বর্তমানে সারাদেশে পঞ্চাশ লক্ষাধিক সাঁওতাল রয়েছে। কাজেই প্রতি বছর দশ হাজার ডাইনী ধরার ঘটনা ঘটে থাকে—এ ত সোজা হিসাব। বর্তমানে প্রতিটি ডাইনী জনিত ঘটনায় গড়ে অন্ততঃ ৫০০ টাকা জরিমানা আদায় হয়ে থাকে। তাই দেখা যাচ্ছে, ফি বছর ডাইনীর ব্যাপার থেকে কম করেও ৫০ লক্ষ টাকা আদায় হয়ে থাকে যার সমস্তটাই মদ ও মাংসে ব্যয়িত হয়ে থাকে। তা ছাড়াও খুন, জখম, লুঠ পাঠ, বিতাড়ন ইত্যাদি কত রকমের ঘটনা ঘটে থাকে, তার হিসাব ক'জনে রাখে?

আইন প্রণয়ন ব্যতীত প্রথার অবলুপ্তি ঘটান সম্ভবপর নয়। রাজ্য সরকার ডাইনী প্রথা বে-আইনী এবং ডাইনীর নাম করে অত্যাচার দণ্ডনীয় অপরাধ বলে পোষ্টার ছাপিয়ে নিজের কর্তব্য শেষ করেছেন। কিন্তু সকলেই জানে, ডাইনী প্রথা কোন দিনই আইন সিদ্ধ ছিল না বা এখনও নেই এবং ডাইনী অপবাদ দিয়ে অত্যাচার করলে বিচারে সাজাও হয়ে থাকে। কাজেই বর্তমানে সরকার আদৌ নতুন কিছু করেননি। বরঞ্চ পোস্টারের ভুল অর্থ করে অত্যাচারের মাত্রা বেড়ে গেছে।

গত এক মাসের মধ্যে আমাদের গ্রাম থেকে দশ কিলোমিটার দূরে বড়কদম নামক গ্রামে এক ব্যক্তিকে ডাইনী করে তাকে ছ হাজার টাকা জরিমানা করা হয়েছে। সে বাড়ীর যাবতীয় বিক্রি করে মাত্র তিন হাজার টাকা আদায় দেয়। বাকী টাকার জন্য তার উপর অত্যাচার শুরু হলে যে থানায় ডাইরী করে। দেখা যাক তার ফল কি হয়? আবার আমাদের বাড়ি থেকে ২ কিলোমিটার দূরে গোপালপুর গ্রামের লক্ষ্মীকান্ত সরেনকে ডাইনী করা হয়। সে যথারীতি জরিমানা আদায় দেবার পর এবং প্রতিপক্ষের বাড়ি শুদ্ধিকরনের পর 'দেওয়ানি' করলে বাঁকুড়া জেলার এক সখা লক্ষ্মীকান্তের কাছ থেকে ৫.৫ টাকা 'মুদা' (প্রণামী) গ্রহণ করে খেতু সরেনকে ডাইনী বলে ঘোষণা করে। খেতু সরেনও ৫৬০ টাকা জরিমানা দেবার পর এবং অন্যান্য করণীয় কাজ সমাধা করবার পর হুগলী জেলার অন্তর্গত ধনেখালির এক নামী সখার কাছে আপিল করলে সখা তাকে নির্দোষ বলে রায় দেয়। এতে গ্রামের লোকের অলাভ কিছুই নেই। কারণ এর আগেই তারা লক্ষ্মীকান্ত ও খেতুর কাছ থেকে জরিমানার মোটা টাকা পেয়ে গেছে। তা ছাড়াও গৃহ শুদ্ধিকরনের নামে ছাগল-মুর্গী-ভেড়া প্রভৃতির মাংস সহযোগে অবাধে মদ্যপান চলেছে। তাহলে সমাজে এরূপ প্রথা চালু থাকাটা খারাপ বলবে ক'জনে?

সখারা অলৌকিক ক্ষমতার অধিকারী নয়। তার একটা উদাহরণ দিই। গত মে মাসে বড়দহি গ্রামের লাগরুডি পাড়ার লেচে হেমব্রমের পুত্রবধূ স্বল্প রোগ ভোগের পর মারা যায়। তারা সখার কাছে যাবে কি না—আমার জানা ছিলনা। কিন্তু আমি

মন্তব্য প্রকাশ করেছিলাম যে, যদি তারা সথার কাছে যায়, তাহলে লেচের ভাই রথু ডাইনী হবে। যথাসময়ে তারা সথার কাছে যায় এবং আমার অনুমান অক্ষরে অক্ষরে মিলে যায়। রথু পরে চ্যালেঞ্জ জানিয়ে অন্য একজন সথার কাছে দেওয়ানি করে। তাতেও সে হেরে যায়। বেশি ধন-দৌলতের জন্য রথু একটা অপদেবতাকে পুষে রেখেছে বলে সথা ঘোষনা করে। এ ব্যাপারে জরিমানা ইত্যাদিতে রথুর ২০০০ (দু হাজার) এর উপর টাকা খরচ হয়েছে।

আগের দিনে জরিমানা অনাদায় হলে দোষী ব্যক্তিকে একঘরে করে রাখার প্রথা চালু ছিল। বর্তমানে এই প্রথা অচল হয়ে গেছে। জরিমানার বহর বেড়েছে, মানুষের চেতনাও বেড়েছে। এমতাবস্থায় দোষী ব্যক্তিকে একঘরে করে রেখে একতাবদ্ধ গ্রামবাসীরা জরিমানার মোটা টাকা থেকে বঞ্চিত হবে কেন? যদি জরিমানার টাকা আদায় করতে গিয়ে বাড়াবাড়ি হয়, তাহলে তো রক্ষা করবার জন্য রাজনৈতিক দাদারা রয়েছেন।

আমি কয়েকটা গ্রামের কয়েক হাজার সাঁওতালের মধ্যে উদ্ভূত ডাইনী সংক্রান্ত ঘটনার কয়েকটা নমুনা তুলে ধরলাম। দেশে তো কম করেও পঞ্চাশ লক্ষ সাঁওতাল রয়েছেন। আশাকরি, আগের মতই ডাইনী বিরোধী আন্দোলন সমর্থন করে আমাদের কৃতজ্ঞতা পাশে আবদ্ধ করবেন।

আজ বিশেষ লিখলাম না।

জয়হিন্দ

মাননীয় নিরঞ্জনবাবু,

আজ আপনাকে একটা বড় দুঃখের সংবাদ পাঠাচ্ছি। গত কল্য ২০/৫/৮৪ তারিখ রবিবার আনুমানিক বেলা ৮ টার সময় মানবাজার থানা ও মানবাজার ২নং ব্লকের অন্তর্গত পাঁড়রা গ্রামে পুরুলিয়া জেলা 'সুসার গাঁওতা'র সভাপতি, বসন্তপুর জুনিয়র হাইস্কুলের সেক্রেটারি ও মানবাজার ২নং ব্লক কংগ্রেস কমিটির প্রাক্তন সভাপতি বসন্তপুর গ্রামনিবাসী জাগরন চন্দ্র সরেন খুন হয়েছেন। লোকালয় থেকে প্রায় ১০০ গজ দূরে ফাঁকা রাস্তায় এই হত্যাকাণ্ড সংঘটিত হলেও পাঁড়রার লোক কাউকে খবর দেয়নি। প্রায় এক হাজার লোক সংখ্যা বিশিষ্ট পাঁড়রা গ্রামখানি সম্পূর্ণ সি-পি-এম দের দখলে। প্রকাশ থাকে যে, এর আগে ঐ গ্রামে কয়েকটি রাজনৈতিক অত্যাচার চলেছিল।

অনেকের মতে এই হত্যাকাণ্ডটি সম্পূর্ণ রাজনৈতিক। পত্রপাঠ সাংবাদিক পাঠালে বাধিত হব। ইতি

পাঁড়রা গ্রামটি জামতোরিয়া
থেকে ৩ মাইল দূরে
অবস্থিত। প্রয়োজন বোধে
একটি 'বিজ্ঞপ্তি' পাঠালাম।

সান্তালী লিটারেরি কাউন্সিল, পুরুলিয়া
পো: জামতোড়িয়া জেলা-পুরুলিয়া ৭২৩১৩১।

দাঁড়িকাডোবা
২৩/৭/৮৬

মাননীয় লক্ষ্মীন্দ্রবাবু,

চিঠিতে আমার নমস্কার জানবেন। অনেকদিন আপনার কোন খবর পাইনি। আশা করি, কুশলে আছেন। আবার আপনাকে বাঁ হাতে চিঠি লিখছি।

কিছুদিন আগে বাঁকুড়া জেলা আদিবাসী কল্যাণ অফিসের একজন কর্মচারী ও বাঁকুড়া জেলা আদিবাসী স্বেচ্ছাসেবী সংস্থা সমূহের সমন্বয় কমিটির একজন সক্রিয়-সদস্য মনোহর হাঁসদা আমার দুঃসময়ে আর্থিক সাহায্য নিয়ে আমার কাছে এসেছিলেন। তাঁর কাছে জানলাম, উক্ত সমন্বয় কমিটি জান-সথাদের শোষক হিসাবে চিহ্নিত করেছেন এবং জান-সথাদের বিরুদ্ধে বলিষ্ঠ পদক্ষেপ গ্রহণ করেছেন। তাঁদের এই কাজ সত্যই প্রশংসনীয়। তাঁদের কর্মকাণ্ড ১৯৮৬ সালের গোড়ায় আরম্ভ হয়েছে। অথচ আমাদের ডাইনী প্রথা বিরোধী আন্দোলন শুরু হয়েছে ১৯৮৪ সালে। এর থেকেই ধারনা জন্মে, আমাদের আন্দোলন থেকেই সম্ভবত তাঁরা অনুপ্রেরণা পেয়ে থাকবেন। অবশ্য দুটো আন্দোলনের প্রকৃতি ভিন্নরূপ। ভিন্ন তো হবেই। কারণ তাঁরা বামফ্রন্ট সমর্থক, তাদের হাতে ক্ষমতা আছে। মনোহর হাঁসদা-র কাছ থেকেই আবার জানতে পারা গেল, পুলিস বড় বড় জান-সথাদের কাছ থেকে নিয়মিতভাবে মোটা টাকা পাওনা আদায় করে থাকে। পুলিসই আস্কারা দিচ্ছে, তাই জান-সথারা নির্ভয়ে তাদের ব্যবসা চালিয়ে থাকে। যাইহোক, সমন্বয় কমিটির ডাইনীপ্রথা বিরোধী আন্দোলন দেশের সামনে প্রকাশ পাওয়া উচিত। তাহলে ডাইনীপ্রথা বিরোধী আন্দোলন ব্যাপক আকার ধারণ কর[illegible] তথ্য সংগ্রহ করে বড় বড় পত্রিকায় প্রকাশ করবার ক্ষমতা [illegible]পনি দয়া করে এ কাজটা করবেন আশা রাখি?

ধান রোওয়ার কাজ শুরু হয়ে[illegible] শুয়ে শুয়ে দিন কাটাচ্ছি। অধিক লেখার ক্ষমতা হারিয়েছি।

মাননীয় লক্ষ্মীন্দ্রবাবু,

পত্রে আমার নমস্কার জানবেন। বেশ কিছুদিন হল, আমাদের মধ্যে পত্র যোগাযোগ বন্ধ ছিল। আশা করি, সপরিবারে কুশলে আছেন।

আমি ১৯৮৪-৮৫ সালে ডাইনী সংক্রান্ত বিষয়ে বেশ কিছু লোককে ও সরকারি অফিসে চিঠি লিখেছিলাম। তখন কার সমস্ত চিঠি পত্রের নকলই আমার কাছে আছে। আপনি গত মার্চ মাসে কায়রা গ্রামের ক্রীড়া উৎসবে এসে সুয়না গ্রামের মহেশ্বর বেশরার বাড়ি আসেন, সেবারে সস্ত্রীক আমার বাড়িও আসেন এবং একটি চিঠি নিজে নকল করে নিয়ে যান। আবার আপনি কয়েকটা চিঠি নকল করে আপনার কাছে পাঠিয়ে দিতে আমাকে অনুরোধ করে যান। সেটা অনেকদিন হয়ে গেল। আমি ভুলে গেছি। কোন চিঠিটার নকল আপনি নিয়ে গেছেন এবং কোন কোন চিঠির নকল আপনার কাছে পাঠাতে আমাকে বলেছেন। যাই হোক, আমি তিনটি চিঠি মন্মথকে দিয়ে নকল করিয়ে পাঠালাম।

আপনার লিখিত 'পুরুলিয়ার ডাইনী বিরোধী আন্দোলন' বইটি ছাপা কতদূর হল উক্ত বইয়ের জন্য আমার কিছু লিখবার ছিল। কিন্তু ডান হাতে কলম ধরতে পারছি না, লিখব কি করে? ডাইনী প্রথা বিরোধী আন্দোলনও প্রায় এইখানেই থেমে গেছে। কিন্তু আন্দোলনে একটা নিশ্চিতই হয়েছে—শিক্ষিত যুবকদের মধ্যে ডাইনী প্রথা বিরোধী মানসিকতার সৃষ্টি হয়েছে।

জাগরণ সরেন অন্যান্য কাজের ফাঁকে ফাঁকে সাঁওতালী সাহিত্যেরও চর্চা করতেন। তাঁর লেখা কবিতাগুলি বিভিন্ন পত্রিকায় ছাপা হয়ে ছড়িয়ে ছিটিয়ে ছিল। কিছুদিন আগে মহাদেব ঐ গুলি সংগ্রহ করেছে। মেচেদার ডঃ সুহৃদকুমার ভৌমিক জাগরণ সরেনের কবিতার বই ছাপাতে রাজী হয়েছেন। দেখা যাক, কি হয়।

(চিঠির অংশবিশেষ ছাপা হল)

[ডাইনী প্রথার পক্ষের লোকেরা সারদাবাবুকে নানাদিক থেকে কাবু করতে না পেরে নতুন পন্থায় আক্রমন শুরু করেছে। সারদাবাবুর ঘনিষ্ঠ সহযোগী চক্রধর টুডুকে ভাঙিয়ে ওকে দিয়েই সারদাবাবুকে মারার চেষ্টা চলছে। সম্প্রতি একটি ঘটনা ঘটেছে। আমাকে লেখা সারদাবাবুর এই চিঠিতে সেই ঘটনার বিস্তারিত বিবরণ দেওয়া হয়েছে। শুধুমাত্র অংশটুকু এখানে ছাপা হল]

মাননীয় লক্ষ্মীন্দ্রবাবু

এখন আমার, সুধীর ও মিলনের পরিস্থিতি ভয়ানক খারাপ। চক্রধর বিরোধী দলে যোগ দিয়েছে। সে প্রকাশ্যে বলে বেড়াচ্ছে যে, সে সুধীর ও মিলনকে জেল

খাটাবেই। চক্রধরের প্রথম রাগ হয় তাকে টি. ভি তে না নেওয়ার জন্য। সে রাগটা ছিল আমার, সুধীর ও মিলনের উপর। তার উপর আমার সংগে সুধীরের ও মিলনের ঘনিষ্টতা বেড়ে যাওয়াও সে পছন্দ করে না।

শেষের বিরোধটি হচ্ছে একটি পুকুরকে কেন্দ্র করে। আমার বাড়ির দক্ষিণে বনের ধারে যে পুকুরটি রয়েছে ওটি তৈরি হয়েছে ১৯৭২-৭৭ সালে টি, আর, স্কীমে। পুকুরের জন্য জমি দিই আমি, সুরেন্দ্র মুর্মু ও শুনা মুর্মু। শুনা হচ্ছে সুরেন্দ্রর কাকা। সুরেন্দ্র হচ্ছে চক্রধরের ছোট ভগ্নিপতি। চক্রধরের আমাদের দাঁড়িকাডোবা মৌজাতে এক ছটাকও জমি নেই। পুকুর খোঁড়া শুরু হওয়ার পর থেকে আমি নিজের হাতে পাথর ফেলার কাজ করি। এখনও পুকুরে গেলে বাঁ হাতে পাথর ফেলে থাকি। পুকুর পাড়ে নিজের হাতে আমি তাল, খেজুর ও আতা গাছ রোপন করেছি। পুকুর খোড়ার কাজ শেষ হলে সুরেন্দ্র, শুনা ও আমি পুকুরে মাছ চাষ করি। কিন্তু সুরেন্দ্র ও শুনার বাড়ি দূরে হওয়ার জন্য ভাগচাষী নিতে হয়। ভাগচাষীদের মধ্যে শেষ পর্য্যন্ত চক্রধর ও ডমন মাহাতই টিকে থাকে। অবস্থা বুঝে তারা ভয়ানক বাড়াবাড়ি আরম্ভ করে দিল। মাছ ধরার সময় তারা সুরেন্দ্র ও শুনাকে খবর দিত না। মাঝে মাঝে আমাকেও খবর দেওয়া হত না। যখন খবর পেতাম, তখনও মাছ ধরার জায়গায় প্রায়ই থাকতে পারতাম না, থাকত কেবল আমার বাগাল লখিন্দর। একজনকে ফাঁকি দেওয়া কিছুই নয়। পুকুরে অনেক চুরি হচ্ছে দেখে '৮৪ সালে আমি, সুধীর ও আরও একজনকে ভাগচাষী হিসাবে রাখি। প্রথম কয়েক বছর তারা কোন পাত্তাই প্রায় না চক্রধরের কাছে। ৮৭-৮৮ সালে তারা ন্যায্য অধিকার পেল। ততদিনে শুনা মারা গেছে। সুধীরদের আমলে মাছ বিক্রি করে প্রায় ২২০০ টাকা হল। এই টাকা সকলকে সমান ভাগে ভাগ করে দেওয়া হল, চক্রধর ও ডমন মাহাতকেও। '৮৮-'৮৯ সাল। নতুনভাবে পুকুরে মাছ চাষ শুরু হয়, ভাগচাষীও নতুন ভাবে নেওয়া হয়। এবারের ভাগচাষী হচ্ছে সুধীর, মিলন ও ফকির। ফকির হচ্ছে চক্রধরের বড় ভগ্নিপতি। চক্রধরকেও রাখতে চাওয়া হয়েছিল। কিন্তু সে রাজী হয়নি। আসলে তার চাই একাধিপত্য। তাই সে আমাদের বিরুদ্ধে নানারূপ চক্রান্ত করতে লাগল এবং কুৎসা রটনা করতে লাগল। সে আমাকে একঘরে করতে চেয়েছিল। সুরেন্দ্র ও ফকির হচ্ছে তার ভগ্নিপতি এবং মিলন ও সুধীরের মামলা আছে। চক্রধর ঐ মামলার একজন সাক্ষী। চক্রধরের ধারনা, তারা সবাই তার কথা শুনবে। এই ধারনার বসেই সে সবাইকে আমার বাড়ী আসতে নিষেধ করে। কিন্তু তারা কেউই তার কথা শুনে না। শেষে জানুয়ারি মাসের ৩ তারিখে আমাদের পুকুরটি সে লুঠ করিয়ে দিল। আনুমানিক দু কুইণ্টালের মত মাছ লুঠ হয়।

আমরা জামতোড়িয়া ফাড়িতে খবর দিই। মেজোবাবু আসতে রাজী হননি। কেবলমাত্র একজন পুলিশ ও দুজন হোমগার্ড সরেজমিনে আসে। তখনও কিছুলোক মাছ ধরতেই ছিল। পুলিশ আসতেই তারা পালিয়ে যায়। সেই মোতাবিক

আমরা পরদিন ফাঁড়িতে যাই ও কাগজপত্র দেখাই। উপরন্তু মাছ লুঠ হওয়ার জন্য ক্ষতিপূরণ ও শাস্তির দাবী জানিয়ে ফাঁড়িতে আবেদন জানাই। ফাঁড়ির মেজোবাবু J.L.R.O. কে চিঠি লেখেন যে, পুকুরটিতে কার স্বত্ব আছে। J.L.R.O. কাছ থেকে কোন রিপোর্ট আসেনি। মেজোবাবুও কোন কিছু করেননি। তিনি কেবল আমাদের পক্ষের বিরুদ্ধে নানারকম অপপ্রচার চালাচ্ছেন। সে প্রসঙ্গ থাক।

সুধীর ও মিলনের খুনের মামলাটির বিচার শুরু হবে মার্চ মাসের ৭ তারিখ থেকে। উকিল হচ্ছেন অরূপকুমার ভট্টাচার্য্য। তিনি জানিয়ে দিয়েছেন যে, এই বিচারে সুধীর মিলনদের ৬০০০ হাজার মত টাকা খরচ হবে। সুধীর ও মিলনের এই ব্যয় বহন করবার মত আর্থিক অবস্থা নয়। সেইজন্য আমি আপনার কাছে অনুরোধ জানাচ্ছি, যদি আপনারা দয়া করে এই সময় তাদিগকে কিছু কিছু আর্থিক সাহায্য করেন, তা হলে বেচারাদের বড়ই উপকার হয়। নিরঞ্জন বাবুকেও এই সমস্ত কথা জানাবেন।

শ্রীপ্রদীপ বসু,
প্রযত্নে ডঃ এন, আর, রায়

মাননীয়েষু,

পত্রে আমার নমস্কার জানবেন। ইতিপূর্বে আপনার সঙ্গে আমার পরিচিত হবার কোন সুযোগ ঘটেনি। কিন্তু সুযোগ ঘটে গেল অপ্রত্যাশিত ভাবে। আমি জুন মাসের ৪ তারিখে 'তেতরে' পত্রিকার সম্পাদক মহাদেব হাঁসদাকে দেখতে গিয়েছিলাম। সে এখন ভয়ানক অসুস্থ। চিকিৎসকেরা রায় দিয়েছেন অসুখ বলতে Over work less died তাই তাঁরা তাকে উপযুক্ত খাদ্যগ্রহণ করতে পরামর্শ দিয়ে কায়িক ও মানসিক পরিশ্রম করতে কিছুদিনের জন্য নিষেধ করেছেন। আশ্বস্ত হবার কথা, সে চিকিৎসকদের এই ব্যবস্থাপনায় ক্রমশঃ সুস্থ হয়ে উঠছে। মহাদেব হাঁসদার অসুস্থতার কারণেই তার কাছে আসা কিছু চিঠিপত্রের উত্তর দেবার ভার আমার উপর বর্তেছে। তাঁর মধ্যে আপনার চিঠিটিও রয়েছে।

ঘটনাচক্রে বড়দহি গ্রামের চক্রধর টুডু, মিলন টুডু, সুধীর টুডু এবং প্রাক্তন MLA কালপত্তি গ্রামনিবাসী শীতল হেমব্রম ও আমি ডাইনীপ্রথা বিরোধী আন্দোলনের সঙ্গে জড়িত হয়ে পড়ি। পরে মহাদেব হাঁসদা, জামতোড়িয়া খেরওয়াল গাঁওতার সেক্রেটারী মহেশ্বর বেশরা, অধুনালুপ্ত জিরিহিরি পত্রিকার সম্পাদক বালেশ্বর সরেন প্রমুখেরা আমাদের সঙ্গে স্বেচ্ছায় যোগ দেয়। পুরুলিয়া জেলার সাঁওতালদের অ-রাজনৈতিক

একটি প্রতিষ্ঠান. পুরুলিয়ার সুসার গাঁওতার সভাপতি ও বসন্তপুর জুনিয়ার হাইস্কুলের সেক্রেটারী জাগরণ সরেন, যিনি ২০।৫।৮৪ তারিখে নিজ গ্রামের অদূরে পাড়রা গ্রামে প্রকাশ্য দিবালোকে নির্মমভাবে খুন হন। তিনি যে এই আন্দোলন থেকে দূরে ছিলেন—তা বলা যায় না। পরে প্রাক্তন M.L.A. শীতল হেমব্রম কিন্তু পিছু হটে যান।

ঘটনাটা ঘটে ১৯৮৪ সালের মার্চ মাসে। তার আগে ঘটনাস্থলে বড়দহি গ্রাম সম্বন্ধে কিছু পরিচয় দেওয়া দরকার।

আমার গ্রাম দাঁড়িকাডোবার অতি নিকটে বড়দহি গ্রাম। বড়দহি আমার স্কুল গ্রামও। এই বড়দহি গ্রামের চার শতাধিক অধিবাসীদের সকলেই আদিবাসী সাঁওতাল। এই গ্রামে প্রায় প্রতি বছর কারও অসুখ-বিসুখে গ্রামের ২।১ জনকে ডাইনী করা হয়ে থাকে। ডাইনী সাব্যস্ত করার পর দোষী ব্যক্তিকে প্রথা অনুযায়ী জরিমানা করা হয়। এবং অচিরে রোগীর বাড়ী শুদ্ধিকরণ করাতে বাধ্য করা হয়। দোষী ব্যক্তিকে মারধোর করার ঘটনাও বিরল নয়। ডাইনীর ব্যাপারে বড়দহি গ্রামে জীবনহানি ঘটেনি—একথা জোড় করে বলা যায় না। দু বছরও অতিক্রান্ত হয়নি, বড়দহি গ্রামেরই বলহরি টুডু নামক এক ব্যক্তিকে এক মাসের মধ্যে দু'বার ডাইনী করা হয়েছিল এবং মারধোর করে তার কাছ থেকে জরিমানা আদায় করা হয়েছিল। এ ব্যাপারে সবশুদ্ধ তার ব্যয় হয়েছিল দেড় হাজার টাকার মত। মাত্র এক মাস আগেও রথ হেমব্রমকে ডাইনি করা হয় তার দাদা লেচে হেমব্রমের পুত্রবধূর মৃত্যুতে। রথু আপীলেও হেরে যায়। ফলে তার জরিমানা দ্বিগুন হয়। মনে হয়, এই দোষ থেকে নিস্কৃতি পেতে তাকে অন্তত দু'হাজার টাকা বাড়ী থেকে বার করতে হয়েছে। উল্লেখ্য, রথু একবৎসর আগেও ডাইনী প্রথার শিকার হয়েছিল। আনুমানিক পঞ্চাশ বছর আগের কথা। বড়দহি গ্রামের দু'সন্তানের জননী চাঁদমনি নামে এক বিধবার আশি বিঘার ওপর স্বামীর পরিত্যক্ত জমি ছিল। তাকে ডাইনী করা হলে সে প্রাণভয়ে সমস্ত জমি ইস্তাফা দিয়ে অন্যত্র চলে যায়। পরে সে জমি উদ্ধার করা আর সম্ভব হয়নি। গ্রামের গোপাল টুডু নামক এক ব্যক্তিও ডাইনী হওয়ায় জরিমানার টাকার সামাল দিতে গিয়ে সপরিবারে বছর সাতেক ঘরছাড়া হয়েছিল। ইদানীং সে বাড়ী ফিরে এসেছে। বড়দহি গ্রামেই ডাইনীর এমনি কত ঘটনা ঘটে চলেছে—তার হিসাব কে রাখে।

বড়দহি গ্রামের লড়িরাম টুডুর অসুখ করেছে বেশ কিছুদিন ধরে। সে গ্রামের মোড়লও। চিকিৎসা যা হয়েছে তা নামমাত্র। অসুখ সারছে না দেখে সে গ্রামের ওঝার কাছে গেল। মহাবিজ্ঞ ওঝা তেল দেখে বলল—"লোকে চালন করছে, যার জন্য তুমি মরছনা। নিমছা-নিমছি করালে হয়তো এবারটা সারবে। তবে যদি সখা ঘর, না যাও তাহলে ভবিষ্যতে ফল খারাপ হবে, তখন তোমাকে সারানই যাবে না।" ডাইনী যে হতে পারে, ওঝা মোটামুটি তার আভাসও দিল।

লড়িরাম আর কি করে, সে জমি বন্ধক দিয়ে দু'শর মত টাকা যোগাড় করল। তারপর গ্রামের তেল দিল। ওঝা লড়িরামকে যা যা বলেছিল, সমস্তই গ্রামের কিছু

লোকের মধ্যে ইতিমধ্যে জানাজানি হয়ে গিয়েছে। কাজেই গ্রামের লোকের তেল দেখাতে অসুবিধা হল না; তিনটার মধ্যে দুটা তেলের সঙ্গে হুবহু মিলে গেল। এরপর? এরপর লড়িরামের ইচ্ছা। লড়িরাম বলল-- 'সখাঘর যেতেই হবে, ডাইনীকে খুঁজে বার করতেই হবে। গ্রামের লোক আমার সঙ্গে চল।'

দু'একটা পরিবার বাদ দিয়ে গ্রামের লোকের এটাই তো দরকার। কারণ জরিমানা দিতে হবে একজনকে; গ্রাম্য ঘোল আনায় মোটা টাকা আয় হবে যার দ্বারা, একদিন মদ ও শুওর মাংস আনন্দ করে খাওয়া হবে।

গ্রামবাসীরা কোন্ সখার শরণাপন্ন হবে। সেটা রোগী কিংবা রোগীর বাড়ীর লোকের ইচ্ছা। গ্রামবাসী তার অনুসরণ করতে বাধ্য। লড়িরাম গ্রামের লোকদের নিয়ে গেল জোরবাদ গ্রামের লিলু সখার কাছে। ঐ গ্রামেরই শ্রীকান্ত সখার মৃত্যুর পরে তারই শিষ্য লিলু সখা হিসাবে বেশ নাম করে নিয়েছে। লড়িরামের ব্যাপারে কে ডাইনী হবে—গ্রামের লোক আগেই মোটামুটি সিদ্ধান্ত নিয়েছিল। তিন দলের তেল দেখার ফলাফল বিচার করে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করাটা হল একটা নিয়ম। সিদ্ধান্ত গ্রহণ না করে সখাঘর যাওয়ার কোন সার্থকতা নেই। কিন্তু সখা আজে বাজে অনেক বকে গ্রামের লোককে তাক লাগিয়ে দিল। শেষে ললিনী টুডুর স্ত্রীকে ডাইনী বলে ঘোষণা করল। গ্রামের লোক একবাক্যে স্বীকার করে নিল। কেবল ললিনী নিরুত্তর রইল। অর্থাৎ সেও স্বীকার করে নিল। স্বীকার না করেও তো উপায় নেই। কারণ গ্রামের লোকের সবারই হাতে লাঠি রয়েছে। তাদের বিপরীত কথা বললে তার পিঠে যে লাঠি পড়বে।

যারা সমাজের ভয় তাদের সহজেই চিনতে পারা যায়। তাদের সবার হাতে লাঠি দেখে। সবার লাঠি ধরা নিয়ম না হলেও কেউ লাঠিছাড়া বড় একটা সখাঘর যায় না। কারণ ডাইনীকে কিংবা তার বাড়ীর মালিককে যে কোন সময় যে কোন জায়গায় মারধোর করতে হতে পারে। ডাইনীকে জব্দ করতে হলে শুধু হাতে কি হয়?

কিন্তু সখা লড়িরামের কাছ থেকে ১২০ টাকা মুদ্রা বা পারিশ্রমিক গ্রহণ করল। সখার মুদ্রার অর্দ্ধেক অর্থাৎ ১২০ টাকার অর্দ্ধেক ৬০ টাকা লড়িরামের কাছ থেকে পথ খরচ হিসাবে গ্রামবাসীদের প্রাপ্য তারা পেলও। গ্রামবাসীরা রাস্তায় ৬০ টাকারই মদ খেল।

গ্রামবাসীরা গ্রামে ফিরল। পরদিন তারা এক সভায় মিলিত হয়ে বিশদভাবে পর্যালোচনা করার পর ললিনীর কাছ থেকে প্রথা অনুযায়ী জরিমানা আদায় করে এবং লড়িরামের বাড়ী শুদ্ধিকরণ করাতে ললিনীকে বাধ্য করে।

জরিমানার টাকা থেকে অভিযোগকারীকে ক্ষতিপূরণ হিসাবে কিছু দেবার নিয়ম নেই। এমন কি যত টাকাই জরিমানা আদায় হোক না কেন, মানবিকতার খাতিরে

রোগীকে কিছু দিয়ে সাহায্য করে কেউ কোথাও নজির সৃষ্টি করে নি। কাজেই লড়িরামও জরিমানার টাকা থেকে কিছুই পায় নি। জরিমানার টাকা সামগ্রিকভাবে গ্রামবাসীদের প্রাপ্য। যার সমস্তটাই মদ ও মাংসে ব্যয়িত হয়ে থাকে।

জরিমানার টাকা আদায় দেবার পর এবং রোগীর বাড়ী শুদ্ধিকরণ করাবার পর দোষী ব্যক্তি ইচ্ছা করলে আপীল (দেওয়ানি) করতে পারে। যে কোন সথার কাছে গিয়ে। আপীলের সময় গ্রামের সকলের সথাঘর যাওয়ার দরকার নেই—তাদের পক্ষ থেকে কেবল ২জন প্রতিনিধি এবং পড়শী গ্রামের ২জন লোক অবশ্য গ্রামবাসীদের মনোনীত, গেলেই যথেষ্ট। আপীলকারীকে এদের ব্যয় বহন করতে হয়। কিন্তু প্রথম অভিযোগকারীকে ব্যক্তি নিজ ব্যয়ে তার বিশ্বাসী কয়েকজন লোক নিয়ে আপীলকারীর অনুসরণ করে থাকে। যদি আপীলকারী পুনরায় দোষী বলে সাব্যস্ত হয়, তাহলে জরিমানার টাকা দ্বিগুণ দিতে হয়। দৈবগুণে যদি অপরের ঘাড়ে দোষ চাপাতে পারে তাহলে তার কাছ থেকেও আগের দেওয়া জরিমানার টাকা ফেরৎ পায়। বলাবাহুল্য এর কাছ থেকেও গ্রামবাসীদের জরিমানা প্রাপ্য হয়ে যায়। যতক্ষণ না স্বেচ্ছায় কিংবা অসামর্থ বশতঃ কেউ এটা বন্ধ করছে, ততক্ষণ এই নিয়মই বহাল থাকে। মোট কথা ডাইনীর ব্যাপারে সথাঘর যাওয়া আরম্ভ হলে যতবারই সথাঘর যাওয়া হোক না কেন, গ্রামবাসীদের একটা রোজগার লেগেই থাকে।

সাঁওতাল সমাজে ডাইনী হওয়াটা একটা বড় সামাজিক কলঙ্ক। যে পরিবারের লোক ডাইনী হয়, সেই পরিবারের সঙ্গে জ্ঞাতসারে কেউ বিবাহ সম্বন্ধ স্থাপন করতে যায় না। সেইজন্য যারা ডাইনী হয়, তারা নির্দোষ প্রমাণিত হওয়ার জন্য সাধ্যমত চেষ্টা করে থাকে।

(অসমাপ্ত)

জয়হিন্দ

মাননীয় নিরঞ্জনবাবু,

চিঠিতে আমার নমস্কার জানবেন। আশাকরি কুশলে আছেন। এলাহাবাদ থেকে লেখা ১৯ জুলাইয়ের ও কলকাতা থেকে লেখা ২৬ আগষ্টের আপনার চিঠি পেয়েছি। কিন্তু নানা কারণে উত্তর দিতে দেরী হয়ে গেল। তার জন্য কিছু মনে করবেন না।

মহাদেবের অসুস্থতা নিয়ে আমিও খুব চিন্তায় পড়েছিলাম তার মত ছেলে সাধারণতঃ হয় না। সে সবসময় কাজ নিয়েই ব্যস্ত থাকে। আমার সমস্ত কাজের

পেছনেই মহাদেব রয়েছে। তাছাড়াও আমার শোক ও দুঃখ ভুলতে সে সবসময় আমাকে সাহায্য করে চলেছে। মহাদেব আমার শুধু অনুরাগীই নয়, সে আমার পরামর্শদাতাও। তাই সে আমার স্পন্দন হয়ে গেছে। বালেশ্বরকেও আমি স্নেহ করি। কিন্তু কোনও কারণে সে আগের মত যোগাযোগ আর রাখছে না। এর কারণটা রাজনৈতিক নয় তো? মহাদেবও সেই কথাই বলছিল। তার বেকারত্ব আমারও অস্বস্তির কারণ।

সাহেবগঞ্জে এণ্টনি মুর্মুর হত্যা সম্পর্কে পরিবর্তনে আপনার লেখা বেরিয়েছে জেনে খুশী হয়েছি। কিন্তু পত্রিকাটি হাতে না আসায় লেখাটা দেখার সুযোগ হয় নি। পারলে একটা পাঠিয়ে দেবেন। এই এলাকার প্রকাশযোগ্য কোন ঘটনা থাকলে অবশ্যই আপনাকে জানাব।

আমার নিরাপত্তার জন্য বর্তমানে কোন পুলিশী ব্যবস্থা নেই। অবশ্য নতুন করে আক্রমণের কোন ঘটনাও ঘটেনি। কিন্তু সব সময় আমাকে খুব সাবধানে চলাফেরা করতে হয়। কেন না জাগরণ সরেণের খুনের পরে আমাদের মানবাজার স্কুল সাব-ইন্সপেক্টরের অফিস থেকে লোক মারফৎ আমাকে খবর পাঠানো হয় যে আমাকে খুন করা হবেই। তারা নাকি আলোচনা করতে শুনেছিলেন। সেইজন্য বাইরে যেতে হলে সঙ্গে আমি তারমত লোক নিই এবং পারতপক্ষে সব সময় ভীড় এড়িয়ে চলি।

নায়ারবাবু Business Standard-এ ডাইনীপ্রথা বিরোধী আন্দোলনের প্রতিবেদন প্রকাশ করার জন্য Statesman পুরস্কার পাচ্ছেন—খুবই আনন্দের কথা। তাঁকে পুরস্কারটা দেওয়া হচ্ছে ১৫ই সেপ্টেম্বর। সেদিন তাঁর পাশে থাকবার জন্য তিনি মহাদেব, বালিশ্বর ও আমাকে চিঠি দিয়েছেন? সম্ভবতঃ ওরা যাবে। কিন্তু জীবনের ঝুঁকি নিয়ে আমার যাওয়াটা ঠিক হবে না। কারণ কলকাতাও আমার পক্ষে নিরাপদ নয়।

ধুরমাল বর্দ্ধমান মেডিক্যাল কলেজে ভর্তি হয়েছে। তাকে মেডিকেলে পড়াবার সংগতি আমার ছিল না, এখনও নেই সেজন্য প্রথমে তাকে নিষেধই করেছিলাম। কিন্তু জিদ ছাড়লই না। দেখা যাক শেষ অবধি কি হয়। আমার চাকরির মেয়াদ শেষ হয়ে আসছে। আমার মেয়ে জাস্তিমণির চাকরিও হল না। তার ক্ষতিপূরণ পাবার তো কোন কথাই নেই। ভাবনা-চিন্তা পত্রিকার সম্পাদক মাননীয় শ্যামাপ্রসাদ কুণ্ডুর সংগে ধুরমালের পরিচয় নেই। কিন্তু আপনার কথামত শ্যামাপ্রসাদবাবুই ধুরমালের কাছে একটা ছেলে পাঠিয়ে খোঁজখবর নিয়েছেন। বর্দ্ধমানে ধুরমালের মন টিকছে না; তাছাড়াও কিছু অসুবিধা রয়েছে। সে বাঁকুড়া কলেজে আসতে চাইছে। তারজন্য দরখাস্তও করেছে। আমার মনে হয়, আপনি সুপারিশ করলে তার আবেদন মঞ্জুর হওয়ার পথ সহজ হয়। এ বিষয়ে একটু মনে রাখবেন।

আমাদের ডাইনী প্রথা বিরোধী আন্দোলন হচ্ছে সিন্ধুর মধ্যে বিন্দু মাত্র।

তাছাড়াও আমাদের যেটুকু ক্ষমতা ছিল সেটাও কাজে লাগাতে পারছি না জীবনের ভয়ে। বলতে গেলে আত্মরক্ষার জন্য আমরা খানিকটা পিছু হঠে গেছি—একটু দম নিচ্ছি। এখন অবস্থা হচ্ছে, যে জলাশয়ে জোঁক থাকে তার জলটা নাড়লে যেমন চারধার থেকে জোঁকেরা চলে আসে, আমাদের অবস্থাও তেমনি—একটু মাথা তুলতে দেখছে তো চারধার থেকে শত্রুরা ছুটে আসছে।

ডাইনী প্রথা বিরোধী একটা পোস্টার বার করেই মনে হয় সরকার তাঁর কর্তব্য শেষ করে দিয়েছেন। কিন্তু ডাইনী প্রথা কোন দিনই আইনসিদ্ধ ছিল না এবং ডাইনীর নাম করে অত্যাচার করলে বিচারে সাজাও হয়ে এসেছে। কাজেই সরকার নতুন কিছুই করেন নি। সরকার পক্ষের ক্যাডাররা ডাইনী প্রথা বিরোধী পোস্টার নিজের হাতে বিলি করলে তারাই আবার ডাইনীপ্রথা কায়েম রাখতে বেশী সোচ্চার। কারণ তাতে রাজনৈতিক মুনাফা লুঠ করার অবাধ সুযোগ রয়েছে। গত কার্তিক মাসে বান্দোয়ান থানার কপাটভাঙ্গা গ্রামের একজন স্ত্রীলোককে ডাইনী করে তার উপর মলমূত্র খাওয়ান ইত্যাদি যে অমানুষিক অত্যাচার চালানো হয়, সেটা করেছিল সি. পি. এম. কর্মীরাই। কারণ গোটা গ্রামটাই হচ্ছে সি. পি. এম. অধ্যুষিত। প্রায় একমাস হতে চললো, আমাদের ব্লকের করকদম গ্রামের এক ব্যক্তিকে ডাইনী অপবাদ দিয়ে ৬০০০ টাকা জরিমানা করা হয়েছে। সে বেচারা বাড়ীর সমস্ত বিক্রী করে ৩০০০ টাকা আদায় দিয়েছে—বাকী টাকা দিতে পারে নি। তাই তার উপর অত্যাচার হয় শুরু। সে প্রাণভয়ে সপরিবারে গ্রাম ছাড়া হয়ে গেছে। এ ব্যাপারে রাজনৈতিক দলের লোকেরা নীরব আছে। আমাদের গ্রাম থেকে ২ কি: মিঃ দূরে গোপালপুর গ্রামের উপেন্দ্র সরেনকে দ্বিতীয়বারে (দেওয়ানীতে) ডাইনী করা হয়। তার কাছ থেকে ১৫৬০ টাকা জরিমানা আদায় করা হয়েছে। সে আপীল করলে হুগলী জেলার হরিদাস কিস্কু নামক এক সখা তাকে নির্দোষ বলে লিখিতভাবে রায় দিয়েছে। তা সত্ত্বেও গ্রামবাসীরা তাকে জরিমানার টাকা ফেরৎ দেয় নি। এ ব্যাপারে তার ৪০০০ টাকা খরচ হয়ে গেছে। সে একটা প্যাম্পলেট ছাপতে দিয়েছে; সে আমাদের সঙ্গে যোগাযোগ রেখে চলেছে। কয়েক হাজার সাঁওতালদের মধ্যে সংঘটিত আমি কয়েকটি সাম্প্রতিককালের ঘটনার কথা জানালাম—সব নয়। সব ঘটনার কথা আমার জানাও নেই। তাহলেই অনুমান করতে পারা যায় দেশে পঞ্চাশ লক্ষ সাঁওতালদের মধ্যে কি চলছে।

চিঠি দেবেন। আজ এই পর্য্যন্তই।

To
Sri Niranjan Halder
79 R. K. Ghosal Road
Calcutta-42

মাননীয়েষু,

পত্রে আমার নমস্কার জানবেন। আপনার ২১/৯/৮৫ তারিখের চিঠিখানা পেয়েও নানা কারণে যথাসময়ে তার উত্তর দিতে পারিনি।

এ্যাণ্টনি মুর্মুর উপর লেখাটা আজ অবধি আমার কাছে এসে পৌঁছায়নি। মহাদেবের কাছে থাকলে দেরীতে হলেও লেখাটা পাব—এই ভরসা।

বরকদম গ্রামে ডাইনীর ব্যাপার নিয়ে খোঁজখবর নেওয়ার কাজ আরম্ভ করে দিয়েছিলাম। খানিকটা যোগাযোগও হয়েছিল। এই সূত্রেই গত ৮/১০/৮৫ তারিখে বরদহির সুধীর টুডু ও মিলন টুডু লক্ষ্মীন্দ্রবাবুকে বরকদম গ্রামে নিয়ে গিয়েছিল। শুনলাম, সাক্ষাৎকার ভাল হয়েছে। লক্ষ্মীন্দ্রবাবুর মুখে সবই শুনতে পাবেন। বরকদম একটি বড়সর গ্রাম। ১৯৭১ সালের আদমসুমারী অনুসারে গ্রামের লোকসংখ্যা ৭৪৮ জন, তার মধ্যে ৫৩১ জনই হচ্ছে আদিবাসী। গ্রামে প্রধানতঃ দুটো রাজনৈতিক দল আছে ; একটি পদ্ম এবং অপরটি মুক্তিমোর্চার দখলে। গত আগষ্ট মাসের ঘটনা। দেওয়ানিতে (অর্থাৎ ২য় বারে) ডাইনী সাব্যস্ত হয় মুক্তি মোর্চার পাড়ার লালমোহন মাণ্ডি। গ্রামের লোক তাকে জরিমানা করে ৬,০০০ টাকা। সে অনেক কষ্টে টাকা যোগ করে তিন হাজার আদায় দেয়। বাকি টাকা আদায়ের জন্য গ্রামের লোক তার উপর অত্যাচার শুরু করে। সে সপরিবারে বাড়ী ছেড়ে পালিয়ে যায় এবং সি. পি. এম. পাড়ায় আশ্রয় নেয়। বর্তমানেও সে তাদের পাড়াতেই আশ্রয় নিয়ে আছে। লালমোহন থানায় ডাইরি করেছে। তাই শান্তিরক্ষার জন্য জামতোড়িয়া ফাঁড়ির মেজবাবু ২ দিন বরকদমে ছিলেন। কিন্তু তিনিও এমন অবস্থার সৃষ্টি করতে পারেন নি যাতে লালমোহন নিজের বাড়ীতে ফিরে যেতে পারে।

বর্তমান এম. এল. এ. হচ্ছেন সি. পি. এম.-এর সুধাংশু মাঝি। যেহেতু লালমোহন গ্রামের সি. পি. এম.-দের আশ্রয় নিয়ে আছে, সেই কারণেই সুধাংশু মাঝি লালমোহনের পক্ষ সমর্থন করে তার উপকার করতে আগ্রহী হয়েছেন। তাই তিনি মানবাজার ২নং লোক্যাল কমিটির বয়োস্থিত অফিস থেকে হুকুম জারি করলেন তাঁর কাছে দু দলকেই যাবার জন্যে। সি. পি. এম. দলটি তাঁর আদেশ মান্য করেছিল ; কিন্তু মুক্তি মোর্চার লোকেরা তাঁর কথায় আদৌ কান দেয় নি। এই টুকুর মধ্যেই সুধাংশু মাঝির কাজও শেষ হয়ে গেল। এদিকে মুক্তি মোর্চার নেতা কালিপদ বাস্কেও শক্ত হয়ে দাঁড়িয়ে আছে যাতে সুধাংশু মাঝি তাঁর সমর্থকদের কাবু করতে না পারে।

এদিকে লালমোহন ও তাঁর স্ত্রী অকস্মাৎ পথের ভিখারী হয়ে পড়ায় এবং দুর্ভাবনায় দিন দিন কাহিল হয়ে পড়ছে। শুনলাম লালমোহনের কেসটি নাকি মানবাজার থানার বড়বাবুর হাতে রয়েছে। মনে হয় তিনি এম. এল. এ. সাহেবের বিনা নির্দেশে

কিছু করতে পারছেন না। এখন এম. এল. এ. সাহেবের উভয় সঙ্কট। লালমোহন চুলোয় যাক, সেটা বড় কথা নয়, জন সমর্থন যেন আদৌ হারাতে না হয়—সেটাই মূল লক্ষ্য। কারণ, ডাইনীর বিচারটা শুধু বরকদমের লোকই করেনি—পাশাপাশি গ্রামের অনেক লোকই ছিল যারা সি. পি. এমেরও সমর্থক। লালমোহনের ভাগ্যে কি আছে—এখনই কিছু বলা যাবে না।

ঝোরবাদের সেই লিলু সখাই লালমোহনকে ডাইনী সাব্যাস্ত করেছে। সে ভয়ানক চতুর লোক। কানাকানি শুনতে পাওয়া যাচ্ছে। সে নাকি এম. এল. এ-র সংগে কি একটা গোপন চুক্তি করেছে।

সাংবাদিকতায় জন্য নায়ারবাবু পুরস্কৃত হয়েছেন বলে জামতোড়িয়াতে তাঁকে সম্বর্দ্ধনা জানাবার ব্যাবস্থা হচ্ছে। এর মধ্যে অনেক জল ঘোলা হয়ে গেছে। কাজেই জামতোড়িয়াতে অনুষ্ঠান কেমন হবে—এখনি নিশ্চয় করে বলা যাচ্ছে না। কায়রা কিংবা শিরিষগড়াতে অনুষ্ঠান করলে ভাল হোত। তাতে কিন্তু মহাদেবের উপর কাজের চাপটা বেশী পড়ত। সেটা কাম্য নয়।

ধুরমালের বদলী নিয়ে আর কোন চেষ্টা করবেন না। কারণ ফল হবে না। নিয়ম হচ্ছে আদিবাসীদের সাথে আদিবাসীদেরই বদলী হতে পারে, অন্যদের সাথে নয়। বাঁকুড়া থেকে বর্দ্ধমান যাবার জন্য কোন আদিবাসী ছেলে দরখাস্ত করেনি।

অধিক লিখা নিষ্প্রয়োজন। ইতি—

To

Sri Niranjan Halder

79, R. K. Chatterjee Rd.

Cal-42.

মাননীয়েষু,

পত্রে আমার নমস্কার জানবেন। শুনলাম আপনি অসুস্থ হয়ে পড়েছেন। আপনার অসুস্থতার খবর আমাদের কাছে অবশ্যই চিন্তার বিষয়। এমতাবস্থায় ভগবানের কাছে প্রার্থনা জানাই, আপনি শীগগির সুস্থ হয়ে উঠুন।

জানি, ডাইনী সম্পর্কে কিছু তথ্য জানবার মত আপনার শারীরিক ও মানসিক অবস্থা নেই। তবু জেনে-শুনেই আপনাকে কয়েকটা তথ্য পরিবেশন করছি।

আমাদের মানবাজার থানার বরকদম গ্রামের যে হতভাগ্য ব্যক্তি ডাইনী সাব্যস্ত হয়ে গ্রামবাসীদের ধার্যকৃত ৬০০০ টাকার মধ্যে ৩০০০ টাকা আদায় দিবার পরেও বাস্তু ছাড়া হতে হয়েছে, তার নাম হচ্ছে লালমোহন মাণ্ডি। তাকে তাদের নাগালের বাইরে পালিয়ে যেতে সাহায্য করার অভিযোগে গ্রামবাসীরা তার এক আত্মীয় দীনু টুডুর কাছ থেকে ৫০০ টাকা জরিমানা, ১ মন চাল ও একটি খাসি জরিমানা আদায় করে। এই তথ্যটি আমি দীনুর কাছ থেকেই পেয়েছি। লালমোহনের সংগে আমি দেখা করতে আগ্রহী। কিন্তু তার আশ্রয়দাতা সি. পি. এম.-এর লোকেরা তাকে আমার সংগে দেখা করতে দিচ্ছে না, করলে একটা প্যামপলেট ছেপে বার করতে পারা যেতো। গোপালপুর গ্রামের উপেন্দ্রনাথ সরেনের প্যামপ্লেটটি প্রকাশ করার জন্য বুদ্ধিজীবী মহলে একটা আলোড়নের সৃষ্টি হয়েছে।

ইতিমধ্যে ডাইনী সংক্রান্ত কয়েকটি বড় বড় ঘটনার খবর আমার কাছে এসে পৌঁচেছে। লোকসেবক সংঘের প্রাক্তন এম. এল. এ. গোবর্দ্ধন মাঝির কাছ থেকে জানতে পারলাম—অক্টোবর '৮৫ মাসের শেষ সপ্তাহে পুরুলিয়া জেলার ও বরাবাজার থানার আসগাড়া গ্রাম নবাসী রসিক হেম্ব্রমের মা ডাইনী সাব্যস্ত হন। রসিক হেমব্রম গ্রামবাসীদের ধার্যকৃত ১৫০০ টাকা জরিমানা আদায় দেন; কিন্তু সেই দিনই রোগীটি মারা যায়। রোগীটি ছিল ৯/১০ বৎসর বয়স্ক একটি বালক এবং সে কয়েক মাস যাবৎ রোগে ভুগতেছিলো। গ্রামবাসীরা ক্রোধান্ধ হয়ে রসিক হেমব্রমের মা ও বাবাকে বাড়ী থেকে টেনে বার করবার জন্য কপাট কাটিতে থাকে। উদ্দেশ্য মৃত ব্যক্তির সৎকারের আগেই তাদের খুন করা। কিন্তু আসাগাড়া গ্রামটি বরবাজার থানা থেকে মাত্র ২ কিলোমিটার দূরে। খবর পেয়ে পুলিশ রসিক হেমব্রমের মা ও বাবাকে অক্ষত অবস্থায় উদ্ধার করেন। উল্লেখ্য রসিক হেমব্রম হচ্ছেন কংগ্রেসের সমর্থক এবং অপর দিকে অধিকাংশ গ্রামবাসী হচ্ছে সি. পি. এম. দলের সমর্থক।

অপর ঘটনাটি পুরুলিয়া জেলারই বলরামপুর থানার কাঁশবহাল গ্রামের, ঘটেছে সেপ্টেম্বর ('৮৫) মাসে। কাঁশবহাল গ্রামের অধিবাসীরা গ্রামের এক স্ত্রীলোককে ডাইনী সাব্যস্ত করে। তারপর তারা তাকে খুন করে জলাধারে পাথর চাপা দিয়ে রেখেছিলো। কিন্তু ঘটনাটা আর গোপন রইল না। এই খুনের ঘটনায় পুলিশ কয়েকজনকে গ্রেপ্তার করেছেন।

বাঁকুড়া জেলার সাঁওতালদের মধ্যে ডাইনী বিশ্বাস অত বেশী প্রকট না হলেও মাঝে মাঝে দু-একটা এমন ঘটনা ঘটে থাকে যা অনেককেই হতবাক করে দেয়। তেমনি একটা মর্মান্তিক ঘটনা ঘটেছে রাইপুর থানার ডেলটিকরি গ্রামে অক্টোবরের ('৮৫) প্রথম সপ্তাহে। বিবরণে প্রকাশ, ঐ গ্রামের ফকির নামক এক সাঁওতাল ছিলেন শিক্ষিত, গণ্যমান্য ও অবস্থাপন্ন লোক। তাঁকে কিছুদিন আগেই ডাইনী করা হয়েছিল। তিনি গ্রামবাসীদের দ্বারা নির্মম ভাবে খুন হয়েছেন পুকুর যাবার রাস্তায়।

এই খুনের বিষয়ে কাউকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে কিনা—জানা যায় নি। নিহত ফকির নাকি কংগ্রেসের একজন নেতা ছিলেন।

বর্তমানে নতুন করে আক্রমণের কোন ঘটনা ধরা না পড়লেও আমাকে সাবধানেই থাকতে হচ্ছে। আমরা সকলেই ভাল আছি।

আর বেশী লিখলাম না। আপনার আরোগ্য লাভের আশায় রইলাম। ইতি

আপনাদের

সারদাপ্রসাদ কিস্কু

To

Niranjan Halder

79, R. K. Ghosal Road

Cal-700042

To

The Secretary,

West Bengal Scheduled Castes and Tribes Council

136/1, D. H. Road, Calcutta-63.

মহাশয়,

অকস্মাৎ বৃষ্টি নামায় অবহেলিত ও যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন আমাদের এই আদিবাসী এলাকায় ডাক চলাচল বন্ধ ছিল বলে আপনাদের চিঠিখানি পেতে দেরী হল। আমার ইচ্ছা ছিল, আমিই জাগরণ সরেনের নিহত হবার খবর আপনাদের জানিয়ে দিই। কিন্তু ঐ ব্যাপারেই বিভিন্ন দিকে আমি ব্যাপৃত থাকায় তা আর সম্ভবপর হয়নি। দুঃখের বিষয়, যথাসময়ে সাংবাদিকদের জানিয়েও কোন সাড়া পাওয়া যায় নি।

জাগরণ সরেনের মৃত্যু আমার কাছে একটা ব্যক্তিগত ও অপূরণীয় ক্ষতি। তিনি ছিলেন আমার অকৃত্রিম বন্ধু, বিশ্বস্ত সহকর্মী ও হিতাকাঙ্ক্ষী। তাঁর মৃত্যুতে আমি গভীরভাবে মর্মাহত।

জাগরণ সরেন পশ্চিমবঙ্গ তপশীলী জাতি ও আদিবাসী পরিষদের পুরুলিয়া জেলা কমিটির সাধারণ সম্পাদকমাত্র ছিলেন না, তিনি ছিলেন পুরুলিয়া জেলা সুসার গাঁওতার সভাপতি, বসন্তপুর জুনিয়ার হাই স্কুলের প্রতিষ্ঠাতা ও সেক্রেটারী, মানবাজার ২নং ব্লক কংগ্রেস (ই) কমিটির সেক্রেটারী ও প্রাথমিক বিদ্যালয়ের একজন আদর্শ শিক্ষক। তিনি ছিলেন সুপুরুষ, প্রাণ প্রাচুর্যে ভরপুর। কর্মচঞ্চল, মিষ্টভাষী ও অতিথিবৎসল। তিনি পঞ্চায়েত প্রধান কিংবা ঐ জাতীয় কোন পদে কোন দিনই

ছিলেন না। তথাপি গ্রামোন্নয়নের ক্ষেত্রে তিনি যে স্বাক্ষর রেখে গেলেন, তা সকলেরই বিস্ময় উৎপাদন করবে।

২০শে মে '৮৪ রবিবার। স্কুল নেই। জাগরণ সরেন কোন কাজে পাঁড়রা (ছোট) গেছিলেন এক আত্মীয়ের বাড়ী। তাঁর গ্রাম বসন্তপুর থেকে পাঁড়রা গ্রামখানি সোজা রাস্তায় ২½ কিলো মিটারের পথ। কিন্তু ঘুরপথে সাইকেলের রাস্তায় শুশুনিয়া গ্রাম হয়ে প্রায় চার কিলোমিটার হবে। শুশুনিয়া গ্রামের শতকরা পঁচানব্বই জনই সি. পি এম পার্টির লোক। এই গ্রামে সি. পি. এম. এর পঞ্চায়েত প্রধান পতিত মাহাত ও পঞ্চায়েত সমিতির সদস্য পরমেশ্বর মুর্মুর বাড়ী তো আছেই, গ্রাম পঞ্চায়েত কার্য্যালয় ও ল্যাম্প সমিতি যা সি. পি এম.-এর করতলগত, তার কার্য্যালয়ও রয়েছে। এই গ্রামে কারণে-অকারণে সি. পি. এম.-এর এম. এল. এ. সুধাংশু মাঝি প্রায়শঃ রাত্রি যাপন করেন। আমাদের জাগরণ সরেনকে এই শুশুনিয়া গ্রাম হয়েই পাঁড়রা যেতে হয়েছিল।

সকাল ৯ টার মধ্যে কাজ সেরে জাগরণ সরেন একাকী সাইকেলে চড়ে বাড়ী ফিরছিলেন। পাঁড়রা গ্রামের অপর একটা পাড়া (বড় পাঁড়রা) ডাইনে ফেলে যেই এগিয়েছেন, আততায়ীরা তীর ছুঁড়তে আরম্ভ করল তাঁকে লক্ষ্য করে। তীরের আঘাত পেয়ে তিনি দৌড়ে প্রাণরক্ষা পাবার শেষ চেষ্টা করেছিলেন। কিন্তু পর পর কয়েকটা তীরের আঘাত পেয়ে তিনি মাটিতে পড়ে গেলেন আততায়ীরাও সংগে সংগে তাঁকে কুপিয়ে নির্মমভাবে হত্যা করল। এই হত্যাকাণ্ডটা সুপরিকল্পিত ছিল, তাতে সন্দেহের কোন অবকাশ নেই।

জাগরণ সরেনের নিহত হবার খবর প্রত্যক্ষদর্শী ও বিভিন্ন পথচারীদের দ্বারা মুখে মুখে দিকে দিকে প্রচারিত হবার পরেও পঞ্চায়েত প্রধান ও পঞ্চায়েত সমিতির সদস্য মাত্র এক কিলোমিটার দূরত্বের মধ্যে থেকেও ঘটনাস্থলে যাননি বা থানায় সংবাদ দেন নি। অবাক হতে হয়, পুলিশ আসার আগে পর্য্যন্ত পাঁড়রা গ্রামের কোন লোক মৃতদেহ পড়ে থাকার কথা লোকের কাছে কিংবা পুলিশের কাছে স্বীকার করেনি।

অপর দিকে সি. পি. এম.-মহলে দারুণ তৎপরতা দেখা যায়। সংগে সংগে খবরটা নিজেদের পার্টির মধ্যে বিভিন্ন দিকে প্রচার করা হয়। এম. এল. এ. সুধাংশু মাঝি ঘটনাস্থল দেখার প্রয়োজনীয়তা অনুভব না করেই সেখান থেকে ১½ কিলোমিটার দূর দিয়ে বিদ্যুৎগতিতে চলে গেলেন মানবাজার। এ সম্পর্কে তিনি একটা বিবৃতি দিলেন প্রেসে ছাপাতে। চোরের মায়ের বড় গলা।

এই পরিস্থিতিতে এলাকার বিক্ষুব্ধ জনসাধারণ পুলিশের কাছে গোয়েন্দা কুকুর আনার জন্য দাবী করলে পরদিন কুকুর আনা হয়। কুকুর তিন জন অপরাধীকে সনাক্ত করে। তারা সকলেই লাল ঝাণ্ডার পতাকাবাহী। তার পরেও যে সমস্ত

দুষ্কৃতকারীদের নাম জানা গেছে, তারা সকলেই সি. পি. এম. পার্টির লোক পুলিশ এ পর্য্যন্ত মাত্র তিন জনকে গ্রেপ্তার করেছে। এ ব্যাপারে পুলিশ বিশেষ তৎপর হয়। প্রকাশ্য দিবালোকে লোকালয় থেকে একশত গজের মধ্যে এই নৃশংস হত্যাকাণ্ড সংঘটিত হওয়ার ফলে এলাকার লোক দারুণ ভীত ও সন্ত্রস্ত। এমন কি, প্রত্যক্ষদর্শীরাও ভয়ে সাক্ষ্য দিতে সাহসী হচ্ছে না।

অতঃপর বিজয়োল্লাসে সি. পি. এম. পার্টির লোকেরা প্রচার করে বেড়াচ্ছে যে,— 'অচিরে শীতল হেম্ব্রম, সারদা কিস্কু, মহাদেব হাঁসদা, বালিশ্বর সরেন, মহেশ্বর বেশরার মাথা চাই।' তারা কাজও আরম্ভ করে দিয়েছে। গত ৩০মে তারিখে ছুরিকাঘাতে প্রাণনাশের জন্য দুজন আততায়ী মহেশ্বর বেশরাকে আক্রমণ করেছিল।

সেইজন্য আমরা যার পর নাই ভীত, সন্ত্রস্ত ও আতঙ্কগ্রস্ত এবং আমরা অসহায় ও সংকটাপন্ন। এক্ষণে আমাদের স্বাভাবিক জীবনযাত্রা বলতে কিছু নেই। এই কারণেই আমি পরিষদের জরুরী অধিবেশনে যোগদান করতে পারছি না।

সি. পি. এম. পার্টির লোকেদের কার্যাকলাপ দেখে বুঝতে অসুবিধা হচ্ছে না যে, তারা আদিবাসী বুদ্ধিজীবীদের অবিলম্বে নিশ্চিহ্ন করবে—কাজ শুরু করে দিয়েছে।

এ ব্যাপারে আপনার দৃষ্টি আকর্ষণ করছি এবং সক্রিয় ও আন্তরিক সহযোগিতা কামনা করছি।

ইতি—
ভবদীয়
সারদাপ্রসাদ কিস্কু
৮/৬/৮৪

দাঁড়িকাডোবা
১২/৬/৮৪

মাননীয় সম্পাদক 'ডুলুং' পত্রিকা
বিশ্বকর্মা ক্লাব, শিলদা, মেদিনীপুর।

মহাশয়,

পত্রে আমার নমস্কার জানবেন। পরে লিখি, যে সময় অপরের কুপরামর্শে, অপরের চক্রান্তে আদিবাসী সমাজ ভেঙে খণ্ড খণ্ড হয়ে যাচ্ছে, যে সময় মানবিকতা ও ভ্রাতৃত্ব বিসর্জন দিয়ে ভাই ভাইয়ের বুকে নির্ব্বিচারে ছোরা বসিয়ে দিচ্ছে, যে সময় বিষবাষ্পে পশ্চিমবঙ্গের আকাশ বাতাস কলুষিত, যে সময় আদিবাসী নেতারা প্রাণের ভয়ে যারপরনাই ভীত ও সন্ত্রস্ত, ঠিক সেই সময় আদিবাসী সংহতির ঋষি, নবযুগের প্রবর্ত্তক দার্শনিক ও সাঁওতালী ভাষার মহাকবি সাধু রামচাঁদ মুর্মু'র নাম স্মরণ করিয়ে দিলেন। আহা! কি মধুময় সে নাম।

তাঁর নামে কিছুক্ষণের জন্যও শান্তি পেলাম, অপার আনন্দ অনুভব করলাম।

আমি কথাগুলি লিখলাম আবেগে নয়, এটাই যথার্থ সত্য।

জাগরণ সরেন— নামটা আপনাদের কাছে পরিচিত নাও হতে পারে ; কিন্তু পুরুলিয়া জেলার অনেকের কাছেই নামটা সুপরিচিত। তিনি প্রাথমিক স্কুলের একজন শিক্ষকমাত্র ছিলেন না ; তিনি ছিলেন পুরুলিয়া জেলা সুসার গাঁওতার সভাপতি, বসন্তপুর জুনিয়ার হাই স্কুলের প্রতিষ্ঠাতা ও সেক্রেটারী, পশ্চিমবঙ্গ তপশীলী জাতি ও আদিবাসী পরিষদের পুরুলিয়া জেলা কমিটির সেক্রেটারী এবং মানবাজার ২নং কংগ্রেস (ই) কমিটির সেক্রেটারী, তিনি ছিলেন সুপুরুষ, প্রাণ প্রাচুর্য্যে ভরপুর, কর্মচঞ্চল, মিষ্টভাষী ও অতিথিবৎসল। তিনি পঞ্চায়েত প্রধান কিংবা তজ্জাতীয় কোন পদে কোন দিনই আসীন ছিলেন না। তথাপি গ্রামোন্নয়নের ক্ষেত্রে তিনি যে স্বাক্ষর রেখে গেছেন তা সকলেরই বিস্ময় উৎপাদন করে।

২০ মে রবিবার স্কুল নেই। জাগরণ সরেন গেছিলেন তাঁর গ্রাম বসন্তপুর থেকে ২½ কিলোমিটার দূরে পাঁড়রা গ্রামে এক আত্মীয়ের বাড়ীতে। সকাল ৯ টার মধ্যে কাজ সেরে তিনি একাকী সেখান থেকে সাইকেলে বাড়ী ফিরছিলেন। সামনে পাঁড়রা গ্রামেরই আর একটা পাড়া। (আক্রমণকারীরা) হত্যাকারীরা ওঁৎ পেতে ছিল তীর-ধনুক, টাঙ্গি-বল্লম নিয়ে। সকলেই পরিচিত। পরিচিত হবে না কেন ? জাগরণ সরেনের বাড়ী থেকে সকলের বাড়ীই দু কিলোমিটারের মধ্যে। কাছে আসতেই তারা প্রকাশ্য দিবালোকে তীর ছুঁড়ে ও কুপিয়ে নির্মমভাবে তাঁকে খুন করল।

এই হত্যাকাণ্ডের সঙ্গে জড়িত আজ অবধি যতগুলি অপরাধীদের নাম জানা গেছে, তাতে এটাকে নিঃসন্দেহে রাজনৈতিক হত্যাকাণ্ড বলা চলে।

পরবর্ত্তী পর্য্যায়ে পৃথিবী থেকে যাদের অচিরে সরান হবে, তন্মধ্যে নাকি আমার ও মহাদেব হাঁসদা এর নামও রয়েছে। জাগরণ সরেন নিহত হবার আগেই ২৫ এপ্রিল তারিখে শত্রুরা আমার রাস্তায় ওঁৎ পেতে ছিল ; দৈবক্রমে রক্ষা পেয়ে যাই। গোপনসূত্রে প্রকাশ, এক্ষণে আমাকে খুন করার জন্য দারুণ তৎপরতা চলছে।

আমাদের প্রধান দোষ হচ্ছে, প্রথমতঃ আমাদের হাতে যেসব পত্রিকা রয়েছে। আমরা এই পত্রিকায় কোন সরকারের তোয়াক্কা না করে স্বাধীন মতামত প্রকাশ করে থাকি। দ্বিতীয়তঃ, আমাদের উদ্যোগে সাঁওতালী সাহিত্য পরিষদ পুরুলিয়া গঠিত হয়েছে যার সভাপতি হচ্ছি আমি এবং সম্পাদক হচ্ছেন মহাদেব হাঁসদা।

যাদের মাথার উপর মৃত্যুদণ্ডের পরোয়ানা ঝুলছে, বলাবাহুল্য, তাদের স্বাভাবিক জীবনযাত্রা বলতে কিছু নেই—সব সময় ভীত ও সন্ত্রস্ত হয়ে জীবন যাপন করতে হচ্ছে। সাবধানতা অবলম্বন যে করা হচ্ছে না, তা নয় ; কিন্তু হাজার হাজার শত্রুর চোখে ধুলো দিয়ে পৃথিবীতে বেঁচে থাকার অধিকার পাওয়া যাবে কি ?

যাঁরা কারও সাহিত্যকীর্ত্তিকে অবহেলা করেন, উপেক্ষা করেন, নিন্দা করেন, তাঁরা সাহিত্য সম্পর্কেই কিছু বুঝেন বলে মনে হয় না। এতে সাহিত্যিকের ক্ষতি হয় না, ক্ষতি হয় সাহিত্যের। আমার মতে সব সাহিত্যিকের সাহিত্যকীর্ত্তিই শ্রদ্ধার সংগে গ্রহণ করা উচিত। আমাদের সাধু রামচাঁদ মুর্মুর কথা স্বতন্ত্র। তিনি তাঁর মৃত্যুর দীর্ঘদিন পরেও কবি হিসাবে অদ্বিতীয়ই থেকে গেছেন।

আমি সাধু রামচাঁদ মুর্মুকে গুরুদেব হিসাবে বরণ করে সাহিত্যের আসরে অবতীর্ণ হয়েছি। সেইজন্য তাঁর সম্পর্কে কিছু লেখা আমার পবিত্র কর্ত্তব্য। কিন্তু এই উদ্বেগ-জনক পরিস্থিতিতে লেখা যায় কি করে?

সারদাপ্রসাদ কিস্কু
১২/৬/৮৪

To
The Secretary
People's Union for Civil Liberties, West Bengal Branch
11 Nasiruddin Road, Calcutta-700017

মহাশয়,

আপনার ২রা জুলাই তারিখের পত্রটি পেলাম। পিপল্‌স ইউনিয়ন ফর সিভিল লিবার্টিজ, পশ্চিমবঙ্গ শাখার অন্যতম সহ সভাপতি শ্রীনরেশচন্দ্র গাঙ্গুলীর অকাল মৃত্যুর সংবাদ পেয়ে মর্ম্মাহত হলাম। আমি প্রয়াত গাঙ্গুলী মহাশয়ের আত্মার শান্তি কামনা করছি এবং তাঁর শোকাহত পরিবারবর্গের প্রতি আন্তরিক সমবেদনা জ্ঞাপন করছি।

আপনারা শ্রীগাঙ্গুলীর স্মৃতির প্রতি শ্রদ্ধা জানাবার উদ্দেশ্যে শোকসভার আয়োজন করছেন জেনে আনন্দিত হলাম। কিন্তু দুঃখের সংগে জানাচ্ছি, আমি এবং আমার বন্ধু-বান্ধবদের মধ্যে কয়েকজন শোকসভায় যোগদান করতে পারছি না। কারণ, বর্ত্তমানে আমরা এক সঙ্কটজনক অবস্থার মধ্যে কালযাপন করছি।

গত ২০ মে ('৮৪) আমাদের মানবাজার থানার পাঁড়রা গ্রামে লোকালয় থেকে একশ গজের মধ্যে প্রকাশ্য দিবালোকে পুরুলিয়া জেলার সুসার গাঁওতার সভাপতি, বসন্তপুর জুনিয়ার হাই স্কুলের প্রতিষ্ঠাতা ও সেক্রেটারী, পশ্চিমবঙ্গ তপশীলী ও আদিবাসী পরিষদের পুরুলিয়া জেলা কমিটির সেক্রেটারী, স্থানীয় ব্লক কংগ্রেস (ই) কমিটির সেক্রেটারী, শিক্ষক ও সমাজসেবী জাগরণ সরেন সুপরিকল্পিতভাবে খুন হবার পর যাঁদের অচিরে পৃথিবী থেকে সরান হবে বলে শুনতে পাওয়া যাচ্ছে, তাঁদের মধ্যে 'তেতরে' পত্রিকার সম্পাদক মহাদেব হাঁসদা, কংগ্রেসের প্রাক্তন এম. এল. এ. শীতল

হেমব্রম, জিরিহিরি পত্রিকার সম্পাদক বালিশ্বর সরেন, জামতেড়িয়া থেরওয়াল গাঁওতার সম্পাদক মহেশ্বর বেশরা এবং আমার নাম রয়েছে। আমাকে খুন করার জন্য এপ্রিল মাসের ২৫ তারিখে এবং জুন মাসের ২৮ তারিখে আততায়ীরা আমার রাস্তায় ওঁৎ পেতে ছিল। দু দিনই আমি দৈবক্রমে প্রাণে বেঁচে যাই। ওদিকে ছুরিকাঘাতে প্রাণনাশের জন্য ৩০ মে তারিখে মহেশ্বর বেশরাকে ২ জন আততায়ী আক্রমণ করেছিল। তারা অবশ্য হাতেনাতে ধরা পড়ে গেছে।

তাই এলাকায় দারুণ চাঞ্চল্য, ভীতি ও সন্ত্রাসের সৃষ্টি হয়েছে এবং আমাদের জীবন-সংশয় দেখা দিয়েছে। এমতাবস্থায় আমাদের স্বাভাবিক জীবনযাত্রা বলতে কিছু নেই।

আমরা অনিবার্য্যকারণ বশতঃ শোকসভায় যোগদান করতে পারছি না, তার জন্যে শুধু ক্ষমাপ্রার্থীই নই; যাতে এই সংকটজনক পরিস্থিতিতে আমরা প্রাণরক্ষা পেতে পারি, তার জন্য আপনাদের আন্তরিক সহযোগিতা ও সাহায্য প্রার্থনা করছি।

ইতি—

১০/৭/৮৪

ভবদীয়

শ্রীসারদাপ্রসাদ কিস্কু

সাং দাঁড়িকাডোবা

পোঃ জোরোবাড়ী

জেলা পুরুলিয়া

দাঁড়িকাডোবা

৫/৮/৮৪

মাননীয় শ্রীযুক্ত সুনীতি চট্টরাজ এম. এল. এ.

সিউড়ী।

মহাশয়,

পত্রে আমার নমস্কার জানবেন। আমি আপনার কাছে সম্পূর্ণ অপরিচিত ব্যক্তি। আমার ব্যক্তিগত পরিচয় এই যে, আমি গত ১৯৬২ সালের সাধারণ নির্বাচনে বান্দোয়ান বিধানসভা নির্বাচন ক্ষেত্রে কংগ্রেস-প্রার্থী ছিলাম। আমি অকপটে স্বীকার করছি যে, ১৯৭৭ সালে কোন বিশেষ কারণে আমি জনতা পার্টির প্রার্থীকে সমর্থন করি। এই সময়টা বাদ দিলে আমি বরাবরই কংগ্রেসের সমর্থক আছি। এবং বামফ্রন্টের বিরুদ্ধে রয়েছি। এ ছাড়া আপনার কাছে আমার উল্লেখযোগ্য কোন পরিচয় নেই।

সম্ভবতঃ আপনার দৃষ্টি আকৃষ্ট হয়ে থাকবে যে. পুরুলিয়া জেলার ও মানবাজার থানার অন্তর্গত সাঁওতাল আদিবাসী অধ্যুষিত বড়দহি গ্রামের এক ডাইনী চক্রান্ত প্রতিবেদন ২১।৪।৮৪ তারিখেও 'আনন্দবাজার পত্রিকায়' 'সুদূর সাঁওতাল পল্লীতে সাংস্কৃতিক বিপ্লবের ঢেউ'—এই শিরোনামে, ২৪, ২৫, ও ২৬ মে (১৯৮৪) তারিখের 'আজকাল' পত্রিকায় যথাক্রমে সাঁওতাল সমাজে ডাইনী সংস্কার—১।২।৩ এই শিরোনমে এবং ৩১শে মে '৮৪ তারিখের দৈনিক 'পশ্চিমবঙ্গ সংবাদ' পত্রিকায় 'অন্ধকারময় ডাইনী প্রথা এ যুগেও সমান সক্রিয়' এই শিরোনামে প্রকাশিত হয়েছে। তা ছাড়াও ১১ মে ১৯৮৪ তারিখের 'যুগান্তর' পত্রিকায় আমার বাদ দিয়েও চারজন বিশিষ্ট আদিবাসীদের স্বাক্ষর সম্বলিত একটি আবেদন 'ডাইনী শিকার আজও অবাধে চলছে' এই শিরোনামে প্রকাশিত হয়েছে। এতটা হবার পরেও ডাইনী প্রথা সম্পর্কে সরকার ও জনমানসে কি প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি হয়েছে—জানি না ; কিন্তু কুফল যা ফলবার অপ্রতিহত গতিতে ফলে চলেছে।

বড়দহি গ্রামে ডাইনীর ব্যাপার শুরু হবার পর থেকেই সি. পি. এম. পার্টি ডাইনী প্রথার সমর্থকদের পক্ষ সমর্থন করে আসছে। গত ১৬।৩।৮৪ তারিখে বড়দহি গ্রামে ডাইনীর বিচার সভায় কংগ্রেসের প্রাক্তন এম. এল. এ. শীতল হেম্ব্রমকে টেনে হিঁচড়ে ও বড়দহি গ্রামনিবাসী চক্রধর টুডুকে প্রহার করার পশ্চাতে সি. পি. এম. এর প্রাক্তন প্রধান রামদাস বাস্কে ও অপর কয়েকজন সি. পি. এম. কর্মীর পুরো হাত ছিল। সেই-দিনই আমাকে আমার স্কুলের উপস্থিতি নিয়ামক সমিতির সভাপতির বাড়ীতে ডাইনীর বিচারকদের হাতে লাঞ্ছনা ভোগ করতে হয়, তার সংগেও সি. পি. এম. রা রোগী লড়িরাম টুডু ও রয়না গ্রামের সখা সূর্য্য বেশরা পুলিশের হাতে গ্রেপ্তার হলে তাদের মুক্তির দাবীতে কয়েকজন সি. পি. এম. নেতা কিছু সংখ্যক ডাইনী প্রথা সমর্থক লোকেদের নিয়ে ১৭।৩।৮৪ তারিখে জামতোড়িয়া পুলিশ ফাঁড়ি (I.C.) অবরোধ করে। তাতে ফললাভ না হওয়ায় তারা আবার 'মহল গিরা' ডাক দিয়ে কিছু লোকজন যোগাড় করে ২২।৩।৮৪ ও ২৩।৩।৮৪ তারিখে বড়দহি গ্রামের চক্রধর টুডু, সুধীর টুডু ইত্যাদির, দাঁড়িকাডোবা গ্রামে আমার ও কালাপতি গ্রামে শীতল হেম্ব্রমের বাড়ী লুঠ করার ও অগ্নি সংযোগ করার অপচেষ্টা করে। কিন্তু সজাগ ও সক্রিয় থাকায় তাদের এই অপচেষ্টা ব্যর্থ হয়। (অসমাপ্ত)

জয়হিন্দ

দাঁড়িকাডোবা

৪।১০।৮৫

মান্যবরেষু,

পত্রে আমার নমস্কার জানবেন। গত ২৮।৯ তারিখে প্রেরিত আপনার পত্রখানি আমি যথাসময়ে পেয়েছি। ইতিমধ্যে লক্ষ্মীন্দ্রবাবু যে আমাদের এলাকায় আসবেন,

সে খবর আগে থেকেই জানতাম। কিন্তু আজ অবধি তিনি এসে পৌঁছান নি। অন্যান্য বারের মত সম্ভবতঃ তিনি বাস থেকে ঝিলিমিলিতে নামবেন। তারপর ওখান থেকে পায়ে হেঁটে যাবেন কায়রা—আমাদের 'তেতরে' পত্রিকার সম্পাদক মহাদেব হাঁসদা এর বাড়ী। কায়রা থেকে আসবেন আমাদের এখানে। আমাদের এদিকে যোগাযোগ বলতে কিছু নেই। জেলায় সদর শহরে যাওয়া আসা করতে আমাদের কমপক্ষে তিন দিন সময় লাগে। লক্ষ্মীন্দ্রবাবুর মত দুঃসাহসী ব্যক্তিরাও পুরুলিয়া দিয়ে আমাদের এদিকে আসতে সাহস করেন না। সে কথা থাক। লক্ষ্মীন্দ্রবাবুর জন্য প্রেরিত আপনার পত্রখানি তাঁকে অবশ্যই দিব। শুভেচ্ছান্তে।

ইতি—

ভবদীয়

সারদাপ্রসাদ কিস্কু

৪।১০।৮৫

To
Shri Gokulananda Laha
Editor, The 'Shotadal'
P. O. SILDA
Dist. Midnapur
PIN—721515

জয়হিন্দ

দাঁড়িকাডোবা

২১।১১।৮৫

মাননীয় লক্ষ্মীন্দ্রবাবু,

পত্রে আমার নমস্কার জানবেন। ১৯শে অক্টোবর জামতোড়িয়াতে নায়ারবাবুর সম্বর্দ্ধনা অনুষ্ঠান সম্পন্ন হবার পর আপনার কাছ থেকে আর কোন চিঠিপত্র পাইনি। আশা করি কুশলে আছেন।

কিছুদিন আগে খবর পেয়েছি যে, নিরঞ্জনবাবু নাকি অসুস্থ হয়ে পড়েছেন। আশা করি তিনি এতদিনে সুস্থ হয়ে উঠেছেন। যাই হোক, ১৮।১১।৮৫ তারিখে আমি তাঁকে একখানা চিঠি লিখেছি।

আমাদের মানবাজার থানার বরকদম গ্রামের ডাইনি সংক্রান্ত আপনার প্রতিবেদন কোনো কাগজে বেরিয়েছে কি না? বেরুলেই কাগজটা দয়া করে অবশ্যই আমার কিংবা মহাদেবের ঠিকানায় পাঠিয়ে দিবেন।

একদিন আঁকরো গ্রামে হতভাগ্য লালমোহন মাণ্ডির এক নিকট আত্মীয়—দীনু টুডুর সাথে আমার দেখা হয়েছিল। তার কাছ থেকেও কিছু প্রয়োজনীয় তথ্য পাওয়া গেল। লালমোহনকে গ্রামবাসীদের নাগালের বাইরে পালিয়ে যেতে সাহায্য করার অভিযোগে তারা দীনু টুডুর কাছ থেকে ৫০০ টাকা, ১ মন চাল ও ১টি খাসি জরিমানা হিসাবে আদায় করেছে।

লালমোহন নিজ গৃহে থাকাকালেই গ্রামবাসীদের ধার্য্যকৃত ৬০০০ হাজার টাকার মধ্যে বহুকষ্টে মাত্র ৩০০০ তিন হাজার টাকা জরিমানা আদায় দিয়েছিল। বাকী তিন হাজার টাকা আদায়ের জন্য গ্রামবাসীরা লালমোহন ও তার পরিবারের লোকেদের উপর অত্যাচার শুরু করলে লালমোহন পুলিশে খবর দেয়। পুলিশ দু'দিন বরকদমে ছিল। লালমোহনের বাড়ী যে পাড়ায় সেই পাড়ার লোকেরা মুক্তি মোর্চা করে। গ্রেপ্তার হবার ভয়ে তারা মুক্তি মোর্চার নেতা কালিপদ বাস্কের শরণাপন্ন হয়। এম. এল. এ. সুধাংশু মাঝিও আর চুপ করে বসে থাকতে পারলেন না। লালমোহন প্রাণভয়ে বাস্তু ছাড়া হতেই সুধাংশু মাঝি সি. পি. এম. পাড়ার লোকেদের নির্দেশ দিলেন তাকে আশ্রয় দিতে। সেই থেকে লালমোহন সি. পি এম দের আশ্রয়ে রয়েছে। পুলিশকে ক্ষমতা প্রয়োগ করতে দিলে এই কেলেঙ্কারীর সহজ মীমাংসা হতে পারত। কিন্তু সুধাংশু মাঝি পুলিশকে এ পথে যেতে দিলেন না। কারণ তাতে রাজনীতিতে অসুবিধা হবে। বরকদমের ডাইনির বিচারে শুধুমাত্র বরকদমের লোকই ছিল না—ছিল পাশাপাশি গ্রামের বহুলোক—সি. পি. এম. কর্ম্মী এবং সমর্থকরাও বাদ ছিল না। বলতে দ্বিধা নেই, অন্যদের মত সি. পি. এম. সমর্থকদেরও আগের মতই ডাইনি বিশ্বাস রয়েছে; তারা মার্কসবাদ কতটা আয়ত্ত করতে পেরেছে, জানি না; কিন্তু অন্ধ বিশ্বাস ও কুসংস্কার যে তাদের মধ্যে পুরা মাত্রায় রয়ে গিয়েছে, এতে সন্দেহের অবকাশ নেই। আবার, যে ক্ষেত্রে প্রাচীন একটা অন্ধ বিশ্বাস ও কুসংস্কারকে ভিত্তি করে নিরীহ, নিরপরাধ ও দরিদ্র লোকেদের কাছ থেকে সাধ্যের অতীত কয়েক হাজার টাকা করে জোরপূর্ব্বক জরিমানা আদায় করা হচ্ছে, এটা নির্জলা শোষণ ছাড়া কি? কেউ কি এই শোষণ বন্ধ করতে আগ্রহী হয়েছে? এই বিষয়ে শোষণ বিরোধী মার্কস-এর চেলাদের কি কিছু করা উচিত ছিলনা? আগেই বলেছি, পুলিশ হস্তক্ষেপ করলে সমস্যার সমাধান হতই। তাতে কিন্তু ডাইনি প্রথা বিরোধীদের জয় হত এবং ডাইনি প্রথা সমর্থকদের পরাজয় ঘটত যাদের মধ্যে সি. পি. এম. সমর্থকদের সংখ্যা নেহাত কম ছিল না। এটা সুধাংশু মাঝির আদৌ কাম্য ছিল না। এই কারণেই শুধাংশু মাঝি পুলিশকে সবুজ সংকেত দিলেন না। পুলিশও হাত গুটিয়ে বসে রইল।

বরকদমে আগে থেকে দুটো দল ছিলই—মুক্তি মোর্চা ও সি. পি এম. পরে সেই দল দুটোই হয়েছে যথাক্রমে একটি লালমোহনের বিরোধী এবং অপরটি তার

আশ্রয়দাতা। আপাতদৃষ্টিতে ভ্রম হতে পারে যে, দল দুটো হয়তো ডাইনী প্রথা বিরোধী। আসলে গ্রামের আপামর সকল জনসাধারণই হচ্ছে ডাইনী প্রথার সমর্থক। বিপদ কালে মুক্তি মোর্চার লোকেরা তাদের নেতার শরণাপন্ন হতেই সি. পি. এম-রাও তাদের লাল পতাকার নীচে একতাবদ্ধ হয়েছে।

নিজের পার্টির স্বার্থ রক্ষা করে উদ্ভূত সমস্যার সমাধান কিভাবে করা যায়, শুধাংশু মাঝি তার উপায় বার করতে মনস্থ করলেন। শুধাংশু মাঝি শুধুমাত্র এম এল. এ.-ই নন, তিনি আবার মানবাজার ২নং লোকাল কমিটির সদস্যও বটে। তাঁর পার্টির কার্য্যালয় রয়েছে বোরো নামক গ্রামে। দু দলকেই তাঁর কাছে যাবার জন্য তিনি তাঁর অফিস থেকে হুকুম জারি করলেন। তাঁর পার্টির লোকেরা তাঁর আদেশ পালন করলেও মুক্তি মোর্চার লোকেরা তাঁর কথায় কান দেয়নি। যাই হোক এতেই সুধাংশু মাঝির কাজ ও দায়িত্ব শেষ হয়ে যায়। ফলে লালমোহনও বাস্তু ছাড়া হয়েই রয়েছে।

সাঁওতাল সমাজ ডাইনী প্রথা বহাল তবিয়তে থাকলে সি. পি. এম-দের লাভ ছাড়া ক্ষতি নেই। তার কয়েকটা আধুনিকতম নমুনা দিচ্ছি।

নভেম্বরের প্রথম সপ্তাহে বড়রাঙ্গার এক শ্রাদ্ধ বাড়ীতে লোক সেবক সংঘের প্রাক্তন এম. এল এ. গোবর্দ্ধন মাঝি (মুর্মু)-র সংগে আমার সাক্ষাৎ হয়েছিল। তাঁর কাছ থেকে কয়েকটা মূল্যবান তথ্য পেলাম।

পুরুলিয়া জেলার বরাবাজারের কাছে আমাগাড়া নামে একটা গ্রাম আছে। ঐ গ্রামের বাসিন্দা রসিক হেমব্রম হচ্ছেন এক শিক্ষিত লোক এবং তিনি সমাজসেবীও। তাঁর সঙ্গে আমারও অল্প-স্বল্প পরিচয় আছে। অক্টোবর ('৮৫) মাসের শেষ সপ্তাহে সথাঘর গিয়ে উক্ত রসিক হেমব্রমের মাকে ডাইনী সাব্যস্ত করা হয়। রসিক হেমব্রম গ্রামবাসীদের ধার্য্যকৃত ১৫০০ (দেড় হাজার) টাকা জরিমানা আদায় দেন। রোগীটি কিন্তু সেইদিনই মারা যায়। রোগীটি ছিল ৯।১০ বছরের একটি ছেলে এবং সে বহুদিন যাবৎ রোগাক্রান্ত ছিল। গ্রামবাসীরা ক্রোধান্ধ হয়ে রসিক হেমব্রমের মা ও বাবাকে বাড়ী থেকে টেনে বার করবার জন্য কপাট কাটতে থাকে। উদ্দেশ্য, মৃত ব্যক্তির সৎকারের আগেই তাঁদের হত্যা করা। কিন্তু আমাগড়া গ্রামটি বরাবাজার থানা থেকে মাত্র ২ কিলোমিটার দূরে অবস্থিত। খবর পেয়ে পুলিশ রসিক হেমব্রমের মা ও বাবাকে অক্ষত অবস্থায় উদ্ধার করেন। উল্লেখ্য, রসিক হেমব্রম হচ্ছেন কংগ্রেসের সমর্থক, অপর পক্ষে অধিকাংশ গ্রামবাসী হচ্ছে সি. পি. এম. সমর্থক।

অপর ঘটনাটি পুরুলিয়া জেলারই বলরামপুর থানার কাঁশবহাল গ্রামের। ঘটেছে সেপ্টেম্বর ('৮৫) মাসে। উক্ত গ্রামের অধিবাসীরা গ্রামের এক স্ত্রীলোককে ডাইনী সাব্যস্ত করে। তারপর তারা তাকে খুন করে জলাধারের জলে পাথর চাপা দিয়ে

রেখেছিল।. কিন্তু ঘটনাটা আর গোপন রইল না। এই ঘটনায় পুলিশ কয়েকজনকে গ্রেপ্তার করেছেন।

বাঁকুড়া জেলার সাঁওতালদের মধ্যে ডাইনী-বিশ্বাস অত বেশী প্রকট না হলেও মাঝে মাঝে দু'একটা এমন ঘটনা ঘটে থাকে যা অনেককেই হতবাক করে দেয়। তেমনি একটা মর্মান্তিক ঘটনা ঘটেছে রাইপুর থানার ভেলাটিকরি গ্রামে অক্টোবর ('৮৫) মাসের প্রথম সপ্তাহে। বিবরণে প্রকাশ ঐ গ্রামে ফকির নামে এক সাঁওতাল ছিলেন শিক্ষিত, গণ্যমান্য ও অবস্থাপন্ন লোক। কংগ্রেসসেবী হিসাবেও তাঁর পরিচিতি ছিল। তাকে কিছুদিন আগেই ডাইনী করা হয়েছিল। তিনি একদিন প্রকাশ্য দিবালোকে পুকুর যাবার রাস্তায় খুন হয়েছেন। এই ঘটনায় কাউকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে কিনা—জানা যায় নি।

বিরাট সাঁওতাল জগতের ব্যাপার আমি জানি না—ছোট্ট এলাকার আমার জানা মাত্র কয়েকটি ঘটনা তুলে ধরলাম।

প্রায় এক দশক ধরে সি. পি. এম-রা রাজ্যে ক্ষমতায় রয়েছেন। এঁদের আমলেই ডাইনীর নামে অত্যাচার ও খুন ভয়ানক বেড়ে গিয়েছে। ডাইনী প্রথার আড়াল থেকে বিরোধী রাজনৈতিক দলের সমর্থকদের অবাধে খুন করে সি. পি. এম.-রা তাদের রাজনৈতিক উদ্দেশ্য চরিতার্থ করছে। তাই ডাইনী প্রথার উচ্ছেদের আগ্রহ সি. পি. এম.-দের আদৌ নেই।

শুনলাম, বালিশ্বর কিছুদিন হল, পুত্রসন্তানের জনক হয়েছে। বিশেষ লেখা নিষ্প্রয়োজন। ইতি—

আপনাদের
সারদাপ্রসাদ কিস্কু
২১।১১।৮৫

To
Shri Lakshmindra Kumar Sarkar
9/D, R. K. Chatterjee Road,
Calcutta-700042

জয়হিন্দ

দাড়িকাডোবা
৪।৭।৮৯

মাননীয় নায়ারবাবু,

পত্রে আমার নমস্কার জানবেন। আশা করি, কুশলে আছেন। আপনি অবশ্যই ইতিমধ্যে জেনে গিয়েছেন যে, গত ১৪ জুন তারিখে পুরুলিয়ার অতিরিক্ত দায়রা

জজের আদালতে সুধীর ও মিলনের মামলার রায় বার হবার দিন ছিল। নির্দিষ্ট দিনেই বার হয়ে গিয়েছে রায়টি। রায় ভাল হয়েছে, সুধীর ও মিলন বেকসুর খালাস হয়েছে। এই জয় কেবল সুধীর ও মিলনের নয়, আমাদের সকলেরই। এই জয় যারা ডাইনী প্রথায় বিশ্বাস করেনা, তাদের—এই জয় অন্ধবিশ্বাসের বিরুদ্ধে। কাজেই এই জয়লাভে আমাদের যথেষ্ট আনন্দিত হবার কারণ রয়েছে। রায় বেরোবার দিনে আদালতে সুধীর .ও মিলনের পক্ষ থেকে বড়দহি গ্রামের ফকির সরেন ও বিপিন টুডু, বড়গড়িয়া গ্রামের মনোহর কিস্কু, গোলাপাড়া গ্রামের ভুটি মাণ্ডি, চিরুগড়া গ্রামের মহানন্দ মাহাতো, কুমারী গ্রামের চিন্তাহরণ মাহাতো, শশধর মাহাতো প্রভৃতি উপস্থিত ছিলেন। রায় বার হবার পরে সাংবাদিক লক্ষ্মীন্দ্রকুমার সরকার, পুরুলিয়ার সাংবাদিক প্রশান্ত রক্ষিত ও পল্টু দে আদালতের বারান্দায় সুধীরদের উকিল অরূপ-কুমার ভট্টাচার্য্য ও জুনিয়র উকিল নন্দলাল সিংহানিয়া সমেত সুধীর ও মিলনের পর পর কয়েকটি ছবি তোলেন।

সুধীর ও মিলনের মামলা শেষ হবার পর মনে হয়েছিল, ডাইনী প্রথা বিরোধী আন্দোলনের কাজ বুঝি শেষ হয়ে গেল। সাঁওতালদের মধ্যে ডাইনী ধরার কাজ তো হামেশাই হচ্ছে। সখা ও জানগুরুরা ডাইনী ধরে নেবার জন্য যেন সব সময় আসন পেতে বসে আছে। তেমনি গ্রামের ওঝারাও যেন তৈরি আছে। বি. এ., এম. এ., পাশ করা শিক্ষিত লোকেরাও এই ডাইনী প্রথার খপ্পর এড়াতে সক্ষম হন না। রোগীর বাড়ীর লোকদেরই কেবল ডাইনী ধরার প্রয়োজন থাকে তা নয়, গ্রামের লোকেরও ডাইনী ধরার প্রয়োজন থাকে। সেটা হচ্ছে, জরিমানা আদায় অর্থাৎ ফাঁকা আয়ের লোভ। বলা বাহুল্য, এই ফাঁকা আয়ের সমস্তটাই মদ্য মাংসে ব্যয়িত হয়ে থাকে। তেমনি একটা ডাইনী সংক্রান্ত ঘটনা ঘটেছে আমাদের জামতোড়িয়া ফাঁড়ির অধীন টিপুড়ি গ্রামে। এটি হচ্ছে কেষ্টপুর মৌজার একটি পাড়া এবং এখানের অধিবাসীরা সকলেই সাঁওতাল। আজ থেকে তিন-চার মাস আগে অন্যান্য গ্রামের মত টিপুড়ি গ্রামেও পানিবসন্ত (জলবসন্ত) হয়েছিল। তাড়াতাড়ি সারছে না বলে গ্রামবাসীরা তেল দেখাল এবং পরে বিহারের মেঘাদা গ্রামের সখার কাছে গেল। সখা লম্বোধর কিস্কুকে ডান বলে চিহ্নিত করল। গ্রামে ফিরে এসে গ্রামবাসীরা লম্বোধরের কাছে ১২৫০ টাকা জরিমানা আদায় করল এবং শুদ্ধিকরণে লম্বোধরের মোট ব্যয় হল ৮০০ টাকা। এতেই লম্বোধরের নিষ্কৃতি পাবার কথা। কিন্তু লম্বোধরের ক্ষেত্রে ব্যতিক্রম হল; তাকে একঘরে করেই রাখা হল। তারপর ১১ জুন তারিখে গ্রামবাসীরা লম্বোধরের বাড়ীতে গিয়ে তাকে বেদম প্রহার করেছে। প্রহারের চোটে সে অচৈতন্য হয়ে পড়ে। তার বাড়ীর লোকেরা পঞ্চায়েতে জানায়। পঞ্চায়েতের লোকেরা জামতোড়িয়া ফাঁড়িতে (আই. সি) ডায়েরী করার নির্দেশ দেয়। সেই মোতাবেকে তারা ৯ জনকে আসামী করে ফাঁড়িতে উক্ত ১১ তারিখেই ডায়েরী করে। তারপর লম্বোধরকে মানবাজা র

হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। সেখানে সে ১৩ দিন চিকিৎসা পাবার পর মুক্তি পেয়েছে। পুলিশ আজ পর্যন্ত অভিযুক্তদের কাউকে গ্রেপ্তার করেনি। ইতিমধ্যে জামতোড়িয়া খেরওয়াল গাঁওতার সদস্যেরা অভিযুক্তদের গ্রেপ্তার করার দাবীতে লিখিতভাবে ফাঁড়িতে দাবী জানিয়েছেন। এদিকে ঝাড়খণ্ড পার্টির কয়েকজন লোক আদিবাসীদের পক্ষে একদিন ফাঁড়িতে এসেছিলেন। গ্রামবাসীরা ঝাড়খণ্ডের সমর্থক। খবর পেয়ে লক্ষ্মীন্দ্র সরকার ও তাঁর স্ত্রী শ্রাবণীকে সংগে নিয়ে মন্মথ বাস্কের সংগে টিপুড়ি গিয়েছিলেন। তিনি লম্বোধরের ও তার পরিবারের লোকেদের বক্তব্য টেপে রেকর্ড করে নিয়ে এসেছেন। তিনি দেখে এলেন, লম্বোধর ও তার পরিবারের লোকেরা এক ঘরে অবস্থাতেই রয়েছে, গ্রামের রাস্তায় তাদেরকে চলতে দেওয়া হয় না, গ্রামের কূয়া ও পুকুরও তাদের জন্য নিষিদ্ধ, গ্রামের লোকের সাথে তাদের কোন লেনদেন কিংবা কথাবার্তা নেই। পুলিশ প্রায় নিষ্ক্রিয়।

নিয়ম অনুযায়ী গ্রামবাসীরা লম্বোধরের কাছে জরিমানার টাকা পেয়েছে, উপরন্তু লম্বোধর শুদ্ধিকরণ করিয়েছে; তা সত্ত্বেও গ্রামবাসীরা তার উপর অত্যাচার-নিপীড়ন চালাচ্ছে কেন এটা প্রশ্ন জাগে।

তার উত্তর খুঁজতে গিয়ে দেখতে পাই,—লম্বোধর পুত্রহীন, দুটি কন্যা আছে। বড়টির বিয়ে হয়েছে, জামাই; ঘরজামাই হিসাবে লম্বোধরের বাড়িতেই আছে। লম্বোধরের শরিকরা গ্রামেই আছে। তারা দেখল, লম্বোধরকে ডাইনী অপবাদ দিয়ে গ্রামের লোকের সাহায্যে গ্রাম থেকে তাড়াতে পারলে জমিজমা তাদেরই হয়ে থাকে, অন্যেরা আদৌ ভোগ করতে পারবে না। তার জন্যেই ওর উপর এই অত্যাচার নিপীড়ন। এই প্রসঙ্গে একটা ঘটনার কথা মনে পড়ছে, বড়দহি গ্রামে চাঁদমণি নামে এক বিধবা স্ত্রীলোক ছিল। তার জমি ছিল ৮৪ বিঘার মত। তার দুটি কন্যা সন্তান ছিল। বছর ৬০ আগে তাকে ডাইনী অপবাদ দিয়ে গ্রাম থেকে তাড়িয়ে দেওয়া হয়। চাঁদমণি গ্রাম থেকে চলে যাবার সময় সমস্ত ভূসম্পত্তি ভূম্যাধিকারীদের হাতে ইস্তফা দিয়ে দেয়। শরিকদের আর তার সম্পত্তি হস্তগত করা সম্ভব হল না। ইতি—

ভবদীয়

সারদাপ্রসাদ কিস্কু

৪।৭।৮৯

—×—

পরিশিষ্ট—২

[ডাইনী বিরোধী আন্দোলনকারীদের যেভাবে খুন করার চেষ্টা হচ্ছে এবং হবার পরিকল্পনা ডাইনীর পক্ষের লোকেরা করছে—সে সম্পর্কে খেরওয়াল গাঁওতার সম্পাদক মহেশ্বর বেশরা, একটি আবেদন কলকাতার ও ঝাড়গ্রামের সংবাদপত্র দপ্তরে পাঠান এবং লিফলেট করে গ্রামের হাটে হাটে বিলি করেন। এটি তারই প্রতিলিপি]

আদিবাসী বুদ্ধিজীবিদের হত্যা করার কাজ শুরু হয়ে গেছে

গত ২০শে মে ১৯৮৪ পুরুলিয়া জেলা ও মানবাজার থানার অন্তর্গত পাঁড়রা গ্রামে লোকালয় থেকে এক'শ গজের মধ্যে প্রকাশ্য দিবালোকে আততায়ীদের দ্বারা বসন্তপুর গ্রামনিবাসী জাগরণ সরেন নির্মমভাবে খুন হয়েছেন। তিনি স্কুলের একজন শিক্ষকমাত্র ছিলেন না, তিনি ছিলেন পুরুলিয়া জেলার সুসার গাঁওতার সভাপতি, বসন্তপুর জুনিয়ার হাই স্কুলের প্রতিষ্ঠাতা ও সেক্রেটারী, পশ্চিমবঙ্গ তপসীলী জাতি ও আদিবাসী পরিষদের জেলা কমিটির সেক্রেটারী ও মানবাজার ২নং ব্লক কংগ্রেস (ই) কমিটির সেক্রেটারী। তিনি পঞ্চায়েত প্রধান, সভাপতি কিংবা তজ্জাতীয় কোন দিনই ছিলেন না ; তথাপি গ্রামোন্নয়নের ক্ষেত্রে তিনি যে স্বাক্ষর রেখে গেছেন, তা সকলেরই বিস্ময় জাগায়। তিনি এক সময় 'সুসার ডাহার' নামক সাঁওতালী পত্রিকার সম্পাদকও ছিলেন।

তিনি কিছুক্ষণ আগেই তাঁর বাড়ী থেকে আড়াই কিলোমিটার দূরে এক আত্মীয়ের বাড়ী গেছিলেন। সেখান থেকে একাকী সাইকেলে বাড়ী ফিরছিলেন। আততায়ীরা ওঁৎ পেতে ছিল।

এক শ্রেণীর লোক এটাকে আদিবাসীদের ডাইনী প্রথার বিষময় পরিণতি বলে অপপ্রচার শুরু করে দিয়েছিল। কিন্তু গোয়েন্দা কুকুরের সাহায্যে যে কজন দুষ্কৃতকারী ধরা পড়ে এবং পরে যে সমস্ত অপরাধীদের নাম জানা যায়, তারা সকলেই বিশেষ একটা রাজনৈতিক দলের লোক। কাজেই পরিষ্কার ভাবে প্রমাণিত হয়ে গেল যে, এটা একটা নির্ভেজাল রাজনৈতিক হত্যাকাণ্ড।

পরবর্তী পর্যায়ে যাদের অচিরে পৃথিবী থেকে সরান হবে, তন্মধ্যে নাকি বিশিষ্ট সাঁওতালী কবি সারদাপ্রসাদ কিস্কু, তেতরে পত্রিকার সম্পাদক মহাদেব হাঁসদা, কংগ্রেসের প্রাক্তন এম. এল. এ. শীতলচন্দ্র হেমব্রম,—'জিরিহিরি' পত্রিকার সম্পাদক বালিশ্বর সরেন ও আমার নাম রয়েছে। সারদাপ্রসাদ কিস্কুকে এর আগে থেকেই খুন করার চেষ্টা চলছে। গত ২৫শে এপ্রিল তারিখে গ্রামান্তর থেকে তাঁর ফিরবার রাস্তায় শত্রুরা ওঁৎ পেতে ছিল ; তিনি দৈবক্রমে রক্ষা পেয়ে যান। অতঃপর ছুরিকাঘাতে আমার প্রাণনাশের জন্য ৩০শে মে তারিখে দু'জন আততায়ী আমাকে

আক্রমণ করেছিল। তারা ধরা পড়ে যায়। বলা বাহুল্য তারাও ঐ বিশেষ রাজনৈতিক দলেরই লোক।

প্রসঙ্গতঃ উল্লেখযোগ্য, ১৯৮৩ সালের ২২শে এপ্রিল বাঁকুড়া জেলার ঢেঙাআম হাই স্কুলের শিক্ষক ও বাঁকুড়া জেলা পরিষদের সদস্য ধনঞ্জয় হাঁসদা, শ্রেণীকক্ষের মধ্যে পাঠদানরত অবস্থায় প্রকাশ্য দিবালোকে খুন হয়েছেন। তিনি এক সময় বাঁকুড়া জেলা আদিবাসী মহাসভার সেক্রেটারী ও স্থানীয় ল্যাম্প সমিতির প্রতিষ্ঠাতা চেয়ারম্যান ছিলেন। সি. পি. এম. দলত্যাগী এই ব্যক্তির খুনের নেপথ্যে কোন রাজনৈতিক দলের হাত ছিল না, বললে ভুল বলা হবে।

বিশেষ রাজনৈতিক দলের প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ হস্তক্ষেপের ফলে যে জঘন্য হত্যাকাণ্ডগুলি অনুষ্ঠিত হয়ে গেছে এবং হতে চলেছে তাতে আদিবাসীদের ভাবিয়ে তোলার যথেষ্ট কারণ আছে। আশু এর প্রতিরোধ ব্যবস্থা গড়ে না উঠলে আদিবাসীদের অস্তিত্বই বিপন্ন হয়ে পড়বে। এ বিষয়ে দেশের শুভবুদ্ধিসম্পন্ন মানুষের ও রাজ্য সরকার তথা কেন্দ্রীয় সরকারের দৃষ্টি আকর্ষণ করা হচ্ছে।

সাং : মহেশ্বর বেশরা
জেলা পুরুলিয়া।
১৬/৬/৮৪

To
The Editors

(1) The Banavasi Samachar
Banavasi Office
P. O. Jhargram
Dist. Midnapore.

(2) The Jhargram Hitaisi
P. O. Jhargram
Dist Midnapore

To

The Editor, The 'Banavasi Samachar', Jhargram

মহাশয়,

সবিনয় নিবেদন এই যে, শুভবুদ্ধিসম্পন্ন মানুষমাত্রই স্বীকার করবেন,—অপরাধ চিরকালই অপরাধ, অন্যায় চিরকালই অন্যায়। ঘটনাপ্রবাহ কোথা দিয়ে যাবে, বলা মুস্কিল। দেশের অধিকাংশ লোক যদি বিচার-বুদ্ধি ও মূল্যবোধ হারিয়ে

ফেলেন, তাহলে দেশের ভবিষ্যৎ অন্ধকার। এই অবস্থায় সাংবাদিকদের দায়িত্ব অনেক। তাঁরাই সংবাদপত্রের মাধ্যমে এর প্রতিরোধ করতে পারেন—দেশকে ও জাতিকে ধ্বংসের হাত থেকে রক্ষা করতে পারেন।

তাই বিশেষ আশা রেখেই—'আদিবাসী বুদ্ধিজীবীদের হত্যা করার কাজ শুরু হয়ে গেছে' শীর্ষক একটি লেখা পাঠালাম। আদিবাসী বুদ্ধিজীবীদের জীবন রক্ষার্থে আপনারা যদি লেখাটা আপনাদের পত্রিকায় দয়া করে প্রকাশ করেন, তাহলে বাধিত হয়ে থাকব। ইতি—

মহেশ্বর বেশরা
১৬/৬/৮৪

Copy to the Editors

(3) The 'MUKTI'
P. O. & Dist. Purulia.

(4) The 'Paschimbanga Sambad'
ASANSOL, Dist Burdwan

(5) The 'JUGANTAR'
2, No Ananda Chatterjee Lane,
Calcutta-3

(6) The 'AJKAL'
96, Raja Rammohan Sarani,
Calcutta-700009

(7) ইঙ্গ্রাঃ : ঝুহিতে
Mr. ABDUS SATTAR
Leader of Opposition
Legislative Assembly, West Bengal
Calcutta-1 ঠেন কোল হোয়েনা।

—×—

পরিশিষ্ট—৩

WEST BENGAL

WITCHERY KILLINGS MOUNT IN PURULIA*

Purulia : Surrounded on all sides by small hills, souther Purulia is full of natural beauty. But the tribal population of thi area is steeped in poverty, ignorance, superstition and illiteracy o late, witchery has emerged as the latest of the impoverishe Adivasis' myriad problems. Witchcraft is not a new phenomenon but its incidence has increased significantly.

It has long been a custom whenever there is a major illness i any tribal household for the family to conclude that the misfortun is the result of witchcraft. The witch-doctor, ("Sakha" in Santhal in return for a consideration, Pours oil on Sal leaves and, chantin mantras, identities a particular person as a witch.

Witches, of course, are almost always women and in most case they happen to be widows. The witch's family has to give cash sheep, poultry, etc. by way of fine and the entire village enjoys feast out of these.

If the family refuses to pay the fine or is even reluctant to do so its huts are set on fire and the witch is killed. But, it must b admitted, that the witch-doctors are smart, for, after touring Kaira Mukundapur, Chhotaranga, Raina, Darikadoba and other village of Bandowan and Manbazar thanas, we did not came across a singl instance of a witch being identified in the family of a ruling Part supporter.

There are numerous cases of families emigrating after bein reduced to penury in paying the fine imposed by the witch-docto But the list of those who have had to pay with their lives is by n means small.

● The mother of Srikanta Saren in the Dhuduri village of Manbazar block.

● Phulmoni Hansda, the widowed mother of Ajit Hansda of Jhilimili village in Bankura.

● An old woman in Borokadam village in Manbazar thana.

● Dasarath Hembram of Balibandh village of Ranibadh block (he was killed on April 18 this year).

Political Opportunism : In view of the coming elections, neither the CPI (M) nor the Jharkhand Mukti Morcha is coming out unequivocally against this cruel Practice what is worse, the CPI (M) supporters are attacking those educated Santhals who are opposing withcraft. This was the allegation of Mr Sarada Prasad Kisku who has been honoured with the title of 'Kavi Ratna' by Bhagal pur University.

In an interview to 'The Telegraph' in his home in Darikadoba village, he related how twice he had Providential escapes from death. On the night of June 23, this year, a group of men armed with bows and arrows and led by Lalin Tudu of Bardohi village in Manbazar thana attacked this home. Mr. Kisku managed to get away by fleeing into the darkness through the back door of his home. On June 28, while he was returning home he learnt at Gopalpur village that a group of armed men were lying in wait for him in his village. He did not go home for sixdays, returning only after a Police Picket was Posted in his village. To this day he lives in fear of his life.

Maheswar Beshra of Chotoranga village was also attacked for opposing sorcery. On May 30, Tikaram Mandi (of village Dorjuri) and Sitaram Mandi (of village Kabrabehra), both known as CPI (M) cadres, attacked him with bhojalis. However, he was saved by some villagers who even managed to catch the two assailants. They were handed over to the Jamtoria Police out post, but such was the

security there that they managed to escape later the same night. Tikaram Mandi was rearrested and currently is on bail.

For the same reason Sudhir Tudu, his wife, Nilmoni Tudu, and their neighbour, Chakradhar Tudu, of Bordohi village were attacked on March 16. Witch-doctor Surya of Royna had decleared Nilmoni to be a witch and ordered Sudhir to pay a five of Rs. 1,200. He refused and his friend Chakradhar supported him in his apostasy. Sudhir Tudu was so badly injured in the attack that he had to be admitted into what passes for a hospital in Jamtoria.

Official candour : Asked what action had been taken to counter the violence, Mr. Ram Kamal Mondal, the incharge of the Police out post. in Jamtoria, replied with regret and unusual candour, "To maintain law and order in this vast area I have only five men-an

---

> 'Let alone outsiders, I do not have effective control of my own men. Come nightfall they sitdown to gamble and imbibe lequor. Do you think I will be spared if I take action against anybody in this isolated area ?'—Ram Kumar Mondal, in-Charge, Police out post in Jamtoria, Purulia

---

ASI and four constables. I don't even have a Jeep. We have to depend on just two bicycles. There are just three rooms in the out post. Where do we lodge the arrested ? For that matter where do we lodge ourselves ? Let alone outsiders, I do not have effective control of my own men. Come night fall, they sit down to gamble and imbibe liquor. Do you think I will be spared if I take action against anybody in this isolated area ?"

What is encouraging is that many educated young Santals are coming together to resist this evil practice. Leading them is the elderly Santhal Poet, Sarada Prasad Kisku, recipient of the President's medal for model teachers. The editor of a local periodical, 'TETRE', Poet Mahadev Hansda and his friends are engaged in a Campaign against withcraft. In August, they organised a debate

whose subject was 'Tne Sakha cannot catch spirits'. There progress is slow, but it is clear that their movement is gradually gaining in adherents.

Education would have been the most formidable weapon to fight sorcery. But grinding Poverty and the fact that there is just one dilapidated school (in Jamtoria) to serve six villages have effectively put paid to any hopes of enlightement overcoming superstition. Many more unfortunate tribal women will have to pay with their lives and many morê educated Santhals will have to risk their lives before any appreciable progress is made in Countering Sorcery among the tribals of Purulia.

BEHAVIOUR

SANTHALS

THE BRANDED WITCHES*

The Santhal villages scattered among the gently wooded hills of south Purulia in West Bengal have changed little over the years. But today, behind their placid facade, trouble is brewing. This was apparent last fortright when the People's Union for Civil Liberties (PUCL) submitted a memorandum to Chief Minister Jyoti Basu demanding an immediate ban on 'witch-hunting' in these villages and the arrest of all those connected with it Adding fuel to the fire was the PUCL allegation that local CPI (M) leaders had resorted to murder and intimidation to thwart attempts by reformers to put an end to the barbarous practice.

The memorandum was prompted by a series of attacks on a group of Santhals who have been in the vanguard of the drive against witch-hunting and other in human and degrading tribal customs. Whether the Government takes the memorandum seriously

or not, the consequences for these reformers are serious indeed. They have challanged the authority of tribal orthodoxy and worse, betrayed the secreecy of tribal institutions. For this they can expect retribution. Fumes Maheswar Besra of Raina village, echoing the sentiments of most tribals. "We have our own beliefs, customs and laws, according to which we make our own judgements. Nobody has the right to interfere".

The reformists, however, think otherwise. "We Santhals have some primitive practices which are used to exploit the vulnerable in our society", says Mahadev Hansda of Kaira village. Hansda, a school teacher, edits the Santhali magazine 'Tetre' which preaches reform to its 1,200-odd subscribers throughout the district. He and a group of like-minded Santhals have been battling since 1976 against what they consider the most depraved of their community's customs : Witch-hunting. Most Santhals still believe that when a witch casts an evil eye at her victim, incurable illness and misfortune are the result.

But the real victim is more offen the poor woman branded as a witch. For the unfortunate person so pronounced by the sokha (witch-doctor) is put on trial by the village Council and fined any amount from Rs. 500 to Rs. 5,000. It she refuses to or is unable to pay the fine the 'witch' is offen beaten or stoned to death. Ajit Hansda, a youth who ekes out a living at the jhilimili tourist resort recalls with bitterness. "My mother was declared a witch when a boy fell ill and started shouting that a witch was eating his insides. Nobody in the village spoke for us, although they knew we were too poor to pay any five. One night when the villagers were drunk they came to our house and beat my mother with lathis. She died in hospital at Bankura the next day."

It is usually widows and other such vulnerable women who are declared witches and the purpose, apart from the release of pent-up aggression, seems to be material exploitation. The experience of Purnima Mandi wife of a well-to-do cultivator, is a case in point.

Says her son Lakhinder, "My mother would be declared a witch every time some one in our village fell ill". Her husband was driven to the brink of ruin by the many fives he had to pay, which served only to pay for the drinking bouty of the other villagers. Only a year and a-half later when the matter was reported to the authorities by one of the reformists did the villagers, scared by the involvement of the authorities stop daring to declare her a witch.

Cruel though the custom may seem, most Santhals support it. Perhaps this is because everyone in the village—apart from the victim—benefits from the fines levied. A large share of these fines goes to the village chiefs, but the biggest benificiaries of all are those who masquerable as witch doctors and profess the esotericability to recognise witches. They charge any where from Rs. 250 to Rs. 2,000 for their services. Asserts one of them, Mandi : "No body knows who the witch is but we have the power to identify her."

The village chiefs, most of whom support witch-hunting, used to be elected annually. But they have now with the help of political parties been made hereditary chieftains. "The Chiefs are manipulated for votes by political parties." Says Baliswar Soren, a reformist from Jamtoria village. And it stands to reason that no party, including the CPI (M) has any intention of disturbing a custom which has the sanction of the majority.

There is little the police can do. Says a police official of the area. "We often hear of witches being killed by villagers but there is nothing we can do about it." Most cases are not reported to the police and even if they are convictions are almost impossible to obtain because Santhals rarely come forward to testify in court. The involvement of political parties only complicates the matter, and it was in answer to this that the reform movement was formed a little over a decade ago by a group of a dozen educated Santhals.

"Although many Santhals shunned us, .many educated Santhals liked our ideas, and our songs and plays, and they too found the

practice of torturing defenceless women revolting" says Mahadev Hansda. Panchanan Soren of Basantpur village agrees that "in the villages where anti-witch-hunting associations are strong, nobody is branded a witch." The killings of witches too have declined dramatically in the area—from five last year to none this year.

The counter-attack against the reformist thrust is being supported by the leaders of the most powerful political party in the area the CPI (M). The battle flared up in March this year when a Santhal of Bardohi village. Chakradhar Tudu, unable to stomach the humiliating trial of a 'witch'. Chunni Tudu, burst out that the trial was a force and that he did not believe in witches. "I was heckled and then beaten up." says Chakradhar who does not dare to venture out of his house unarmed any more. On the day of Chunni's trial, some Santhals also dragged her uncle Shital Hembram, an ex-congress (I) M. L. A. from her house and thrashed him mercilessly.

When, the police arrested Lariram Tudu, chief of Barodhi village, the supposed victim of Chunni's evil eye and one Sarju who nad branded Chunni a witch, the Police out post was begiged by a mob of 200 Santhals demanding their release. Simultaneously many Santhal leadery, including CPI (M). Members gave a call for the trial of Shital Hembramb and Chunni's husband Sudhir Tudu. The situation was only defused by the posting of a police picket in the area. Chandrakar Tudu, like most others asked in the area, points at CPI (M) leader and ex-anchal Pradhan of Chotoranga village Ramdas Baskey as the leader at the attack on the reformists.

Baskey, along with other Santhal and Jharkhand Party leaders has organised several meetings, and exhorted the tribals to resist and punish the activities of the reformists. Alleges Chunaram Besra, CPI (M) member of the gram Panchayat of Raina village. "The reformists are politically motivated and Congress (I) people, such as Shital Hembram, are trying to take advantage of the situation by attacking our social customs." Like most Santhals, Besra too

believes that the social problems of Santhals should be dealt with at "special trials held by Santhals."

That the confrontation could only get worse was brought home by the attempted murder at Sudhir Tudu on June 23. "The attackers had dragged out the women from Tudu's house and were beating them in the dark," says Saroda Prasad Kisku one of Mahadev Hansda's colleagues, "and in the confusion they mistook Lakshan Tudu for Sudhir and murdered him" Tudu's house was attacked thrice the same day, prompting him and his family of non-believers to flee the village. Afterwards there were several attacks not only on Kisku but Mahadev Hansda, Baleswar Soren and other reformists indifferent villages, necessitating the posting of an armed police contigent at Bardohi till September 18.

The reformists, for their part, realise they cannot live under the protection of the police for ever Maheswar Besra secretary of the reformist association at Jamtoria has been assaulted twice for his views and has little faith in the Police. "I know the persons who assaulted me—one of them was Chunaram Besra, the Panchayat member—but all of them are still moving about freely." he says, Moreover, the murder of Jagoren Soren, a Congress (I)—affiliated school teacher and highly regarded local leader of Basantpur has convinced many, like school teacher Haripada Hansda, that "the CPI (M) will do anything to further its political influence in the area."

By supporting the custom of witch hunting, says Saroda Prasad Kisku, the CPI (M) is making rapid inroads into villages like Bardohi where it previously had little clout. The reformists have decided to continue their crusade regardless of the consequences. "With a little support from the state Government we could have rendered all witch-doctors jobless overnight," says Mahadev Hansda, "but now I suppose it will take a little longer," once again, short-sighted politicians look set to scuttle a much-needed attempt at reform.

WITCHES, POETS AND PROTEST*

Japith, japith, japith e man thinam / Ja hhulogam Sajoa ena under,/ Ranger nachar ar nahachar una / Sahauka am ? nita ee henam / gidar ? / (Sleep, sleep, sleep—How long / will you be asleep / How long are you playing the / innocent fool / How much more will you suffer poverty, ignorance / And tyranny ? Are you all still children ?) /—An excerpt from a poem 'Evccn Adang'

(Reveille) by Saroda Prasad Kisku

In the remote tribal hamlets of Bandaon and Manbazar blocks in Purulia district the waves of a veritable cultural revolution are making itself felt in the lives of the Santhals, sequestered though they may be from the sweep of changes, social and political, that are supposed to have taken place in post-independent Bengal. Unknown to the urban intelligentsia of Calcutta with the exception of a few People's Union of Civil Liberties activists, ignored by the media, official or non-official, and outside the pale of the city-bred 'sociologists' concern, the movement in Purulia against the dan custom, an indigenous form of witch hunting among the tribals, has gathered storm in the last few months and shaken the very fabric of the dull tenor of tribal life steeped in ignorance and superstition.

The detection of witches by priest-magicians supposedly endowed with supernatural powers might have been the helpless response of the tribal community to the terror inspired by natural calamities and epidemics but today a band of young men have made it target of a frontal attack. That they are mostly Santhai writers led by none other than the eminent poet Saroda Prasad Kisku does credit to the act of writing itself, which in the more advanced languages of India is sadly getting divorced from social issues.

Saroda Prasad and his followers, who match their conviction with courage and who have not hesitated to risk their lives in the process, do not, fortunately for the community, belong to the tribe of poets in our midst whose credo happens to be "poetry makes nothing happen" and who are content to use words to decorate their thoughts of lonesome anguish. Again, the crusade of these members of the incipient Santhali intelligentsia in the face of the reaction of political parties, white, green or pink, which ranges from indifference to open hostility, is strongly reminiscent of the famous Indian dichotomy between politics and social concern.

In Kaira, Jamthodia, Mukundapur, Chhotadanga, Dadikadoba, Raina and all those villages spread on either side of the Purulia-Jhilimili road this fierce clash of ideas is palpably felt—the tussle between conservative diehards who are in the majority, that too not silent, and the young radicals, a militant minority whose faith in the final outcome of the struggle by winning the hearts of the people is unshakable. Violence is not excluded. The activists, who knock down miles in hectic crosscountry walks to organise meetings and distribute handbills, have been attacked with murderous intentions. Saroda Prasad himself had once to be rescued from mob fury by village women, had to flee his house through the back-door on another occasion and recently had to abscond for a week to escape an attempt on his life. All of them are persona-non-grata in the eyes of the village elders and small town politicians alike; ten of them, among them Saroda Prasad and his active lieutenants Mahadev Hansda, Baliswar Saren and Maheswar Besra, have been duly and falsely implicated in murder cases.

Yes, witch hunting is still a reality in Purulia's villages where, as G. V. Nair records, the tribals are in great ferment over a minority's attempts to stand up against the majority's belief in witches and witch hunting. This is the first of a two-part article to be concluded next Sunday.

The dan custom, which harks back to the primitive past of the

community, today owes its longevity to the sub-human level of life which is the lot of the adivasis in our country. Denied rudiments of modern medicine by way of hospitals and services of qualified doctors and bereft of the light of knowledge which alone can explain nature to man, it is small wonder that the tribal community has all along attributed natural disasters and illness of its members to the existence of witches in their midst. Custom has it that whenever there is an incurable illness in a tribal household the service of a witch doctor (sakha) is sought. He gazes at a sal leaf smeared with oil, chants mantras (the mantra couched in Bengali is reportedly a simple invocation of Kali with appropriate screams and shrieks) and in a state of trance names a particular person, more often than not a woman, as the culprit. The dan's family is forced to do penance by offering the community sheep, poultry and cash, a share of which is given to the witch doctor. The other share is used for community feasting and revelry. For instance, in the beginning of this year, when Lilu Sakha of Jorbandh identified Doli Tudoo, wife of Nalen Tudoo in Bardohi villaga as the dan responsible for the continued illness of Lariram Tudoo, the family had to part with a black sheep,

That they are mostly Santhali writers led by none other than the eminent poet Saroda Prasad Kisku does credit to the act of writing itself, which in the more advanced languages of India is sadly getting divorced from social issues.

a black sow, five hens and Rs. 160 in cash. It was in fact this particular case which ignited the present movement in the area against the evil institution of witchcraft.

If the householder is unhappy with the judgement of a local Sakha he can appeal for a reexamination of the case by a senior Sakha but this may be done only after paying a penalty. To have a Dan under the roof could be an unbearable humiliation and the householder runs from one witch doctor to another for the redemp-

tion of his family member accused of being a Dan. As it is an expensive business, a time comes when he is totally impoverished and then his only way of escape is to leave the village with the 'witch', if he is kind, or beat up and drive out his dear one with the help of the villagers. Chastisement of the 'witch' takes gruesome forms of torture of merciless beating, force feeding of excrement and finally killing.

In Bardohi village there lives 60-years-old Lod Murmu who has been pauperised doing penance to expiate for his mother who has been declared a dan. Now an outcast, only his old age prevents him from leaving the village. Not long ago Lulu Hansda's mother in the village of Chhotodanga in Manbazar block, unable to pay the heavy fine imposed the Sakha, was beaten up and driven out of village. She hanged herself and ended her miserable life. Recently, in Phorlbenia village Pranskinhua Hemrum died from dog-bite. A Sakha was consulted who laid the blame squarely on an old woman who was driven out from the village. Udalbari in Bardaon block is said to enjoy the distinction of having four dans under its roof, all under reprieve.

Mahadev Hansda, poet and the editor of the literary journal Thethre, gives a list of dans in the area who have had to pay for their "sins" with their lives.

* A few years back Srikanta Soren's mother in Dhudri village, Manbazar block, was suspected of being a witch and was beaten to death. Even the unhappy woman's own children were said to have had joined the mob who set on her as a crafty sakha declared her responsible for the outbreak of pox in the area.

* In April this year, for a change an old man by name Dasarath Hembrum was declared a male dan by a sakha in Ranibandh and lost his life in mob fury.

The Bardohi dan case which gave fillip to the movement can be traced to March 6 this year. Lilu Sakha of the village declared Nalen Tudoo's wife a dan and made her responsible for the illness of old Latiram Tudoo. Nalen approached Surya Sakha of Raina village for a reexamination of the case and this senior sakha did the bhau and identified Sudhir Tudoo's wife as the real dan. Sudhir Tudoo, a man of the younger generation, and his friends Malin and Chakradhar did something unthinkable for a santhal : in the open meeting they declared that they would do no penance and that the dan custom was a lot of bunkum, nothing more. They were given a good thrashing by the credulous mob. There was a call for a mahalgira (conference) to try not only Sudhir and his friends but also Saroda Prasad, the school masterpoet who lived in nearby Dadikadoba village. On March 16, when Saroda Prasad refused to attend the meeting and informed the elders in clear terms that he was totally opposed to the dan custom which he described as simply inhuman. The mob fury turned against him. An agitated group of men went to his house and tried to forcibly carry him to the meeting place but the attackers were repulsed by the village women who made a ring around the elderly poet. Only the timely arrival of a jeepful of policemen under the command of the DSP of Purulia saved his life that day.

Since then the sleepy little villages have known no peace. They have witnessed mass meetings, demonstrations before thanas, a war of handbills and, finally, two murders. The first murder, that of Jagaren Saren on May 30 at Panra, is still clouded in mystery as there could well be a political angle to it. Saren, a school teacher and a Congressman, had come out openly against the dan custom and had attended meetings in which the custom had been roundly denounced. But the second murder, on June 26, committed in Bar-

dohi, had as its victim an innocent villager Lakshman Tudoo who was mistaken for Sudhir Tudoo and done to death. The villagers promptly identified Sudhir and his friend Milan as the murderers. It is only during the pujas that these two young men, whose only crime was that they had challenged the barbarous dan customs, were released on bail.

Among the young men who lead the upsurge against the dan custom, Mahadev Hansda and Baliswar Saren were attacked by villagers when they were returning from a meeting at Damjuri. There were two murderous attempts on the young writer Maheswar Besra of Raina, on May 3 and then on August 25. On June 23 an armed mob surrounded Saroda Prasad's house and the poet had to flee for his life with the help of a few sympathetic villagers. After a week he was able to evade a gang of armed men lying in wait for him on his way back from Gopalpur village. For a week Saroda Prasad could not return to his village. Even to this day the frail, thin poet can be seen only with an escort armed with bow and arrows, who is usually Chakradhar, the man who challenged the elders at the mahalgira.

Though the setting up of a police camp at Jamthoria, coupled with the efforts of the officer-in-charge of the police station there, Mr Ram Kumar Mondal, have brought about a modicum of peace to the villages, the calm is uneasy. The antagonists of the dan custom, youngsters all, and its protagonists are clearly divided into two hostile groups. Mr. Mondal's attempt to bring them together and talk the matter over has hitherto been fruitless.

In the meantime, in Purulia and Jhilimili political parties have held huge rallies to impress the people with their capacity to collect crowds at short notice. The Jharkhand Mukti Morcha's rally' in Purulia was addressed by leaders like Siba Saren and Vinod Mahato. At the Jhilimili rally of the ruling left front, four ministers and three district committee secretaries of the CPI (M), took their turns to

exhort the adivasis to come to the aid of the front. The leaders were silent about what was happening in the nearby villages. For them the struggle against the dan system was as good as non-existent. Thereby hangs a tale which has to be told in some detail.

THEY SHALL OVER COME

The Santhal villages of Purulia are in the throes of a social ferment. Arraigned against progress is the entire oppressive mechanism of society, ruled by village elders held together in awe of the supernatural. But the battle lines between them and the forces of progress represented by Saroda Prasad and his young lieutenants extend beyond the narrow periphery of the isolated settlements. By acts of omission and commission the administration of the state and the political parties have without exception, joined forces with the obscurantic elements, forging the fetters of the community.

In the concluding part of his report on witch hunting in Purulia villages, G. V. Nair examines the roles played by the government, the political parties.

Indeed, the bleak and barren landscape of Purulia provides a fitting backdrop of medievalism congenial to primitive customs which still hold the community in thrall. Devoid of any trace of developmental activity, this penumbra region seems not to occur to the minds of ministers and planners when they divide the annual plan outlay of the state. The village is which Saroda Prasad lives, Darika Doba, for instance, is at least 12 kilometres away from a pucca road ; one has to trudge along an apparently interminable kutcha road, wade across two rivulets and lose one's way at least once in the desolate countryside to reach the village—unless one is rich enough to hire a jeep at Bandoan. In monsoon, when the village

roads turns muddy and the rivers swell and overflow the banks, the entire area remains inaccessible for weeks. The junior school at Jamtodia, an inheritance from the erstwhile Manbhum district of Bihar to which the region belonged before the state reorganisation in 1954, has ever since remained junior. The school itself, set amidst paddy fields between Jamtodia and Chottodanga, has no roof and is open unto the sky. The walls, in an advanced state of dilapidation, have let weeds grow from its cracks. Classes, if and when held, take shelter under the mango trees that grow on the school near Mukundpur but there is not a single inmate there, the reason being that for months together no student stipend has been forthcoming from the tribal welfare department. The file apparently got stuck somewhere in the maze of Writers Building and the tribal boys went back to their fields and buffalo herds. There is a health centre at Chirudi on the edge of the forest that separates the village from Kaira where lives Mahadev Hasda, the editor of Tetre and Saroda Prasad's most trusted lieutenant. The centre's gate, doors and windows are permanently shut and the compound is the favoured grazing ground of cattle. No doctor or nurse has ever been in the vicinity of the health centre for years.

Set against this background the stranglehold of the dan custom among the tribals is easily understandable, though not supportable- Denied the fruits of education and deprived of elementary medical care, no wonder the tribal mind is still bogged down by a tradition that attempts to explain his misery as the handiwork of a witch in their midst. That at least gives the tribal an explanation, albeit a wrong one. And the government and those in whom power is vested, indifferent to their fate, have not tried hitherto to give them an alternative rationale.

The same callousness of the government is again clearly perceived in the state of the local thana, housed in an abandoned godown In an area where violent clashes have claimed lives and school teachers are on the run for their lives the police station boasts a strength of four constables, three muskets and two cycles to enforce law and

order. The dingy room which serves both as he armoury and the living quarters for the officer-in-charge cannot possibly accommodate any law offender under custody. The two men charged with attempt to murder Maheswar Besara of Raina village, for instance, at night broke open the windows and fled. They are yet to be tracked down. Ramkumar Mandal, a conscientious police officer who tries hard to mediate between the belligerent parties in the dan affair, frankly confessed that he would think twice before apprehending criminals. "Where can I keep them for a night or two ? If I fail to catch them it is merely a dereliction of duty. But if they flee carrying the rifles I lose my job. Tell me what am I to choose between the two ?"

The Left Front government of West Bengal, constituted of parties that flaunt their revolutionary rhetoric as does the fabled crow a peacock's tail, cannot, in all fairness, be accused of being oblivious of the anti-dan movement in Purulia. As a matter of fact, the tribal welfare department presided over by Sambhu Mandi, the communist minister, himself a Santhal, has printed ten thousand posters, exhorting the people to give up this superstitious belief in witch-hunting Our two visits to Purulia and week-long tours in the villages, however, gave us no inkling of this propaganda drive by the state government. This "mystery of the missing posters," unseen in the villages where the struggle between progress and reaction has assumed such deadly dimensions, are packed and kept in Writers Building under the benign care of bureaucrats, much to the puzzle of lower minions, one of whom has let out the story. The poster depicts a horrorstricken woman and bears the legend. "Witch-hunting is a punishable offense", as also a rhetorical question intended for the tribals, "Is this torture necessary ?" The posters, the informant tells us, were prined at least four months ago, but not a single one of them has been seen anywhere in Purulia. We await a denial from a government spokesman, for whose benefit a facsimile of the poster is printed along with the report

Mahadev Hasda, himself a disillusioned Janata Party worker, says that those who are in the thick of a struggle against the dan custom have only found a hostile reception from the four political parties in the district He had in fact written to the district leaders of the parties soliciting their support to their struggle. The Congress (I) and the Marxist Communist Party, the big two, did not even care to answer his letter. Engrossed as they are in national and international issues of great moment, their lack of concern for a local issue indeed behoves them. The Jharkhand Mukti Morcha, more forthright, asked all those who fight against the dan custom to come under the party, "carrying the green flag and arrows". The Jharkhand party calmly gave the counsel that as these young men had offended the sentiment of the communists and challenged and challenged the validity of social customs they should be prepared to suffer the consequences themselves.

The local leaders we met all had the same thing to say. Ramdas Baskay, the CPI (M) panchayat member, said he personally did not believe in dans. But since most people believed it, it would not be advisable to start a campaign right now. When a fatal flaw in his argument was pointed out, namely the communists had campaigned against the Congress when most people had faith in the latter, he had no answer other than a sheepish smile. We did not press the matter as we had been told by reliable sources that this self same Baskay had addressed a meeting at Badabandh when he openly attacked Saroda Prasad and others and upheld the sanctity of customs like dan.

In another village we met Sital Hembrum, the Congressman who himself had once been attacked by an angry mob as he was the uncle-in-law of Sudhir Tudoo. Sital Babu was also against the dan custom but had not attended any meeting convened by those opposed to it. At Kaira village we ran across Gumasta Saren, the Jharkhand Party worker. His party is yet to make up its mid about the dan custom and therefore he had nothing to say at the moment. How one wished these small town politicians had confessed that their

party bigwigs did not want any trouble in the election year—dan or no dan. The fight against social evils wait, but not preparations for the coming parliamentary elections—and who is foolish enough to rub the village elders on the wrong side at this critical juncture ? Mahatma Gandhi or A. K. Gopalan might have entered temples reserved for the upper castes in the company of Harijans way back in the '30s, but that was a long time ago and moreover they had no election to worry about.

In the fading light of a lantern the face of Saroda Prasad, rugged and worn out but dominated by two deepset eyes staring into the emptiness, was calm and impassive as he listened to the report of our encounters with the politicians. Baliswar, Maheswar, Sudhir and Chakradhar, the last named with bow and arrows, were all there sitting on their haunches on the floor and looking at their leader lovingly. Saroda Prasad himself was a Congressman but that was a long time ago before Congressmen turned candidates for assembly seats. Then he said, "Many years ago in this village Biru Hasda's widow Panmani Hasda was declared a dan and was being stoned by angry villagers. Her body bruised and cloths torn, she was crying out in helpless agony. A boy stood there watching. It was me. Suddenly rage was on me and I ran to her. They pulled me aside but I kept trembling for a long time at the very thought of Pan mani, mother of two". The rage was still there in him and he has transmitted it to the younger generation of Santhals who will have no rest for a forseeable future. We were deeply moved by the old poet's faith in his people's capacity for rage, which alone is the guarantee for progress. We also remembered the faces of Santhal boys and girls, the bashful face of the girl Upal in Kaira and the eager, intelligent face of Vishan in Mukundpur, who will carry on the struggle to its final outcome of victory.

জরিজই দরিদ্রের শোষণের যন্ত্র, কবি লেখকরা আক্রান্ত

এখন চলছে হত্যা ভিটে থেকে উচ্ছেদ*

[তিন কিস্তিতে লেখাটি প্রকাশিত হয়। এখানে শ্রীআফরোজের মূল বক্তব্যের সংক্ষিপ্ত অংশ ছাপা হচ্ছে।]

সাংবাদিক নাজেস আফরোজ বলেন—যে দেশের গ্রামাঞ্চলে শতকরা আশিভাগ মানুষের দারিদ্র্যসীমার নীচে বাস, একবেলার খাবার যাদের জোটে অতি কষ্টে, যে দেশে আদিবাসী মেয়ে ধর্ষিতা হলেই সংবাদপত্রের পাতায় সংবাদ হিসাবে স্থান পায়, দেশে সমাজতান্ত্রিকতার মুখোশ পরে একনায়কতন্ত্র এবং মার্কসিজমের ভেক ধরে যে সুবিধাবাদী আমলাতন্ত্র সহবাস্থান করে, যে দেশের এক নাগরিক মহাকাশে গেলেও গরুর গাড়ি এখনও যে দেশের প্রধান যান সে দেশে অশিক্ষিত ও কুসংস্কারাচ্ছন্ন সাঁওতাল আদিবাসীদের মধ্যে ডাইনী হিসেবে বছরে গুটিকয়েক খুন হবে বা চলবে অকথ্য অত্যাচার তাতে আশ্চর্যের কিছু নেই ...। যখন দেখি যে অনেক কষ্ট স্বীকার করে জ্ঞানের আলোকে প্রকৃতই আলোকিত কিছু সাঁওতাল নিজেদের সমাজে এই বর্বর ও অমানবিক প্রথার উচ্ছেদে সচেষ্ট এবং প্রশাসনিক অকর্মন্যতা ও রাজনৈতিক দৈন্যতার কারণে তাঁদের জীবন বিপন্ন তখন ছুটে যেতেই হয়...। পঞ্চাশের শেষ কোঠায় পক্ককেশ মানুষটি এক অবর্ণনীয় অমায়িক ও সরল হাসি দিয়ে অভ্যর্থনা করলেন। রাত্রে সারদাবাবুর বাড়িতে বসেই কথা হল সারদাবাবুর সঙ্গে ...।

সাঁওতালরা শিক্ষাদীক্ষায় অনেকটা এগিয়ে তবুও এই শিক্ষা-দীক্ষায় প্রসার যেহেতু মাত্র এক প্রজন্মের সেহেতু এদের মধ্যে শিক্ষিতের হার সামান্য বেশি হলেও. কুসংস্কার কাটেনি এখনও। কিছু শিক্ষিত স্কুল শিক্ষকও ডাইনীতে বিশ্বাস করেন, যান ওঝার কাছে ডাইনী ধরার জন্য. অবশ্য এতে আশ্চর্য হওয়ার কিছু নেই। বাংলার নবজাগরণের ১০০ বছরেরও পর অন্তত চার প্রজন্ম ধরে বৈজ্ঞানিক মতে শিক্ষিত ভদ্রলোকেরাও কখন অসুখ-বিসুখে কোন পীরের দরজায় মানত দেন বা জলপড়া খান কোন এক বাবার বিভূতি গ্রহণ করেন তখন সদ্য শিক্ষিত এই সাঁওতাল সম্প্রদায় ওঝার কাছে যেতেই পারেন।

যে ঘটনা উল্লেখ করছি—তা আপাত সরল হলেও তার মূল কিন্তু অনেক গভীরে বিস্তৃত। এবং তার ইতিহাসেও বড় তেতো। এ দেশেরই আদি বাসিন্দা হয়েও যারা নিজেদের জমি থেকে উৎপাটিত, অরণ্য থেকে বিতাড়িত, তথাকথিত সভ্য সমাজের কাছে যারা অসভ্য ও মিউজিয়াম পিস মাত্র, কয়েকশ বছর ধরে যারা অর্থনৈতিক দিক দিয়ে অবর্ণনীয়ভাবে শোষিত ও লাঞ্ছিত তাদের এইসব আদিম প্রথা দেখে আমরা সভ্য জগৎ শিউরে উঠলেও আসলে এর শিকড়-বাকড় ছড়িয়ে রয়েছে এই শোষণের ইতিহাসের মধ্যেই।

—

'সখা' সন্ত্রাস ॥ দুই সাঁওতালকে খুঁজছে আততায়ীরা ॥*

মধ্যযুগীয় ডাইনী-প্রথা না মানার অপরাধে ঘাতকদের মুখোমুখি হতে হচ্ছে দুই সাঁওতাল তরুণকে। শুধু দুই তরুণ নয়, তাদের পাশে যাঁরা আছেন, সেই সঙ্গী বা সমর্থকদের জীবন আজ অনিশ্চিত। গত ৮ মার্চ আজকালের 'প্রিয় সম্পাদক' কলমে লেখিকা মহাশ্বেতা দেবীর একটি চিঠি ছাপা হয়। তিনি আবেদন করেছিলেন 'নিরপরাধ', বিবেকবান দুই তরুণকে সাহায্য করার। মহাশ্বেতা দেবীর এই 'দুই তরুণ'ই হলেন সুধীর এবং মিলন টুডু। বরদহি গ্রামের দুই সাহসী। আজকালে চিঠিটা প্রকাশিত হবার ক'দিন পর ১৩ মার্চ রাতে আততায়ীদের খপ্পর থেকে কোনমতে পালিয়ে বাঁচেন সুধীর ও মিলন। তাঁদের খুন করতে সে রাতে প্রায় একটা জহ্লাদ বাহিনীই নেমে পড়েছিল। এরপর ২৫ মার্চ দুই সাঁওতালী যুবকের এক আকুল চিঠি এসে পৌঁছয় আমাদের হাতে। ১৩ তারিখ রাত্তিরে কীভাবে তাদের হত্যা করার চেষ্টা হয়েছিল—ঐ চিঠিতে তার সংক্ষিপ্ত বিবরণ ছিল। ঘটনাটা বিশদভাবে জানার জন্য চিঠিটি হাতে নিয়েই রওনা হলাম বরদহির দিকে। দক্ষিণ পুরুলিয়ায় দুর্গম প্রত্যন্তের 'বরদহি' মানবাজার ২নং ব্লকের ছোট্ট একটি গ্রাম। ২৯ মার্চ 'ভোররাতে রওনা হয়ে সকাল সাড়ে ন'টা নাগাদ জঙ্গলের পথ ধরে যখন পৌঁছলাম বিশিষ্ট সাঁওতালী কবি সারদাপ্রসাদ কিসকুর বাড়ি, মিলন আর সুধীর টুডু তখন সেখানেই ছিলেন। আলাপ পরিচয়ের পালা শেষ হবার পর ওঁরা বললেন, রোজ রাতেই আমরা এখানে চলে আসি। আতঙ্ক এখন আমাদের গ্রাস করেছে।

● কী হয়েছিল সেদিন? ১৩ মার্চ? সুধীর জবাব দিলেন: 'সেদিন আমরা দুজন পুরুলিয়ার বাসে উঠেছিলাম। বড়গোড়িয়ায় বাসটা যখন পৌঁছল, রাত তখন প্রায় সাড়ে ন'টা। হাঁটা শুরু করলাম। হঠাৎ দেখি পেছনে মোটর-সাইকেলের আলো। চটপট রাস্তার ডানদিকে আলের ধারে চলে গেলাম। একটু পরেই আবার একটা জিপ। অন্ধকারেই বুঝলাম লোকভর্তি। ফের সরে গেলাম আলের দিকে। পাঁচ মিনিটের মধ্যে আবার একটা গাড়ি। সন্দেহ হল নিশ্চয়ই ওরা আমাদের খুঁজে বেড়াচ্ছে। কোনমতে লুকিয়ে সে রাতে বাড়ি চলে আসি। একটুর জন্য প্রাণে বেঁচে গেছি।

সুধীর ও মিলনের অপরাধ কী? সাঁওতাল হয়েও ডাইনী প্রথাকে ওরা মানেন না। প্রকাশ্যে প্রতিবাদ করেন। তাই সাঁওতাল সমাজের এক প্রভাবশালী গোষ্ঠীর মতে ওঁদের বাঁচারই অধিকার নেই। ১৯৮৪ সালে দীর্ঘকাল যাবৎ অসুস্থ লড়িরাম টুডুকে নিয়ে ঘটনার সূত্রপাত। সে বছর ৬ মার্চ জোড়বাঁধ গ্রামের 'লীলু সখা' 'ভাও' করল গ্রামের ললিন টুডুর স্ত্রী ফুলমণি টুডুকে। সামাজিক প্রথা অনুযায়ী ললিন জরিমানাও দিলেন। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে বাঁকুড়া জেলার কোনও এক সখার কাছে

আবেদন জানালেন এই রায়ের বিরুদ্ধে। বাঁকুড়ার সখা এরপর যাকে ডাইনী সাব্যস্ত করে, গ্রামের লোকেরা তাকে পছন্দ করেনি। ফলে তারা মানবাজার ২নং ব্লকের গ্রাম রয়নার থেকে সূর্য বেশরা নামে এক নামী সখাকে নিয়ে আসে তৃতীয়বার বিচারের জন্য। সূর্য এসে ডাইনী করল সুধীর টুডুর স্ত্রী নীলমণি টুডুকে। শুনে সুধীর তো খেপে লাল। তিনি সরাসরি জানিয়ে দিলেন এসব কুপ্রথা তাঁর বিশ্বাস নেই। সুধীরের ভাগ্নীজামাই প্রাক্তন কংগ্রেস এম. এল. এ. শীতল হেমব্রমও ঘটনার দিন গ্রামে উপস্থিত ছিলেন। তাঁর আত্মীয়কে 'ডাইনী' করেছে শুনে তিনিও এর বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ান। নেমে পড়েন প্রচার অভিযানে। ঐ ঘটনার পর গ্রামময় তাঁরা রটনা করে দিলেন ডাইনী দিয়ে কিছু হবে না, লড়িরাম টুডুকে অসুখ সারাতে কোনও ভাল হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া উচিত। শুনে ক্ষিপ্ত হয়ে উঠল সখার দল। ১৯৮৪'র ১৬ মার্চ গ্রামের মোড়ল এক গ্রামসভা ডাকেন। সেখানে বিচার হল সুধীরের। তথাকথিত ঐ বিচারসভায় দাঁড়িয়েই সুধীর শীতল এবং চক্রধর টুডু নামে আর এক গ্রামবাসী বুক ফুলিয়ে নির্ভয়ে ঘোষণা করলেন, এসব ভূত-প্রেত ডাইন তাঁরা মানেন না। বলার সঙ্গে সঙ্গেই আক্রমণ। সখার দলবল সভার মধ্যেই ঝাঁপিয়ে পড়ে ওঁদের ওপর। চলতে থাকে বেদম লাথি, সাইকেল চেনের বাড়ি আর জুতোপেটা। মার খেয়ে চন্দ্রধরের নাক ফেটে দরদর করে রক্ত পড়তে থাকে। তবু তাঁরা দমেননি। আহত চক্রধরকে ভর্তি করা হল জামতোড়িয়ার প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্রে ক্ষিপ্ত সখার দল এটুকুতেই শান্ত হবার পাত্র নয়। সেদিন রাতেই তারা অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে চড়াও হয়েছিল সুধীরের বাড়ি। আততায়ীদের মতলব আগে থেকে আঁচ পেয়ে পিছনের দরজা দিয়ে পালিয়ে গিয়েছিলেন সুধীর। হিংস্র আততায়ীরা বাড়িতে ঢুকে অন্ধকারে ঠাহর করতে না পেরে লক্ষ্মণ টুডু নামে নিরীহ একজনকে কুপিয়ে মারল। তারপর ছুটল ডাইনী-বিরোধী আন্দোলনের নেতা সারদাপ্রসাদ কিস্কুর বাড়ি। গ্রামের লোক ও সারদাবাবুর বাড়ির মেয়েরা বাধা দেওয়ায় ওঁকে চট করে তুলে আনা অবশ্য সম্ভব হয়নি। টানহেঁচড়া চলতে চলতেই খবর পেয়ে ছুটে আসেন জামতোড়িয়ার ওসি। সঙ্গে পুলিস বাহিনী। ফলে সেযাত্রা কোনমতে বেঁচে যান। রয়নাগ্রামের সখা সূর্য বেশরাকে গ্রেপ্তার করে নিয়ে যায়। পরদিনই ১৭ মার্চ সখার দলের প্রায় ৩০০ লোক তীরধনুক টাঙ্গি নিয়ে ধামসা মাদল বাজাতে বাজাতে জামতোড়িয়া পুলিস ফাঁড়ি ঘেরাও করে স্লোগান দিতে থাকে, 'আদিবাসীদের সামাজিক প্রথায় পুলিসী হস্তক্ষেপ চলবে না।' সুধীরের বন্ধু মিলন টুডুও সামাজিক প্রথার বিরোধী। ঘটনার দিন মারার পরিকল্পনা ছিল তাঁকেও। ওঁদের না পেয়ে ভুল করে লক্ষ্মণ টুডুকে খুন করার পর সখার লোকজন গ্রামে প্রচার করে দেয় লক্ষ্মণকে সুধীর আর মিলনই মেরেছে। পুলিস সুধীর আর মিলনকে গ্রেপ্তার করে কোর্টে চালান করে। ২৭ জুন '৮৪ থেকে তারা পুরুলিয়া জেলে আটক ছিল। অষ্টমী পূজোর দিন ছাড়া পায়। প্রথমে তাঁরা বাড়িতে যেতে পারেনি। সারদাবাবুর বাড়িতে

এসে উঠেছিল। এখন গ্রামের বাড়িতে দিনের বেলায় থাকে। রাতের ব্যবস্থা অন্যত্র। এই ঘটনার পর থেকে সারদাবাবু, মহেশ্বর বেশরা, মহাদেব হাঁসদা, মনোহর কিসকু, মন্মথ বাস্কে প্রভৃতি লেখক, কবি, সাহিত্যিক ও শিক্ষকদের বারবার প্রাণনাশের চেষ্টা চলছে। কিছুদিন আগে সারদাবাবুর পুকুরের মাছ চুরি হয়ে যায়। সারদাবাবুর সঙ্গে যাঁরা আছেন সংখ্যায় কম বলে প্রতিরোধ করার ক্ষমতা তাঁদের নেই। রাতে অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে সারদাবাবুর বাড়ির আশপাশে লোক ঘুরে বেড়াচ্ছে। বাড়ির চালে পাথর ফেলছে। এই প্রতিবেদকও চালে পাথর ছোঁড়ার সাক্ষী।

সুধীর ও মিলনের কেস নং ১০২৬। পুরুলিয়া কোর্টে কেস চলছে। এদের পক্ষের উকিল অরূপরতন ভট্টাচার্য। পাঁচ বছর পর কেস আবার কোর্টে উঠেছে। কেস চালানোর জন্য ৬০০০ টাকা প্রয়োজন বলে জানিয়েছিলেন উকিলবাবু। সুধীর ও মিলনের অবস্থা খুবই খারাপ। এই টাকা সংগ্রহ করা তাদের পক্ষে অসম্ভব। সারদাবাবুর মারফত কলকাতার বুদ্ধিজীবীদের কাছে তাঁরা আবেদন করেছিলেন অর্থ সাহায্যের জন্য। আজকালের 'প্রিয় সম্পাদক' কলমেয় মারফত মহাশ্বেতা দেবীর ডাকে প্রচুর সাড়া মিলেছে। সাংবাদিক বিক্রমণ নায়ার, নিরঞ্জন হালদার, মহাশ্বেতা দেবী ও প্রতিবেদক নিজেরা ৯০০ টাকা দিয়েছেন। এছাড়া বিভিন্ন প্রান্ত থেকে বিভিন্ন মানুষ প্রচুর টাকা পাঠিয়েছেন। উকিলের খরচাও চালাবেন বলে তাঁরা জানিয়েছেন। সুধীর নানা আশ্বাস পেয়ে গ্রামে ফিরে গেছে শনিবার। আগামী ৮ এপ্রিল আবার কেস কোর্টে উঠবে। এই কেসে সুধীরের পক্ষে প্রধান সাক্ষী সারদাবাবু। তাই চেষ্টা হচ্ছে সারদাবাবুকেও মারার।

এলাকায় ঘুরে দেখলাম পরিস্থিতি ভয়ানক। সুযোগ পেলে যে কোন মুহূর্তে ডাইনী প্রথার বিরোধীদের জীবন বিপন্ন হতে পারে।

'ডাইনী' লক্ষ্মণ টুডু হত্যা মামলা

৬ বছর পর বেকসুর খালাস পেল সুধীর-মিলন*

৬ বছর ধরে ঝুলে থাকা মিথ্যা অভিযোগে আনা একটি খুনের মামলার অবসান হল। বেকসুর খালাস পেল দক্ষিণ পুরুলিয়ার বড়দহি গ্রামের দুই বিবেকবান নিরপরাধ সাঁওতাল যুবক সুধীর ও মিলন টুডু। এদের দুজনের বিরুদ্ধে অভিযোগ ছিল ঐ গ্রামেরই বাসিন্দা লক্ষ্মণ টুডুকে হত্যা করেছে ওরা দুজন। ঘটনাটি ছিল ১৯৮৪ সালের। দক্ষিণ পুরুলিয়ার মানবাজার ২নং ব্লকের অধীনে বড়দহি

গ্রামের দুই তরুণ সুধীর টুডু ও তাঁর কাকা মিলন টুডু ডাইনীর অস্তিত্ব মানে না। ডাইনী ধরার নামে সর্বস্বান্ত করা, হত্যা করা বা জরিমানা বাবদ বহু টাকা আদায় করার বিরুদ্ধে তারা জেহাদ ঘোষণা করেছিল। তাদের এই জেহাদ সখার দলের মনঃপুত না হওয়ায় গ্রামের মোড়ল বা মাঝিকে দিয়ে একটা সভা ডাকে ওদের দুজনের বিচারের জন্য। সভায় সিদ্ধান্ত নেওয়া হয় সুধীর ও মিলনকে শায়েস্তা করতে হবে। জরিমানা দিতে হবে। সুধীর গাঁয়ের লোকেদের এসব বিচার না মানায় তাকে কেটে ফেলার তোড়জোড় চলে। একদিন সুধীরকে কেটে ফেলার জন্য ডাইনীর অস্তিত্বে বিশ্বাসী পক্ষের দল ওর বাড়ি আক্রমণ করে। কিন্তু সুধীর বাড়িতে না থাকায় হৈ চৈ হট্টগোলের মধ্যে সুধীরের বদলে টাঙ্গি দিয়ে গ্রামের এক নিরীহ মানুষ লক্ষ্মণ টুডুকে কেটে ফেলে। সুধীরের বদলে অন্যকে মেরে ফেলা হয়েছে, তা পরের দিন সকালে জানতে পেরে খুনীর দল উপায় না দেখে রটিয়ে দেয় যে লক্ষ্মণকে সুধীর ও মিলনই খুন করেছে। পুলিস সুধীর ও মিলনকে গ্রেপ্তার করে পুরুলিয়া জেলে চালান করে। দণ্ডবিধির ৩০২ ধারায় ওদের বিরুদ্ধে খুনের অভিযোগ আনা হয়। এরপর কয়েকদিন পুরুলিয়া জেলে রেখে ১৯৮৪ সালের অষ্টমী পুজোর দিন ওদের ছেড়ে দেওয়া হয়। কেসও ধামা চাপা পড়ে। ৬ বছর পরে হঠাৎ আবার কেস মাথাচাড়া দিয়ে ওঠে। ওদের কেস নং ১০২৬। গত কয়েকমাস ধরে ঐ দুর্গম অঞ্চল থেকে ওরা যাতায়াত করত পুরুলিয়া কোর্টে।

সাংবাদিক বিক্রমণ নায়ার, নিরঞ্জন হালদার, মহাশ্বেতা দেবী ও এই প্রতিবেদকের কাছে চিঠি লিখে আবেদন জানায় সাহায্যের। মহাশ্বেতা দেবী আজকালের মাধ্যমে দেশের জনসাধারণের কাছে ওদের দুজনের সাহায্যের জন্য আবেদন করেন। দেশের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে বহুটাকা সাহায্য আসে। বিভিন্ন সময়ে খেপে খেপে ঐ টাকা তাদের তুলে দেওয়া হয়। উকিল অরুণরতন ভট্টাচার্য অবশ্য পরে তাঁর ফি নেননি। বিনা ফিতে তিনি এবং জুনিয়র নন্দলাল সিংহানিয়া এই কেসে অভিযুক্তদের পক্ষ সমর্থন করেন। ১৪ জুন ছিল রায় দেবার দিন। ১৩ জুন রাত্রে সুধীর ও মিলন তাদের গ্রাম থেকে পুরুলিয়ায় চলে আসে। ৭ মে মহাশ্বেতা দেবী সারদাবাবুর বাড়ি গিয়েছিলেন সংগৃহীত আরও কিছু টাকা নিয়ে। সেই সময় তিনি ব্যবস্থা করে এসেছিলেন ১৪ জুন সুধীর ও মিলন পুরুলিয়ায় গেলে তাদের প্রাথমিক নিরাপত্তার। স্থানীয় সাংবাদিক দায়িত্ব নিয়েছিলেন ওদের নিরাপত্তার। ১৩ তারিখ পুরুলিয়ায় পৌঁছান মাত্রই বাস স্ট্যাণ্ড থেকে মুন্সেফ ডাঙায় 'শ্যাম' ধর্মশালায় ওদের এনে রাখা হয়। সুধীর ও মিলনকে গ্রাম থেকে আগলে নিয়ে এসেছে বড়দহি, গোলাপাড়া, বড়গড়িয়ার, বিপিন টুডু, ফকির সরেন, ভুটি মাণ্ডি, মনোহর কিসকু, চিন্তাহরণ মাহাতো, শশধর মাহাতো। যাইহোক, দায়রা বিচারক দীনদয়াল সিনহা আসন গ্রহণ করেই পড়া শুরু করলেন পুরো মামলার নথিপত্র, সাক্ষ্যপ্রমাণ। মাঝে মাঝে

'কোয়ারি' করে ঠিক আছে কিনা জিজ্ঞেস করলেন উকিল অরূপবাবুকে। তিনি সম্মতি জানালেন বিচারক রায় পড়ে শেষ কথা বললেন 'খালাস'। আসন ছেড়ে উঠে দাঁড়ালেন এবং চলে গেলেন। সুধীর-মিলন এবং সঙ্গের লোকদের তখন আত্মহত্যা অবস্থা। সুধীর-মিলনকে নিয়ে উকিল অরূপবাবুর ছবি তোলা হল। এই কেসে অরূপবাবু অসমান্য ভূমিকা নিয়েছেন। পাশাপাশি অন্যান্য উকিলেরা ছিলেন পাবলিক প্রসিকিউটর মনোরঞ্জন রায়, নন্দলাল সিংহানিয়া ও ল'ক্লার্ক তারাপদ মাহাতো সুধীর ও মিলন কেসে জিতেছে ঠিকই কিন্তু ভয় তাদের যায়নি। এই মুহূর্তে তাদের অন্য ভয় আবার নতুনভাবে দেখা দিচ্ছে।

পুরুলিয়ায় ডান-বিরোধী সংগ্রামের তীব্রতা বাড়ছে*

পুরুলিয়ার মানবাজার ও বান্দোয়ান এলাকার আদিবাসী সাঁওতাল পল্লীগুলিতে ডাইনি-প্রথা বিরোধী অভিযানের তদন্ত করেছিলাম গত এপ্রিল মাসে। দেখে এসেছিলাম সেখানে বরেণ্য সাঁওতাল কবি সারদাপ্রসাদ কিসকুর নেতৃত্বে তরুণের দল এই প্রাগৈতিহাসিক দুঃসহ কুপ্রথার বিরুদ্ধে সংগ্রামে লিপ্ত। পাঁচ মাসের পর এই পুজোর ছুটিতে আবার গেলাম ওই অঞ্চলে। কায়রা, জামতোড়িয়া, মুকুন্দপুর, দাঁরিকাডোবা, ছোটরাঙ্গা, রয়না প্রভৃতি গ্রামে ঘুরে মনে হল এই কয় মাসে সংগ্রামের তীব্রতা আরও বেড়েছে এবং আরও হিংসাত্মক রূপ নিয়েছে।

একদিকে পরিবর্তনপন্থী মহাদেব হাসদা, বালিশ্বর সরেণ, মহেশ্বর বেশরা প্রমুখের কার্যক্রম যেমন আরও ব্যাপক হয়েছে তেমনি ডাইনী প্রথায় বিশ্বাসী রক্ষণশীলদের প্রতিক্রিয়াও হয়েছে আরও মারমুখী, আরও হিংস্র। মাঝের সময়টুকুতে কলকাতার পত্রপত্রিকার প্রচার অভিযান, পিপলস ইউনিয়ন অফ সিভিল লিবার্টিজ-এর উদ্যোগে কলকাতায় অনুষ্ঠিত ডাইনী-প্রথা বিরোধী সভা এবং মুখ্যমন্ত্রীকে দেওয়া তাঁদের স্মারকলিপিতে এই প্রথাকে আইনত দণ্ডনীয় করার দাবি জানানো হয়েছে—এই সবের ঢেউ দেখলাম সজোরে আছড়ে পড়েছে সুদূর এই সাঁওতাল পল্লীগুলিতে। ইতিমধ্যে এই নিয়ে খুন হয়েছে দুজন। বড়দহি গ্রামের লক্ষ্মণ টুডু ২৬ জুন নিহত হন। ঘটনাকে বলা চলে এই প্রথার সঙ্গে প্রত্যক্ষভাবে জড়িত। ৩০ মে পাড়রা গ্রামে খুন হন জাগরণ সরেন। জাগরণ একাধারে কংগ্রেস কর্মী ও ডান-প্রথা বিরোধী অভিযানের শরিক। কাজেই তার হত্যার পিছনে কোনও শক্তি কাজ করেছে তা নিশ্চিত করে বলা শক্ত। এ ছাড়া, সারদা কিসকুর অনুগত ও ডাইনী-বিরোধী কর্মী মহেশ্বর

বেশরার জীবননাশের চেষ্টা হয় দুই দুইবার। প্রথম ৩০ মে, দ্বিতীয়বার ২৫ আগস্ট। সারদাপ্রসাদ কিসকুর দাঁড়িকাডোবা গ্রামের বাড়িতে তীর ধনুক নিয়ে এক মারমুখী জনতা চড়াও হয় ২৩ জুন। এই শিক্ষক কবিকে বাড়ি থেকে পালিয়ে গিয়ে প্রাণ বাঁচাতে হয়। ঠিক পাঁচ দিন পরে গোপালপুর গ্রামের কাছে আর একদল অস্ত্রধারী আততায়ীর দল অপেক্ষা করেছিল সারদাবাবুর জন্য। উনি অবশ্য ওদের চোখ এড়িয়ে নিরাপদ জায়গায় যেতে পেরেছিলেন ও সপ্তাহকাল সেখানে আত্মগোপন করেছিলেন।

এখন অবস্থা বেশ থমথমে। এই তরুণ কবি, সাহিত্যিক বা বুদ্ধিজীবীরা যথেষ্ট সাহসী, কিন্তু ওদের অনেকেই সশস্ত্র দেহরক্ষী ছাড়া বাড়ির বাইরে বড় একটা বেরোয় না। অদম্য এঁদের মনোবল ও নিজেদের উপর প্রচণ্ড আস্থা—আস্থা এঁদের ভবিষ্যতের উপর। যদিও প্রাচীনপন্থী বয়স্করা সবাই এঁদের বিরুদ্ধে তবু এঁরা জানেন স্কুল-কলেজে শিক্ষারত তরুণ ও গ্রামের নব্যশিক্ষিতদের সমর্থন এঁরা পাবেনই। এবং ডান-প্রথা আর বেশি দিন নয়।

বিস্ময়ের কথা এই যে, ডান-প্রথা বিরোধী সংগ্রামীদের সঙ্গে কোনও রাজনৈতিক দল নেই। বরং এই প্রথার বিলোপসাধনের আলোচনা করতে গিয়ে দেখলাম কংগ্রেসী শীতল হেমব্রম, মার্কসবাদী রামদাস বাস্কে ও ঝাড়খণ্ডী নেতা গোমস্তা সরেনের কথা প্রায় একই সুরে বাঁধা। তাঁরা বলেন, 'আমরা সবাই ব্যক্তিগতভাবে এই কুপ্রথা নিশ্চয়ই সমর্থন করি না। তবে যেহেতু এটি একটি প্রাচীন সামাজিক প্রথা; এর বিরুদ্ধে অভিযান খুব ধীরে, ভেবেচিন্তে করতে হয়। এটাও শোনা গেল যে, বামপন্থী সরকার নাকি এই প্রথার বিরুদ্ধে প্রচার অভিযানে নামবেন এবং তার জন্য পোস্টার ছাপা হয়ে কলকাতায় মহাকরণে জমা করা হচ্ছে। কিন্তু সে পোস্টারগুলি মহাকরণের দেওয়াল-গুলি অলংকৃত করবে, এই পল্লীগ্রামে পৌঁছবে না—এটা প্রায় নিশ্চিতভাবেই বলা যায়। কারণ আছে, তরুণদের অনেকেরই ভোট নেই। আর যাদের ভোট আছে সেই সব প্রাপ্তবয়স্কদের আর মোড়লদের এই নির্বাচনী বৎসরে চটানো রাজনৈতিক বুদ্ধিমত্তার পরিচায়ক হবে না। ডান-প্রথা বিরোধী আন্দোলনের অক্লান্ত কর্মী এবং 'তেতরে' মাসিক পত্রিকার সম্পাদক যুব কবি মহাদেব হাঁসদা দুঃখ করে বললেন, সাঁওতালদের সাংস্কৃতিক সংস্থা 'আদিবাসী সমাজের' তরফ থেকে উনি পত্র দিয়ে জেলার চারটি প্রধান দল—কংগ্রেস, সি. পি. এম. ঝাড়খণ্ড মুক্তি মোর্চা ও ঝাড়খণ্ড পার্টি নেতাদের কাছে যুক্ত অভিযানের প্রস্তাব দিয়েছিলেন। কংগ্রেস আর সি. পি. এম. কোন জবাব দেওয়া প্রয়োজন মনে করেনি। ঝাড়খণ্ড পার্টি উত্তর দেয় 'গুরুজনদের বিরুদ্ধে কাজ করছ, কাজেই কৃতকর্মের ফল ভোগ করতে হবে'। আর মুক্তি মোর্চা জানাল, সবুজ ঝাণ্ডা আর তীর ধনুক হাতে বেরিয়ে এস, তারপর কাজ হবে একসাথে। শুনে প্রতিবেদকের ধারণা আরও বদ্ধমূল হল যে, কোনও সুদূর তিরিশের দশকে মহাত্মা গান্ধী হরিজন কল্যাণের কর্মসূচি রেখেছিলেন আর এ কে গোপালন অস্পৃশ্যদের নিয়ে

মন্দিরে প্রবেশ করেছিলেন। ভারতের নদী নালা দিয়ে ইতিমধ্যে অনেক জল গড়িয়ে গেল, কিন্তু সামাজিক উন্নয়ন কাজে এই দেশের রাজনৈতিক দলগুলির একাত্ম হওয়ার আর কোনও দৃষ্টান্ত চোখে পড়ল না।

এই অঞ্চলের লক্ষাধিক ভয়ার্ত নরনারীদের পক্ষ থেকে রাজ্য সরকারের কাছে একটি আবেদন রাখা সমীচীন মনে করি। ডান-প্রথাকে বেআইনি ঘোষণা করার সাংবিধানিক দিকটা ভেবে দেখতে সরকার সময় নিতে পারেন ; কিন্তু যা আশু প্রয়োজন তা হল, মানবাজার দুই নম্বর ব্লকের সাতটি অঞ্চলকে পশ্চিম বাংলার প্রশাসনিক মানচিত্রে নিয়ে আসা। সেখানে স্বাস্থ্য কেন্দ্রগুলিতে না আছে ডাক্তার, না আছে ঔষধ। স্কুলগুলির ছাদ কবেই ভূপাতিত, কঙ্কালের মতো দেওয়ালগুলি দাঁড়িয়ে আছে। সর্বোপরি জামতোড়িয়া থানার অবস্থা সত্যই শোচনীয়। সাতটি অঞ্চলের আইনশৃঙ্খলা রক্ষা করার জন্য আছে চারটি কনসটেবল আর দুটো সাইকেল। একটা গুদামের দুটো ঘরকে একাধারে থানা আর থানাকর্মীদের বাসস্থান করে তোলা হয়েছে। লক-আপ দূরের কথা—একটা শক্ত পোক্ত ঘর নেই, যেখানে আসামীদের আটকে রাখা যায়। সেখানে 'নির্বাসন দণ্ডভোগী' দারোগা রামকুমার মণ্ডল অবশ্য স্থানীয় জনসাধারণের আস্থাভাজন ও কর্তব্য সম্পাদনে উৎসাহী। কিন্তু তাঁর করার কিছু নেই। তিনি দুঃখ করে বললেন, 'কোনও আসামীকে ধরতে সাহস হয় না। ধরলে কোথায় তাকে রাখবো এই চিন্তা। আসামী ধরতে না পারা অকর্মণ্যতা হতে পারে কিন্তু ধৃত আসামী পালিয়ে গেলে চাকরি রাখা দায়।' সমাজের অগ্রগামী ও পশ্চাৎগামী দুই শক্তির হিংস্র সংগ্রাম সামলানোর দায়িত্ব পড়েছে এমন একটা থানার উপর! ভাবুন একবার!

ডাইনী প্রথা নিয়ে দক্ষিণ পুরুলিয়ায় চলছে আতঙ্কের রাজত্ব*

লোকসংস্কৃতির গবেষণার উল্লেখযোগ্য পীঠস্থান, খরাপীড়িত, কঙ্করময়, শালমহুয়ার জঙ্গলে ভরা প্রাকৃতিক সৌন্দর্যে ভরপুর পুরোন মানভূম পুরুলিয়া জেলার দক্ষিণের পার্বত্য অঞ্চলের আদিবাসী অধ্যুষিত অঞ্চলগুলিতে বিগত কয়েক মাস ধরে ধারাল টাঙ্গি দিয়ে দিনে-দুপুরে কুপিয়ে হত্যা, খুনের হুমকি, জমিজমা লুটপাটের অবাধে অরাজকতার রাজত্ব চলছে। পুলিস প্রশাসন একেবারে অসহায়। অপরাধীদের গ্রেপ্তার করলেও সংরক্ষিত জায়গার অভাবে এবং যানবাহনের যথোপযুক্ত ব্যবস্থা না থাকায় গ্রেপ্তার করার ওয়ারেন্ট দিনের পর দিন জমে গেলেও তা ফাইল বন্দী করে রাখা ছাড়া পুলিসের কিছু করার থাকছে না।

পর পর যে ঘটনাগুলোর জন্য দক্ষিণ পুরুলিয়ার অঞ্চলগুলো সন্ত্রস্ত তা হল ২৬ জুন দক্ষিণ পুরুলিয়ার মানবাজার থানার বরদহি গ্রামের বাসিন্দা সুধীর টুডুকে খুন করতে গিয়ে লক্ষ্মণ টুডু নামে এক নিরীহ আদিবাসীকে টাঙ্গি দিয়ে কুপিয়ে হত্যা, ৩০ মে রয়না গ্রামের অধিবাসী 'খেরওয়াল গাঁওতা'র সম্পাদক ও সাঁওতাল সাহিত্য পরিষদ পুরুলিয়ার সদস্য মহেশ্বর বেশরাকে তাঁর শ্বশুরবাড়ি 'ছোটরাঙ্গা' গ্রামে স্থানীয় রাজনৈতিক দলের দুই সদস্য টিকারাম মাণ্ডি, গ্রাম—ডোমজুড়ি এবং সীতারাম মাণ্ডি গ্রাম—কালনা বেরা হত্যা করার চেষ্টা করে। গ্রামবাসীরা ওদের দুজনকে ধরে জামতোড়িয়া পুলিস ফাঁড়িতে নিয়ে যায়। পুলিস তাদের দুজনকে আটকে রাখে। রাত্রে দরজা ভেঙ্গে তারা পালিয়ে যায়। পরে টিকারাম আবার ধরা পড়ে।

১৬ মার্চ চক্রধর টুডু ও কংগ্রেসের প্রাক্তন এম. এল. এ. শীতল হেমব্রমকে লোহার রড ও চেনের আঘাতে ক্ষতবিক্ষত করে হাসপাতালে পাঠাল, সাঁওতালী প্রবীণ কবি পিপলস্ ইউনিয়ন ফর সিভিল লিবার্টির পুরুলিয়া শাখার সভাপতি রাষ্ট্রপতি পুরস্কার প্রাপ্ত শিক্ষক এবং সাঁওতালী সাহিত্য ও সংস্কৃতির প্রচারে অগ্রণী সারদাপ্রসাদ কিসকুর প্রাণনাশের ক্রমাগত চেষ্টা, ২০ মে পাঁড়রা গ্রামে বসন্তপুর জুনিয়র হাই স্কুলের প্রধান শিক্ষক, প্রতিষ্ঠাতা ও সেক্রেটারী, জনপ্রিয় সমাজসেবী ও আদিবাসী নেতা জাগরণ সরেনকে প্রকাশ্য দিবালোকে তীরবিদ্ধ করে এবং পরে ধারালো টাঙ্গি দিয়ে মুণ্ডচ্ছেদ প্রভৃতি পরপর নৃশংস ঘটনায় দক্ষিণ পুরুলিয়ার মানবাজার ২ নং ব্লকের বান্দোয়ান থানার জামতাড়িয়া, কায়রা, চিরুডী, বসন্তপুর, ছোটরাঙ্গা, রয়না, দাঁরিকাডোবা, ফুলবেড়িয়া, মুকুন্দপুর, পাঁড়রা প্রভৃতি অঞ্চলের মানুষের জীবন বিপন্ন। হাতের মুঠোয় প্রাণ নিয়ে বাস করতে হচ্ছে স্থানীয় গ্রামবাসী সমেত পুলিস প্রশাসনের। আদিবাসীদের প্রাচীন সংস্কার ডান-ডাইনী প্রথাকে কেন্দ্র করে 'সখা' নামক ব্যক্তি জমিজমা প্রচুর টাকা আত্মসাৎ করছে। নিরক্ষর অশিক্ষিত আদিবাসীদের ঠকিয়ে এরকম আত্মসাৎ ঘটনার এবং দীর্ঘদিন ধরে এই অবিচার পদ্ধতির বিরুদ্ধে যাঁরা আন্দোলন করে আসছেন তাদেরই প্রাণনাশ হচ্ছে। এবং ভবিষ্যতে আরও হত্যাকাণ্ড হবে বলে হুঁশিয়ার করা হচ্ছে। পর পর কারা কারা খুন হবে তাদের নামের তালিকাও নাকি তৈরি হয়ে গেছে বলে প্রচার হয়েছে বলে জানালেন অনেকেই।

রুক্ষ অঞ্চল পুরুলিয়ার দক্ষিণের এসব গ্রামগুলোর সাম্প্রতিককালের ঘটনাগুলোর টুকরো-টুকরো সংবাদ কলকাতার বড় খবরের কাগজগুলোয় আলোচিত হয়েছে। কলকাতার বুদ্ধিজীবী মহলেও এর সাড়া পড়েছে। আদিবাসী অ-আদিবাসীরা মিলিত ভাবে দক্ষিণ পুরুলিয়ার আন্দোলনকারী আদিবাসী নেতাদের স্বাগত জানিয়ে গত ১০ আগস্ট কলকাতার কলেজ স্ট্রীট কফি হাউসের দোতলায় র‍্যাডিক্যাল হিউম্যানিস্ট হলে পি ইউ সি এল-এর উদ্যোগে এক আলোচনাসভার আয়োজন করা হয়। আদিবাসী সমাজে ডান-ডাইনী যে একটা ভ্রান্ত ধারণা মাত্র এবং একে উপলক্ষ করে যে রাজনীতি

হচ্ছে তা সেদিনের উপস্থিত বক্তাদের বেশ জোরের সঙ্গে বলতে শোনা গেল। এ ধারণার আরও প্রমাণ পাওয়া গেল পি. ইউ. সি. এল-এর সংগৃহীত এক অনুসন্ধানমূলক রিপোর্টে। পি. ইউ. সি. এল. আরও একটি পদক্ষেপ নেয়। গত ২৬ সেপ্টেম্বর মুখ্যমন্ত্রী জ্যোতি বসুর কাছে দক্ষিণ পুরুলিয়ার আদিবাসী, লেখক, কবি ও বুদ্ধিজীবীদের নিরাপত্তার জন্য আবেদন জানিয়ে এক স্মারকলিপিও পেশ করে। মুখ্যমন্ত্রীর অনুপস্থিতিতে স্মারকলিপি নেন স্বরাষ্ট্র সচিব রথীন সেনগুপ্ত। কিন্তু এখনও পর্যন্ত কোন নির্দেশ জেলা প্রশাসনে যায় নি। লক্ষ্মণ টুডুর হত্যার ঘটনায় পুলিস সুধীরকে গ্রেপ্তার করে। তার বিরুদ্ধে কেস করা হয় কোর্টে। কয়েক মাসের জন্য জেলে পাঠানো হয়। এদিকে লক্ষ্মণ টুডুর লাশ তিনদিন পড়েছিল ঘটনাস্থলে। তিন দিন পরে মানবাজার থেকে গাড়ি এসে লাশ নিয়ে যায়। লক্ষ্মণ টুডুর মৃত্যুর পর স্থানীয় রাজনৈতিক দল দাবি করে যে লক্ষ্মণ টুডু তাদের দলের লোক ছিল। কিন্তু লক্ষ্মণ যে কোন দলের লোক ছিল না তা প্রায় গ্রামের প্রত্যেকেই জানে।

একটি ঘটনার উল্লেখ করা যাক। বরদহি গ্রামের সুধীর টুডু নামে এক ব্যক্তির স্ত্রীকে গ্রামের মোড়ল গুণীন সূর্য সথা ডাইনী বলে ঘোষণা করে। সেই নিয়ে গ্রামে উত্তেজনা চলছে মার্চ মাস থেকে। এবং কিছুদিন আগে ঐ মোড়ল ও সথার দলবল সুধীর টুডুর বাড়ি চড়াও হয়। তারা সুধীর টুডুকে হত্যা করার চেষ্টা করে। কিন্তু অন্ধকারে ভুলক্রমে খুন হয় লক্ষ্মণ টুডু নামে এক ব্যক্তি। পরে হত্যাকারীরা লক্ষ্মণ টুডুকে হত্যাকারী বলে ঘোষণা করে পুলিসকে জানায়।

২৭ জুন থেকে ইণ্ডিয়ান পেনাল কোডের ৩০২ ধারা অনুযায়ী পুরুলিয়ার ডিস্ট্রিক্ট জেলে সুধীর-মিলন আটক ছিল। গত অস্টমীর দিন সুধীর জামিনে খালাস পায়। কিন্তু সে বড়দহি গ্রামের বাড়িতে সোজা যেতে পারেনি। সোজা এসে উঠেছে দাঁড়িকাডোবা গ্রামে সারদাবাবুর বাড়িতে।

সুধীরের ফেরার খবরে তীর, ধনুক টাঙ্গি নিয়ে সন্দেহজনক ভাবে সারদাবাবুর বাড়ির আশেপাশে কিছু ব্যক্তি ঘোরাঘুরি করতে শুরু করে। একথা এক চিঠির মাধ্যমে জামতোড়িয়া পুলিস ফাঁড়ির ভারপ্রাপ্ত অফিসার ইনচার্জ রামকুমার মণ্ডলের কাছে জানান সারদাবাবু। ডান-ডাইনা নিয়ে ক্রমাগত পরিস্থিতি ভয়ঙ্কর হচ্ছে দেখে এবং নিজেদের লোকবল কম দেখে জামতোড়িয়া পুলিস ফাঁড়ির ও সি রামকুমার মণ্ডল নিজে উদ্যোগী হয়ে ডাইনী প্রথার পক্ষে ও বিপক্ষে দুই তরফকে ডেকে আপসে ব্যাপারটা মিটিয়ে নিতে আহ্বান জানিয়েছিলেন। ডান-ডাইনীর বিপক্ষে যারা তাঁরা কাছে এসেছেন। কিন্তু পক্ষের দলের লোকেরা নানারকম অজুহাত দেখিয়ে ছলছুত করে এড়িয়ে গেছেন। কেউ আসেন নি।

জামতোড়িয়া ফাঁড়ির শোচনীয় অবস্থা দেখলে, সহজেই বোঝা যায় যে সরকার গ্রামে গঞ্জে মানুষের নিরাপত্তার কথা কতটা ভাবছেন! দক্ষিণ পুরুলিয়ায় ব্যাপক

হারে যে খুনখারাপ হচ্ছে তা পুলিস প্রশাসনের এরকম ব্যবস্থায়। ডান-ডাইনী সমস্যাকে কেন্দ্র করে যখন জামতোড়িয়া ছোটরাঙ্গা, রয়না, দাঁরিকাডোবা, বরদহি গ্রামের অধিবাসী ডান-ডাইনীর বিপক্ষে আন্দোলনকারী নেতাদের ক্রমাগত প্রাণ-নাশের চেষ্টা চলছে ঠিক তখনই ২০মে সকাল সাড়ে ন'টা নাগাদ ডান-ডাইনীর বিপক্ষে আন্দোলনকারী এবং নেতা জাগরণ সরেনকে জামতোড়িয়া পুলিস ফাঁড়ির অধীনে জামতোড়িয়া গ্রামের পাঁচ ছয় মাইল দূরে পাড়রা গ্রামে প্রথমে তীরবিদ্ধ করে এবং পরে টাঙ্গি দিয়ে মুণ্ড কেটে খুন করা হয়। সারদাবাবু এক চিঠির মাধ্যমে আমাকে তা জানান। টেলিপ্রিন্টারের মাধ্যমে সংবাদ কলকাতার সংবাদপত্রের অফিসে পৌঁছায়। বিস্তারিত সংগ্রহে একাদশীর দিন সকাল ৮টায় মুকুন্দপুর গ্রাম থেকে নিজে সাইকেল চালিয়ে উঁচু নিচু দুর্গম পথ অতিক্রম করে যখন জাগরণবাবুর গ্রাম বসন্তপুর পৌঁছলাম, তখন বেলা প্রায় সাড়ে ন'টা। মে মাসের ঘটনা কিন্তু গোটা গ্রামটা তখন শ্মশানভূমি। জাগরণ সরেনের দুই বিয়ে। দুই স্ত্রীই জীবিত। বড়জনের নাম পানসড়ি সরেন আর ছোটর নাম কর্ণলতা সরেন। তিন ছেলে ও দুই মেয়ে আছে। সবাই ছোট, পড়াশুনা করে। এর মধ্যে বড় মেয়ে হৈমবতীর বিয়ে হয়ে গেছে।

জাগরণবাবু বসন্তপুর জুনিয়র হাই স্কুলের হেডমাস্টার মানবাজার ২নং ব্লক কংগ্রেস-ই কমিটির সম্পাদক, আদিবাসী ও তফসিলী পরিষদ পুরুলিয়া জেলার সম্পাদক, সাঁওতালী অ্যাসোসিয়েশন সুসার গাঁওতার জেলা সভাপতি ছিলেন। বসন্তপুর জুনিয়র হাইস্কুলের প্রতিষ্ঠাতা ও সম্পাদক ছিলেন জাগরণ সরেন। বয়স ৪৫-৪৬ বৎসর। বহু সামাজিক উন্নয়নমূলক কাজের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। নিজের এলাকার এবং আশপাশের অনেক গ্রামেরই উন্নয়নে তাঁর ভূমিকা যথেষ্ট। তাঁকে যেদিন খুন করা হয়, সেদিনটা ছিল রবিবার। পাশের গ্রাম পাড়রার অধিবাসী পিসতুত ভাই লালবিহারী মুর্মুর মাথায় গণ্ডগোল দেখা দিয়েছে এ সংবাদ পাওয়া মাত্র সকালেই (প্রায় ৭টা নাগাদ) চা, বিস্কুট খেয়ে সাইকেল নিয়ে রওনা হয়ে যান। আধ ঘণ্টার মত তিনি তাঁর আত্মীয়র বাড়িতে ছিলেন। ফেরার পথে গ্রামের শেষ প্রান্তে তাঁকে খুন করা হয়। প্রত্যক্ষ-দর্শীর জবানবন্দীতে জানা যায়, রাস্তার পাশের জঙ্গল থেকে দুষ্কৃতকারীরা প্রথমে তাঁকে লক্ষ্য করে তীর ছোঁড়ে। তীরের আঘাতে পড়ে গেলে পর টাঙ্গি দিয়ে ঘাড় থেকে মুণ্ডচ্ছেদ করে দেয়।

খুন হওয়ার সংবাদ জামতোড়িয়া পুলিস ফাঁড়িতে পৌঁছয় অনেক দেরিতে। যখন পুলিস ঘটনাস্থলে আসে পুরো পাড়রা গ্রামের লোক তখন উপচে পড়ছে। কোনরকমে তাদের সরিয়ে মৃতদেহ পুলিস নিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করলে গ্রামবাসীরা তাতে বাধা দেয়। তারা দাবি করে পুলিসের কুকুর এনে আসামীদের ধরতে হবে। উপযুক্ত শাস্তি আসামীদের দিতে হবে।

পুলিস এবং গ্রামবাসীদের মধ্যে বাগবিতণ্ডা ক্রমশ যখন তুঙ্গে ওঠে তখন পুরুলিয়া,

মানবাজার থেকে পুলিস চলে আসে। এস পি পুরুলিয়া, অ্যাসিস্ট্যান্ট এস.পি, পুরুলিয়া ও সি, জামতোড়িয়ার অবস্থা আয়ত্তে আনার চেষ্টা করে। পুলিস কুকুর আনতে বাধ্য হয়। জামতোড়িয়া ফাঁড়ির ও সি জানালেন সেদিন কুকুর আনা হয় আসানসোলের বানপুর থেকে। ওখানে আসামী ধরার জন্য আনা হয়েছিল। 'অত্যন্ত জরুরী' এই বার্তা পাঠিয়ে নিয়ে আসা হয় জাগরণ সরেনের খুনীকে ধরার জন্য। গ্রামবাসীর চাপে পুলিস কুকুর আনায় খুনী ধরা পড়ে। খুনী পাঁড়রা গ্রামেরই বাসিন্দা সি. পি. এম. সমর্থক বুদ্ধেশ্বর পাল ও লক্ষ্মণ সরেন। এরপর বুদ্ধেশ্বরের দাদা ভোলানাথ সরেণকেও পুলিস খুনি হিসাবে ধরে। পুলিসের কাছে ধৃত আসামীদের জবানী অনুসারে সবশুদ্ধ ২১ জন দুষ্কৃতকারীর নাম পাওয়া যায়। এর মধ্যে পঞ্চায়েত প্রধান লক্ষ্মণ হাঁসদা ও পঞ্চায়েত সমিতির সদস্য পরমেশ্বর মুর্মুও আছেন। অন্যান্য ধৃত আসামীদের তালিকায় উল্লেখযোগ্য আসামীরা হলেন উমেস মাণ্ডি, শ্যামাপদ টুডু, অশ্বিনী হেমব্রম, রমেশ মাণ্ডি প্রমুখ।

রয়না গ্রামে 'সথা'র সাক্ষাৎকার নিতে যাওয়ার পথে সি. পি. এম -এর সক্রিয় কর্মী প্রাক্তন অঞ্চল প্রধান রামদাস বাস্কের খোঁজ করাতে জানলাম মাঠে ঘাস কাটতে গেছেন। সেখানেই হাজির হলাম। উঁচু ঢিবির উপর দাঁড়িয়ে ডান-ডাইনী নিয়ে যে হত্যাকাণ্ড ঘটে চলেছে তাতে স্থানীয় রাজনৈতিক দল সি. পি. এম -কে সবাই দায়ী করছে কেন? তা জিজ্ঞেস করাতে একেবারেই চুপ থেকে গেলেন রামদাস। পরের প্রশ্ন, নিজে ডাইনী ব্যাপারটা মানেন কিনা জিজ্ঞেস করাতে বললেন ব্যক্তিগত ভাবে তিনি ডাইনী আছে বলে বিশ্বাস করেন না। প্রাচীন কাল থেকে এই চিন্তাধারা চলে আসছে বলে এখনও আদিবাসী সমাজ তা মেনে চলছে। নিরক্ষরতাই যে এর জন্য দায়ী তা তিনি জোরের সঙ্গে বললেন কিন্তু তিনি নিজে থেকে কিছু করতে পারছেন না কেননা বৃহৎ আদিবাসী সমাজ এর পক্ষে। রামদাসের ডাইনীর বিপক্ষে কথা বলা কিন্তু গ্রামবাসীদের কাছ থেকে শোনা গেল না। বহু আগে ডান-ডাইনী খপ্পরে পড়েছিলেন এমন কয়েকজন পরিবার জানালেন যে এই রামদাসই ডাইনীর পক্ষ হয়ে জায়গায় জায়গায় মিটিং করেছেন। পাশেই গোলাপাড়ায় মাস খানেক আগে ডাইনী নিয়ে বিরাট সমাবেশের আয়োজন করেছিলেন রামদাস।

দক্ষিণ পুরুলিয়ায় ডাইনী-সমস্যাকে কেন্দ্র করে যে অরাজকতার রাজত্ব চলছে তার থেকে এটাই মনে হল যে অবিলম্বে সরকারি তরফে দোষী ব্যক্তিদের শাস্তি দেওয়া, পুলিস প্রশাসনের কাঠাম মজবুত করা এবং আদিবাসী সমাজের শিক্ষা, রুজি-রোজগার ব্যবস্থা এবং সর্বোপরি চিকিৎসা ব্যবস্থার প্রসার ঘটানো আশু প্রয়োজন। তাহলে 'সথা' নামক ব্যক্তির নির্যাতনের ব্যবসা বন্ধ হবে। এলাকায় শান্তি ফিরে আসবে।

(আজকালে প্রকাশিত আমার লেখার ওপর এই চিঠিটি ছাপা হয়েছিল)

প্রশাসন সচেতন হলে ডাইনীপ্রথা এখনই বন্ধ হবে—

আপনাদের বহুল প্রচারিত 'আজকাল' পত্রিকার মাধ্যমে গত ১১-১০-৮৪ তারিখে লক্ষ্মীন্দ্রকুমার সরকার 'ডাইনী প্রথা নিয়ে দক্ষিণ পুরুলিয়ায় চলছে আতঙ্কের রাজত্ব' নিবন্ধে লেখক আদিবাসী সমাজের একটি কঠিন বাস্তব সমস্যার কথা তুলে ধরেছেন, যা যুগ যুগ ধরে আমাদের সমাজে চলে আসছে। কিন্তু এমনই দুঃখজনক অবস্থা, আজও এর বিরুদ্ধে জাগ্রত জনমত নেই. এক কথায় বলা যায়, আমরা প্রতিটি আদিবাসী নিঃশব্দে এই প্রথাকে সমর্থন করি একমাত্র 'আমি' বা 'আমার আত্মীয় পরিবার ডাইনী চিহ্নিত না হওয়া পর্যন্ত কেউই-এর বিরোধিতা করি না। যেখানে দেশের অধিকাংশ জনসাধারণ এই যুগেও ঝাড়ফুঁক বিশ্বাস করেন আমরা আদিবাসীরা একটু বেশি বিশ্বাস করি। দুরারোগ্য ব্যাধি সমূহ যা সহজে চিকিৎসা করা যায় না, যেমন দৃশ্যমান কুষ্ঠকে পাপের ফল বলা হয়, তেমনই অদৃশ্য টিবি রোগীর ক্ষেত্রে সেটা 'ডাইনীর নজর' ছাড়া আর কিছুই নয়—এই হচ্ছে বেশির ভাগ ক্ষেত্রে আমাদের সামাজিক বিধান। আমাদের যোগাযোগবিহীন গ্রাম্য এলাকায় ব্যয়বহুল চিকিৎসার চিন্তা স্বপ্ন ছাড়া আর কিছু নয়। এমতাবস্থায় প্রত্যেক আদিবাসী 'ডাইনী' ধরার বাস্তব পথ নিতে হয়, এইভাবে রোগীর মৃত্যু ও ডাইনী হত্যাও অবশ্যম্ভাবী হয়ে ওঠে। আপনাদের বহুল প্রচারিত পত্রিকার মাধ্যমে একজন আদিবাসী যুবক হিসাবে আমাদের সামাজিক সংস্কারের বিরুদ্ধে জনমত গঠন করবার জন্য বিভিন্ন সমাজসেবী সংস্থার দৃষ্টি আকর্ষণ করছি এবং 'ডাইনী' চিহ্নিতকরণকারী আদিবাসী ভাষায় যাদের 'জান' (গুণিন) বলা হয় (যাদের গণনায় একজন আদিবাসী 'ডান' চিহ্নিত হয়) সেইসব লোকচক্ষুর অন্তরালের অপরাধীদের (যাদের কথায় ক্ষিপ্ত হয়ে 'ডাইনী' সন্দেহে নিজ পিতা-মাতাকেও খুন করতে পিছপা হয় না) তাদের বিরুদ্ধে এখনই সরকারী প্রশাসন জামিন বিহীন গ্রেপ্তারী পরোয়ানা জারি করুক। পশ্চিমবঙ্গের কয়েকশত 'জান'-এর স্বেচ্ছাচারী ধান্দাবাজীর শাস্তির বিনিময়ে লক্ষ লক্ষ অসহায় আদিবাসীদের বাঁচানর জন্য আইনের রক্ষাকবচ কঠোর হাতে প্রয়োগ করবার জন্য এই পত্রিকার মাধ্যমে মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীর দৃষ্টি আকর্ষণ করছি।

আর. এস. হেমব্রম। কলিকাতা-৭০০০০১।

পরিশিষ্ট—৪

মহাদেব হাঁসদা ২২-৪-৮৪
সম্পাদক, তেতরে

প্রিয় লক্ষ্মীন্দ্রদা,

বড়দহি গ্রামে ডাইনীকে কেন্দ্র করে যে সব ঘটনা ঘটেছে, তার খবর হয়তো নিরঞ্জন বাবুর কাছ থেকে পেয়েছেন। বিস্তারিতভাবে তাই লিখছি না। অবস্থা কিছুদিন থমথমে ছিলো। এখন আবার নতুন করে সখার লোকেরা আন্দোলন শুরু করছে। এদের মতে, ভূত ডাইনী, জান, সখার বিরুদ্ধে কথা বলা বা লেখা সমাজ বিরুদ্ধ কাজ। এর কঠোর শাস্তি হওয়া দরকার।

সখার লোকেরা শীতল হেমব্রম প্রাক্তন এম. এল. এ. এবং চক্রধর টুডুকে ভীষণ মার দিয়েছে। সুধীর টুডু সমেত ৩ জনের বাড়ি লুঠ এবং সারদাবাবুর বাড়িতে আগুন জালিয়ে দেওয়ার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছিল। সেটা সফল হয়নি। এখন এঁদের পথে-ঘাটে খুন করবার হুমকি দেওয়া হচ্ছে।

এমন জটিল পরিস্থিতির মধ্যেই আমরা সাহিত্য পরিষদের পক্ষ থেকে জামতোরিয়ায় সাঁওতাল কবি সাধু রামচাঁদ মুরমুর জন্মদিবস পালনের ডাক দিয়েছি ১৬ বৈশাখ (২৯ এপ্রিল ১৯৮৪)।

আপনি কি পারবেন ওই তারিখে জামতেরিয়ায় পৌঁছতে ?

আজ বেশি কিছু লিখছি না।

নমস্কার সহ
মহাদেব হাঁসদা

লক্ষ্মীন্দ্রকুমার সরকার
কলকাতা-৪২

[এই চিঠি পাঠাবার ঠিক দুমাস পরে মহাদেব একটি চিঠি পাঠায় তাতে তার সই থাকেনা। চিঠিটি হল এইরকম]

কায়রা

প্রীতিভাজনেষু, ৩০. ৬. ৮৪

আবার খুন। ২৩ জুন সংন্ধ্যার সময় বড়দহি গ্রামের লক্ষ্মণ টুডু খুন হয়েছে। ঐ দিন সন্ধ্যা আন্দাজ ৭টার সময় সুধীর টুডুর বাড়ির মেয়েদের ঘর থেকে টেনে বের করে রাস্তায় মারা (প্রহার) হচ্ছিল। সুধীর তাদের রক্ষা করবার জন্য বাড়ির বাইরে দৌড়ে আসে। এমন সময় কিছু লোক টাঙ্গি দিয়ে তাকে মারতে উন্মত হয়। সুধীর সকলের অজান্তে লুকিয়ে পড়লো। ওখানে দাঁড়িয়ে ছিলো। লক্ষ্মণ টুডু। দুষ্কৃতকারীরা ভুলবশতঃ তাকেই ধারালো অস্ত্র দিয়ে কুপিয়ে হত্যা করলো।

তারপর যখন ওরা জানতে পারলো এটা সুধীর নয়। তখন তারা সুধীরদের বাড়ি আক্রমণ করে। বাড়ির দরজা ভেঙে ফেলার অনেক চেষ্টা করলো। কিন্তু পারলো না। কবি সারদাপ্রসাদ কিসকুর বাড়িতেও ওরা হানা দিয়েছিলো, কিন্তু ভেতরে ঢুকতে পারেনি। রাত্রিবেলা সারদাবাবু, সুধীর টুডু ও তাদের সমর্থকেরা ছেলেমেয়েদের নিয়ে অন্য গ্রামে পালিয়ে যান।

কিছুদিন বাইরে থাকার পর তাঁরা গ্রামে ফিরেছেন। কিন্তু সারদাবাবুকে গুণ্ডারা খুঁজে বেড়াচ্ছে বলে তিনি এখনও এখানে সেখানে লুকিয়ে দিন কাটাচ্ছেন। জামতোরিয়া ফাঁড়ির পুলিশকে যথাসময়ে জানানো হয়েছে। কিন্তু তাতে ওরা কান দেয়নি?

ওদিকে দুষ্কৃতকারীরা উল্টো কেস করেছে, সুধীর টুডুই লক্ষ্মণ টুডুকে খুন করে পালিয়েছে। পুলিশ সুধীর টুডু ও তার একজন সমর্থককে গ্রেপ্তার করেছে। এটা সম্পূর্ণ রাজনৈতিক চক্রান্ত রাজনৈতিক দলের উসকানি পেয়ে সখা ও ডাইনী সমর্থক কিছু লোক আমাদের শেষ করতে চাইছে। সারদাবাবু, বালিশ্বর, মহেশ্বর ও আমি আক্রমণের লক্ষ্যবস্তু। ঘটনাস্থল থেকে আমি দূরে আছি বলে কিছুটা প্রকাশ্যে ঘুরতে পারছি। অন্য সবাই লুকিয়ে দিন কাটাচ্ছেন। সারদাবাবু সব চাইতে বেশি বিপন্ন।

সারদা বাবুকে বাঁচাবার চেষ্টা করবেন। আমাদের সব চেষ্টা নিষ্ফল হয়েছে।

এবার কলকাতায় ৪ দিন থাকার পর ২৫ জুন বাড়ি ফিরেছি। অনেকের সাথেই দেখা করতে পারলাম না। ৩০ জুলাই আবার যাবো। এদিকে ভীষণ বৃষ্টি, নদী নালায় বন্যা, যোগাযোগ সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন।

আজ ৩০ জুন। সর্বত্র সিধু কানহু দিবস বা হুল মাহা পালিত হচ্ছে। আমরা এখানকার কবি-লেখকরা কোন অনুষ্ঠানে যাচ্ছি না। মনে হচ্ছে আমরাই "হুল"এ নেমেছি।

আজ এখানেই শেষ করছি।

নমস্কার জানাই।

প্রতিঃ

লক্ষ্মীন্দ্রকুমার সরকার। কলকাতা।

পুনঃ

আপনাদের আতিথেয়তা ভুলতে পারবো না।

জয়হিন্দ বড়দহি

মাননীয় লক্ষ্মীন্দ্রবাবু, ৭/৬/৮৯

পত্রে আমার নমস্কার জানবেন। আশাকরি কুশলে আছেন। আমাদের মামলার আর্গুমেন্টের দিন ছিল বলে আমি গতকাল ৬।৬।৮৯ তারিখে পুরুলিয়া গিয়েছিলাম। এই দিনে মিলন কাকা পুরুলিয়া যায়নি। যাই হোক আর্গুমেন্ট হয়ে গেল, ভালই হয়েছে। আমাদের প্রধান উকিল শ্রীঅরূপ কুমার ভট্টাচার্য্য প্রথমে ইংরাজীতে ও পরে বাংলায় তাঁর বক্তব্য পেশ করেন। বাংলায় তাঁর বক্তব্য আমি বুঝতে পারি। বিরোধী পক্ষের সরকারী উকিল শ্রীমনোরঞ্জন রায় কোর্টে উপস্থিত ছিলেন। তিনি আমাদের উকিলের বক্তব্যের আদৌ বিরোধিতা করেননি, বিরোধিতা করার ছিলোওনা, আর্গুমেন্ট শেষে আমাদের পক্ষের উকিলগণ ও ল'ক্লার্ক আনন্দে নাচতে থাকেন। সেদিন দৈব্যক্রমে আমার মামাশশুর শীতল হেমব্রম কোর্টে উপস্থিত ছিলেন। তিনি উকিলদের আর্গুমেন্ট পুরোপুরি শুনলেন। তিনি, আমাকে বললেন,—'তোমরা বেকসুর খালাস হয়ে যাচ্ছি।' এরপর রায় দিবার দিন আছে আগামী ১৪।৬।৮৯ তারিখে। আপনি মার্চ মাসের শেষে আমার সাথে যখন শ্রাবণী বৌদিকে নিয়ে পুরুলিয়া যান। তখন আমাদের উকিল অরূপবাবুর সঙ্গেও দেখা করেছিলেন। আপনি দেখা করার ফলে উকিল আমাদের কাছে আর টাকা দাবী করেননি। যাই হোক, 'পুরুলিয়ার ডাইনী প্রথা বিরোধিতা' সম্বন্ধে আপনি একটা বই লিখছেন এবং এই মামলায় আসামীদের জেতাতে পারলে উকিলদের নাম, জজের নাম, ও তাঁদের ফটো সমেত মামলার বিবরণও উক্ত বইয়ে স্থান পাবে বলে আমাদের উকিল অরূপবাবুকে বলেছেন। তাই উকিলদের দারুণ উৎসাহ।

অতএব আপনার কাছে আমার বিনীত অনুরোধ, আগামী ১৪ জুন রায় দিবার দিনে আপনি পুরুলিয়ায় আসুন, পুরুলিয়াতেই আপনার সঙ্গে আমাদের দেখা হবে। পুরুলিয়ার কোর্টের কাজ বর্তমানে সকালে হচ্ছে। সম্ভবতঃ প্রয়োজন হতে পারে, তাই জজের নাম, ঠিকানা সমেত উভয় পক্ষের উকিলদের নাম ও ল' ক্লার্কের নাম আপনার কাছে লিখে পাঠালাম।

আমাদের মুক্তির জন্য বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় শ্রদ্ধেয়া মহাশ্বেতা দিদির আবেদন ছাপা হওয়ার জন্য ও আপনাদের সক্রিয় সহযোগিতায় জনসাধারনের মধ্যে অভূতপূর্ব সাড়া জেগেছে এবং অনেক সদাসয় ব্যক্তির কাছ থেকে প্রচুর আর্থিক সাহায্য পাওয়া গিয়েছে। এর ফলে মামলার ব্যয়ভার বহন করতে আমাদের বড় একটা অসুবিধা পেতে হয়নি। অধিক লেখা নিষ্প্রয়োজন। নিবেদন ইতি—

আপনার স্নেহের
শ্রীসুধীর টুডু

আমাদের মামলার জজ, উকিল ও ল' ক্লার্কের নাম ও ঠিকানা—

১। মাননীয় শ্রীদীনদয়াল সিনহা,
অতিরিক্ত জেলা দায়রা জজ, পুরুলিয়া।

২। শ্রী মনোরঞ্জন রায় এডভোকেট, মুনসেফডাঙ্গা, পুরুলিয়া।

৩। শ্রীঅরূপ কুমার ভট্টাচার্য, উকিল, নীলকুঠি ডাঙ্গা, পুরুলিয়া।

৪। শ্রীনন্দলাল সিংহনিয়া উকিল, কদমকুলি, পুরুলিয়া।

৫। শ্রীতারাপদ মাহাত, ল' ক্লার্ক, লোকোমেভ পাড়া, পুরুলিয়া।

To
Sri Lakshmindra Kumar Sarkar
9/D R.K. Chatterjee Road, Cal 700942

পরিশিষ্ট—৫

লিফলেট

[ডাইনী বিরোধী আন্দোলন শুরু হবার পর যে সমস্ত লিফলেট পক্ষে-বিপক্ষে ছাপান হয়েছিল। এ পর্যায়ে সেই লিফলেটগুলো তুলে ধরা হল।]

ডাইনী প্রথা বিরোধী আইন চাই

আদিবাসীরা অনগ্রসর বিধায় সার্বিক উন্নয়ন কল্পে এদের জন্য বিশেষ ব্যবস্থা গ্রহণ সংবিধানেও স্বীকৃতি পেয়ে আসছে। পশ্চিমবঙ্গের আদিবাসী অধিবাসীদের মধ্যে সাঁওতালেরাই সংখ্যাগরিষ্ঠ। কিন্তু যে সমস্ত সামাজিক কুপ্রথা এদের উন্নয়নের পথে বাধাস্বরূপ হয়ে আছে, বরঞ্চ পিছনে টানছে তন্মধ্যে ডাইনীপ্রথা পয়লা নম্বরে স্থান পাবার যোগ্য।

কবে এবং কিভাবে সাঁওতালদের মধ্যে ডাইনীপ্রথার জন্ম হয়েছিল, তার কোনো লিখিত কিংবা অলিখিত প্রমাণ নেই। যাই হোক স্মরণাতীত কাল থেকে এই প্রথা সাঁওতাল সমাজকে অক্টোপাশের মত আষ্টেপৃষ্ঠে বেঁধে অবাধে রক্ত শোষন করে চলেছে। এই কুফল হিসাব সাঁওতাল সমাজে দুর্বল থেকে দুর্বলতর হচ্ছে। বস্তুত: ডাইনীপ্রথার মত মানবিকতা বিরোধী, সর্বনাশকারী ও নৃশংস প্রথা সাঁওতালদের মধ্যে আর দ্বিতীয় নেই। এটা অতীতের সতীদাহ প্রথার সঙ্গে তুলনীয়। প্রতি বৎসর এই প্রথার শিকার হয়ে কত নিষ্পাপ, নিরপরাধ ও নিরীহ ব্যক্তির যে জীবন হানি ঘটছে কত অসহায় পরিবারকে যে নিঃস্ব ও উদ্বাস্তু হতে হচ্ছে, কত লোককে যে নিষ্ঠুর নির্য্যাতনের শিকার হতে হচ্ছে—তার ইয়ত্তা নেই।

ভণ্ড জানগুরুদের কথায় বিশ্বাস করে কত যে অপরাধ, অন্যায় ও অবিচার সংঘটিত হচ্ছে, তা বলে শেষ করা যায় না। প্রকৃতপক্ষে ডাইনী প্রথা একটা অন্ধবিশ্বাস ও কুসংস্কার ছাড়া কিছু নয়। এর কোন বৈজ্ঞানিক ভিত্তি তো নাই-ই, পরোক্ষ কিংবা প্রত্যক্ষভাবে কোন উপকার পাবার প্রশ্নও নেই। এর মূল সমাজের এত ভিতরে প্রবেশ করেছে যে এক্ষুনি এর অবসান ঘটান সাধারণের ক্ষমতার অতীত। স্বাধীনতা প্রাপ্তির দীর্ঘদিন পরেও ভারতের মত একটা কল্যাণ রাষ্ট্রে এধরনের কুপ্রথার অস্তিত্ব বিস্ময়জনক। এই কুপ্রথার উচ্ছেদকল্পে সরকার যদি আইন প্রনয়ণ করেন, অন্তত ভণ্ড জানগুরুদের বে-আইনী বলে ঘোষনা করেন তাহলেই এই ক্ষতিকারক প্রথার উচ্ছেদ সাধিত হতে পারে। আমরা এ বিষয়ে রাজ্য সরকার ও কেন্দ্রীয় সরকারের সহানুভূতি কামনা করছি এবং আশু ডাইনী প্রথা বিরোধী আইন প্রনয়ণের জন্য

অনুরোধ জানাচ্ছি। ইতি —সারদা প্রসাদ কিসকু, সভাপতি সাঁওতালী সাহিত্য পরিষদ, পুরুলিয়া মহাদেব হাঁসদা, সম্পাদক, 'তেতরে' সাঁওতাল মাসিক পত্রিকা।

কলেন্দ্রনাথ মাণ্ডি, সম্পাদক, 'সিলি' দ্বিমাসিক।
গুরুদাস মুর্মু, সম্পাদক, 'খেরওয়াল জারপা।'
বালিশ্বর সরেন, সম্পাদক, 'জিরিহিরি'।

যুগান্তর পত্রিকা থেকে গৃহীত ও জামতোড়িয়া খেরওয়াল গাঁওতার সম্পাদক মহেশ্বর বেশরা কর্তৃক পুনঃ প্রকাশিত উমাশঙ্কর প্রিন্টিং ওয়ার্কস থেকে মুদ্রিত।

বক্তা—

১। **কমঃ নকুল মাহাতো** –সম্পাদক, পুরুলিয়া জেলা কমিটি
সি-পি-আই (এম)

২। **কমঃ মণীন্দ্র গোপ**—সম্পাদক, পুরুলিয়া জেলা কৃষক সমিতি।

৩। **সুধাংশুশেখর মাঝি**—এম, এল এ।

বন্ধুগণ,

গত ২৩শে জুন' ৮৪ বৈকাল প্রায় সাড়ে ছটার সময় নির্মমভাবে খুন হলেন বড়দহি গ্রামের কমঃ লক্ষণ টুডু। এই ঘটনার কিছুদিন আগে কমঃ লক্ষণ টুডুর দাদা শ্রীনলিনী টুডুকে চক্রান্ত করে ডাইন (ডান) করা হয় এবং প্রথানুযায়ী তার কাছ থেকে জরিমানা আদায় করা হয়। আমাদের পার্টির অগ্রগতিকে বাধা দেওয়ার জন্য সুপরিকল্পিত ভাবে কমঃ লক্ষণ টুডুকে খুন করা হয়। খুনীদের এবং খুনীদের পরামর্শ দাতাকে এই এলাকার মানুষ ভাল করে চিনে। 'আনন্দবাজার, 'আজকাল' পত্রিকা একটি দুরভি সন্ধি নিয়ে এলাকার কারও কারও ভাবমূর্তি উজ্জল করার অপচেষ্টা চালাচ্ছে। আনন্দবাজারের কি জানা আছে কারা এবং কেন আমাদের পার্টির এম, এল, এ সুধাংশু শেখর মাঝির কুশপুত্তলিকা দাহ করে এবং একটা জীবন্ত মানুষের শ্রাদ্ধ করে সারদাকিস্কু বা কংগ্রেসের প্রাক্তন এম, এল, এ শীতল হেমব্রম এই ঘটনায় কি ভূমিকা নিয়েছেন এলাকার সাধারণ মানুষ তাও জানেন।

কম: লক্ষ্মণটুডুর হত্যার পিছনে কংগ্রেস(ই) দলের স্থানীয় নেতাদের হাত আছে, এটা দিবালোকের ন্যায় পরিষ্কার। এই হত্যা চক্রান্তের বিরুদ্ধে সংগঠিত প্রতিবাদ জানানোর জন্য আগামী ১০ জুলাই জনসভাকে এক ঐতিহাসিক জনসভায় রূপ দেওয়ার জন্য আমরা সকলকে অনুরোধ জানাচ্ছি—অভিনন্দন সহ—

মানবাজার ২নং লোকাল কমিটি।
সি, পি, আই (এম)

কম: জয়দেব বাস্কে কর্তৃক প্রকাশিত এবং শ্রীকৃষ্ণ প্রিন্টিং ওয়ার্কস, মানবাজার হইতে মুদ্রিত।

সি-পি-এম-এ-র এই লিফলেটের প্রতিবাদ স্বরূপ যুব কংগ্রেস (ই) কমিটি লিফলেট ছাপে। তাঁদের ঐ প্রতিবাদী লিফলেট হল নিম্নরূপ—

বিজ্ঞপ্তি

সি-পি-আই (এম)-এর মানবাজার ২নং লোকাল কমিটি ২৫শে আষাঢ় ১৩৯১ সাল জামতোড়িয়াতে যে জনসভার ডাক দিয়েছিল, তার প্রচার পত্রের বিবরণ সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন ও উদ্দেশ্য প্রনোদিত।

বড়দাহি গ্রামের লক্ষণ টুডুর মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে সাঁওতালদের ডাইনী প্রথার শিকারে আর একটা নাম যুক্ত হল। আমরা তাঁর মৃত্যুতে যারপর নাই দুঃখিত এবং তাঁর শোক সন্তপ্ত পরিবার বর্গকে আন্তরিক সমবেদনা জানাই। আমরা নিশ্চিত করে জানি, প্রয়াত লক্ষণটুডু কোন দিনই সি, পি, এম পার্টির কর্মীতো ছিলেনই না, সমর্থকও ছিলেন না। তিনি আজীবন কংগ্রেসকে সমর্থন করে এসেছিলেন। তাঁর বয়স ৪০ বছরের উপরে ছিল। তিনি গ্রামের মধ্যে সবচেয়ে নিরীহ ও লাজুক প্রকৃতির ছিলেন এবং কথা খুব কম বলতেন ও নিরক্ষর ছিলেন। তাই তাঁর দ্বারা কোন পার্টির অগ্রগতি কিম্বা পশ্চাৎগতির কোন প্রশ্নই ছিল না। মৃত্যুর পরে এহেন লক্ষণ টুডুকে রাতারাতি সি. পি. এম-এর বড় রকমের নেতা করে দেওয়া হল, নিশ্চয়ই এটা সৎ উদ্দেশ্য নয়। গত মার্চ মাস থেকে বড়দহি গ্রামে যে ডাইনীর ব্যাপার চলছে, তা হচ্ছে সাঁওতালদের সামাজিক ব্যাপার। অবশ্য এই সামাজিক ব্যাপার থেকেই অনেক অপ্রীতিকর ঘটনার উদ্ভব হয়েছে—যেগুলিকে আদৌ সামাজিক ব্যাপারে আখ্যা দেওয়া যায় না। বলতে দ্বিধা নেই ঘটনা শুরু হবার পর থেকেই সি. পি. এম. পার্টি নিজেদের হাতে লাগাম নিয়ে মীমাংসার পথ তৈরি হতে দেননি। এর নায়ক হিসাবে আমরা সব সময় সি. পি. এম. পার্টির প্রাক্তন প্রধান রামদাস বাস্কেকে দেখতে পাই।

আবার নির্দ্বিধায় বলতে পারা যায়, সি. পি. এম. পার্টির লোকেরা সরেজমিনে ডাইনী প্রথা সমর্থন করে আদিবাসীদের সর্বনাশ করেছেন, অপর দিকে প্রচার পত্রে ডাইনী প্রথা বিরোধী মত প্রকাশ করে প্রগতিশীলতার নামাবলী গায়ে দেবার হাস্যকর চেষ্টা করছেন। চালাকি বটে! এতেই বুঝা যাচ্ছে, রাজনৈতিক মুনাফা লুঠ করাই সি. পি. এম দের মুখ্য উদ্দেশ্য—সামাজিক সমস্যার সমাধান নয়।

নলিনী টুডুকে ডাইনী করেছিল কারা?—কারাই বা চক্রান্তকারী? যিনি গ্রামের লোককে ঝোরবাদের লিলু সখার কাছে নিয়ে গেছিলেন, সেই সবল রোগী লড়িরাম টুডুর নামটা দেওয়া হল না কেন? সি. পি. এম. দের বিচারে তিনি কি চক্রান্তকারী নন? পরিষ্কার ভাবে এ বিষয়টা জানবার জন্য সি. পি. এম. বন্ধুদের 'আনন্দবাজার পত্রিকা' ও 'আজকাল' পত্রিকা পড়া হল না কেন? তাছাড়াও তো অনেক বাংলা ও সাঁওতালী পত্রিকায় এ সম্পর্কে লেখা বেরিয়েছে। আমরা জানি এবং এর আগেই প্রকাশিত হয়েছে যে, নলিনী টুডুকে চক্রান্ত করে ডাইনী করা হয়েছিল এবং চক্রান্তকারীরা হচ্ছেন সি. পি. এম. পার্টির নয়া পতাকাবাহীরা।

দ্বিতীয়বার দেওয়ানী করতে যখন নলিনী টুডু সখার কাছে গেলেন, তখন সুধীর টুডুকে ডাইনী সাব্যস্ত করা হল। সি. পি. এম. বন্ধুরা কি বুকে হাত দিয়ে বলতে পারেন যে, এবারে চক্রান্ত হয়নি? বড়দহি গ্রামে ডাইনীর বিচার হলে গ্রামের চক্রধর টুডু নামক এক ব্যক্তিকে এবং সুধীর টুডুর মামাশ্বশুর প্রাক্তন এম. এল এ. শীতল হেমব্রমকে টেনে নিয়ে গিয়ে বেদম প্রহার দেওয়া হল; তা ছাড়াও সারদা প্রসাদ কিসকু উপস্থিতি নিয়ামক সমিতির সভাপতির বাড়িতে লাঞ্ছিত হলেন—এঁদের দোষ এঁরা ডাইনী প্রথার বিরোধিতা করেন। পরবর্তী ঘটনা হিসাবে রোগী ও গ্রামের মোড়ল লড়িরাম টুডু এবং রয়না গ্রামের সখা সূর্য্য বেশরা পুলিশের হাতে গ্রেপ্তার হল। আবারও দেখা যায়, সি. পি. এম. কর্মীদের নেতৃত্বে কয়েকবার পুলিশ ফাঁড়ি ঘেরাও, মহল গিরার ডাকে সমাবেশ এবং বড়দহি গ্রামের সুধীর টুডু প্রভৃতির এবং সারদা-প্রসাদ কিসকু ও শীতল হেমব্রমের বাড়ি লুট করার অপচেষ্টা। হায়! এসব তথ্য সি পি. এম.-রা সুকৌশলে এড়িয়ে গেলেন! —নলিনী টুডুকে নিয়েই নাচন কুঁদন আরম্ভ করে দিলেন। এ যেন ফুল্লা আর মল্লা, কংগ্রেসীরা হল দায়ী, সি. পি. এম.-দের প্রচার পত্রে সুধীর টুডুর আদৌ নামোল্লেখ নেই। তাহলে কি. বুঝব, সুধীর টুডু ডাইনীর ব্যাপারে জড়িত নেই?

বলা বাহুল্য, সি. পি. এম. বন্ধুরা খানিকটা ডাইনী প্রথার পেছনেও দৌড়াচ্ছেন, আবার রাজনীতির পেছনেও। বুঝতে অসুবিধা হচ্ছেনা যে, কয়েকজন আদিবাসী নেতাকে জালে ফেলবার জন্যই তাঁদের এই অপচেষ্টা—এই রামভাঁড়িয়া খেলা।

সি. পি. এম.-রা নাকি খুনীদের সহজেই চিনতে পারেন, তাদের পরামর্শ-

দাতাদেরও। কিন্তু জাগরণ সরেনকে যারা খুন করল ও ধরা পড়ল, তারা তো সকলেই সি. পি. এম. পার্টির লোক। তাদের পরামর্শদাতা কে হতে পারে—সেটা জানতে কি জনসাধারনের বাকি আছে? সুধাংশু মাঝি কি গঙ্গাজলে ধোয়া তুলসী পাতা?

কারা অজানা আছে যে, দোলদৌড়িয়া গ্রামে আদিবাসী নারী ধর্ষনের বিরুদ্ধে জাগরণ সরেনের নেতৃত্বে ২৮-৯-৮০ তারিখে মানবাজারে মিছিলের আয়োজন করলে সুধাংশু মাঝির সক্রিয় সহযোগিতায় কিছু সংখ্যক সি. পি. এম. সমর্থক মিছিল অবরোধ করার ব্যর্থ চেষ্টা করেন। হায়! সুধাংশু মাঝি হয়ত জানেন না যে, আনন্দবাজার পত্রিকা এবং আজকাল পত্রিকা ছাড়া কলকাতায় আরও কয়েকটি পত্রিকার সাংবাদিকরা সরেজমিনে উপস্থিত থেকে এ ব্যাপারে প্রত্যক্ষ করেছেন। অতিশয় লজ্জার কথা, এই মিছিলের পাল্টা হিসাবে ৭।১০।৮০ তারিখে সুধাংশু মাঝি কিছু সংখ্যক ভাড়াটে লোক নিয়ে নারী ধর্ষনের সপক্ষে মিছিল করেন। এই সমস্ত ঘৃণ্য অপরাধের জন্য সাঁওতালেরা সঙ্গত কারণেই দেশমণ্ডল মাননীয় শ্রীবংশীধর ব্যাস্কের পৌরহিত্যে সুধাংশু মাঝির কুশ পুত্তলিকা দাহ করেন। আনন্দের কথা, এই কুশ পুত্তলিকা দাহ কার্য্যে আত্মমর্য্যাদা সম্পন্ন বহু সি. পি. এম., নেতা অংশগ্রহণ করেছিলেন। কিন্তু কোথায় এবং কবে এম. এল. এ. সুধাংশু মাঝির শ্রাদ্ধাদি কার্য্য সম্পন্ন হয়েছে—সে খবর আমাদের জানা নেই। প্রয়াত জাগরণ সরেন দোলদৌড়িয়ার নারী ধর্ষনের বিরুদ্ধে শুরু থেকে শেষ অবধি প্রধান ভূমিকায় ছিলেন। এইজন্যেই কি তাঁকে প্রকাশ্য দিবালোকে মৃত্যুদণ্ড দেওয়া হল?

জনসাধারণের কাছে আমাদের বিনীত অনুরোধ, সি পি. এম.-দের অপপ্রচারে আপনারা বিভ্রান্ত হবেন না। সত্য চিরকাল ঢাকা থাকে না। যারা সত্যের অপলাপ করে, তাদের চিনে রাখুন।

অভিনন্দন সহ—
অনঙ্গ মোহন পতি
সম্পাদক
মানবাজার ২নং যুব কংগ্রেস (ই)
কমিটি—১৭।৭।৮৪

বুড়িবাঁধ অঞ্চল কং (ই) সভাপতি কর্তৃক প্রকাশিত ও বাণী প্রেস হাওড়া হইতে মুদ্রিত।

ডীন দঞ বাং কানা

এ মান-বারহা, তুং-ছন্নানি, ধাড় দাম পাড়া, সাঁত-শিকার বাবাতেকোঞ লাইয়াপে কানা—ইঞদ বাবাঞ 'ডীন' লেনা। আতোরেন বাবা তেকোকো নায়াত হতেচ্‌তে আঁপিলকো আড়াঃ-আঁদিঞ তাহেঁয়া। আর বাংখান হুতকাম ····

হেঁ, অনাগেঞ লাইয়েদা ফেডখন। আলে আতোরেন ঈশাম সরেন এঞ্‌তুমানিচ্‌ বাবা হড়রেন হপন বিশ্বনাথ দ হানা ঝেট বোগাখনে রুআঃ আ। অঝা আর ডাক্তারঃ রানতে নাশেই বায় ফারয়াঃ কানা—চাওলে জাং আর ইসিং আর উসুল পিণ্ডী সেচ্‌-এ ডাহরাও কেং কোআ। এন্তেং আবোআঃ দ এনাং খনগে অনকা হেনাঃআ। মান দিশমরেগে ঝুরবাদ লিলু সাথা, উনি দ ডীন মেস্তের লাই সদর কেদেয়া লিতাই সরেন আর মুদী খান দয় আতাজ কেদা ২০০ টাকা। সমাজ রেয়াঃ আরি লেকাতে লিতাই বাবা দ ফুরান টাকা এম কাতেয় বেরেৎ এনা আর রুআঃ ইচ্‌-আঃ অড়াঃদ ভেড়া, সুকরি, সিম, পুশি, কাকড়া, সসরচ্‌ এমান পাহিড় পাশা আতেয় উলয়াউ কাং তারা। আদ দেওয়ানিয় লাগিৎ মাঝিবাবা ঠেনে রাঃ রড় কেৎখান মাঝি বাবা দয় হেঁ রেবেনেনা। মাঝি বাবা রেন হড় আর পড়শ রেন হড় আতে লিতাই বাবা দ বাঁকুড়া জিলা রেয়াং ছোটগড়া আতোরেন সখা ঠেনে দেওয়ানি কেদা। উনি সখাদ ৫২৫ টাকা মুদায় হাতাও কেদা আর ইঞঠেনে ডাং চাউরাঃ কাদা—সখায় বাছাও কিদিঞা, ইঞদঞ ডীনেনা। চেৎ ইঞ চেকায়া? ইঞ পাহচা মিৎ বার হড়িঞ তেঁগোকেৎকোতে মচাঞ লাগেরা বাড়াকাৎ তাকোআ। আর, বাসিয়াম এমান মাঞ এমকেৎগে ফুরান ই ১৫৬০ টাকা এমকাতেঞ বেরেৎ এন। চেদাঃ হালে বাং, আতোরে তাহেঁন দ হোয়োঃনো তিঞা সে! ইঞই অড়াঃ উলয়াউ দ লাগাও কিদিঞ গেয়া, তবে রুআঃইচ আঃ দ বাং লিতাই বাবাআঃ। ইঞাঃ দ আঁপিল রেয়াঃ কাথা। ইঞ্জিঞ ড্‌বয়াউ লেকো খানগো তেংমার ধাও সখা দুআর সেনঃ হোয়োঃ কানা। হিদিচ্‌ তাহেঁকানা মাঝিবাবা আঁপিলে আড়াঃ আঞা সে বাং? তবে মাঝিবাবা দয় দায়োয়েনা আর আঁপিল লাগিৎ এ আড়াঃ আঁদিঞা। আঁপিল হোয়েনা হুগলি জিলা ধনিয়া খালিরেন হরিদাস কিসকু আনিচ্‌ সখা ঠেন। উনিদ অলকাতেয় এমাদিঞা বাংমা, ইঞাঃ দোষ দ বানুঃআ—ইঞদ ডীন দঞ বাং কানা। মুদাই উনিয়াৎ দ বাং চেরা, ২১৫ টাকা যতকোতে ৪০০০ পোন হাজার গান লেকা টীকা খরচেন তিঞরেঙ্গ আঁড়ি রাওয়ালগেঞ আটকারেদা নোআ দিশা কাতে বাংমা, ইঞদ ডীন দঞ বাংকানা। মা তবে আদ ডীন দ আলগেপে মেন বাড়াআঞা। নিয়াগে জহার—

ইঞদ

উপেন্দ্রনাথ সরেন, আতো

২১ ভাদর, ১৩৯২ সাল গোপালপুর, মানদিশম জিলা—পুরুলিয়া।

সহদেব সরেন হতেতে উছান আকানা প্রসার প্রণবানন্দ প্রেস খাতড়ারে ছাপা আকানা

সারিধরম্ হিরলা

মহল গিরা

ডুপুডুপ্ ঠাঁওঃ—বড়দহি আতো পুছিম নাখা
কুলজী মুচাৎ উল বাগওয়ান।
নেঁড়া মাহাঃ—৮ই চৈত্র বৃহস্পতিবার ১৩৯০ সাল। অক্ত-সেতাঃ আট বাজাঃ।

মানতান দিশম বাবাতেকো,

বড়দহি আতু সাঝি বাবারেন হপন শ্রীলড়িরাম টুডু কওয়া হাসো জালাতে সানাম লেকান রান রেহেৎ তেঁই বায় বেশ রেনতে সমাজ রেয়াঃ আরি চালি লেকা তেয় সখা অড়াও লেদা। চালাও এন্ ২২শা ফাল্গুন হিলোঃ। উনরে শ্রীললিন টুডু দোষী ক গটা কেদেয়া। ললিন টুডু দ সমাজ রেয়াঃ আরিচালী লেকাতে সানামে এম কেদা। অমা তায়নম্ ষোলআনা বাবা তেকো রেন দেওয়ানী লাগিৎ দিন এ হাতাও কেদা। দেওয়ানী রে শ্রীসুধীর টুডু দোষী গটারেনায়। উনরে সুধীর টুডু আর আচ্ রেন আপুষ শ্রীশীতল হেমব্রম কালাপতি উনকিন দ সান্তাড় সমাজ রে বঙ্গা-বুরু, ডান-ভূত আর জান-সখা বাস্থঃ কওয়া মেনতে পুলিশ ঠেন কিন কেশ্ আকাদা। বারয়া আসামী ক ইদি আকাৎ কিনা। আর ইঁ সার লাগিৎ ক কুরুমুটুয়েদা।

দে আদ মহল রেন সানাম বাবা তেকো নআ রেয়াঃ ফেডাৎ বড়দহি মাঝি বাবা বোন কুলিয়েরা। নেডা মাহারে সানাম কো অক্ত নাপিত সেটেরঃ লাগিৎ আশ কায়তে মেহর তাঁহেয়ে না।

নেঃ হরিচ্,
শ্রীঠাকুর দাস বেশরা
আতো-বড়দহি
(মানদিশম)

বাডায়তেনা: কামি দ মহুল রেয়াঃ আর জম এঃ দ আপান আপিন ন পুরুলিয়া-জামতোড়িয়া বাসতে জামতোড়িয়া খন পূরব নাখারে পে মাইল। খাতড়া ঝিলিমিলি বাসতে কালাপতি মোড় খন উত্তর নাখা পুন মাইল।

ছাপা সদর কিন শ্রীঅবিনাশ চন্দ্র সরেন আর শ্রীজহরলাল সরেন। বান্ধব প্রেস খাতড়া হইতে মুদ্রিত।

।। মিতুন মারাং সাঁওতা মিতুন ।।

ঠাঁও—রাইপুর সিতুকাতু মোর। অক্তসিএ-৩ বাজা।

মানতানক,

দিশম রেন আয়ো বাবা আর দাই দাদা তেক সাঁওতে বয়হা মিশিক। সানাম হড় গেবন পাঁতিয়ৗ ও হিজু কানা যে, আবওয়া সাঁওতা রে ডাঁন মেনাঃ কওয়া। উনকো ডাঁন তেগে মানমী ক জম কওয়া মেস্তে জান কওয়া সুমুম সাকাম রে ডাঁন ক সাব আবনা। উনকো ডাঁন দ বড বেধা ও কাতেৎ বন আতাব গজ আকাৎ কওয়া। নেতার ই এেল কানা ডাঁন মেন কাতেৎ বন কুটাম এৎ কওয়া সো পে-পোঁন হাজার টাকা বন ডাড়ম এৎ কওয়া. আর বাংকু এম দাড়ে আঃ থান মিৎ ঠাঁংগুয়ীঃ কাতেৎ বন দহ এৎ কওয়া। ডাঁন হড চেতানরে আয়মা লেকান নাহাচার বন একেএদা। আঁধা পাঁতিয়াও তে ডাঁন আকান হড়দ বিচকে জালা আতো দিশম বাগি কাতেৎ জিওঈ বাঞ্চাও লাগিৎ ক্রির হোয় আকান তাকওয়া নামাল দিশম। ভারত ফুরগাঁল তায়ম সান্তাড় হপন তালারে নাসে নাঃ অল পাড়হাও দবন সেঁড়া আকাদ গেয়া ডাঁন দ অকয়? নাহা যুগ রেহঁ আবওয়া সাঁওতা চেতান রে জান কওয়া কাথাতে আবদ হেঁদে ব্রিটিশ বন সাজাও আকান। কমিটি পাহাটা থনলে মেন এদা ডাঁন আর বঙ্গা দ হড় বাং ক জম কওয়া। জান অঝা আঃ কাথা সারি মেস্তে পাঁতিয়াও মেনা তাবন থান এস্তে থান চেতানরে অল আকান নেওা মাহারে জান অঝা সাঁওতে কাতেৎ দমেল দমেলপে সেটেরঃ তাবনা।

নেহঁর তেনক—

হাঁড়ি পাউরাঁদ আড়ি বাড়িচ।
তিরি ডুবি বাপাগ দ বাংভালেয়া
এেল এে পেল সার সাগুন অড়াঃ
রাপুৎ; চিঠি কোলদ বাড়িচ গেয়া।
ডাঃ গিরি কুঠামদ আড়ি বাড়িচ আঃ।

সাঁওতা সুসাঁর সাঁওতে ডাঁন চাবা গাঁওতা
বাঁকুড়া জেলা কমিটি তরবখন—
শ্রীচুনারাম সরেন (জেলা সভাপতি)
শ্রীমঙ্গল হাঁসদা (জেলা সম্পাদক)

বিঃ দ্রঃ আপনারা অনেকেই জানেন সাঁওতাল সমাজে ডাইনী বলে এক ভয়ংকর অন্ধবিশ্বাস আছে। ঐ অন্ধবিশ্বাসকে কেন্দ্র করে যুগ যুগ ধরে ডাইনী জলন্ত আগুনে পুড়িয়ে মারা হচ্ছে। ঐ বিশ্বাস বর্তমানে দেখা যায় জান ও ওঝাদের কাছে তেলখড়ি দেখিয়ে নিরীহ ব্যক্তিকে ডাইনী বলে সাব্যস্ত করছে। ডাইনী ব্যক্তিকে জবরদস্তী পূর্বক মারধর করা হচ্ছে এবং হত্যা করা হচ্ছে। হিন্দুদের মধ্যে যাহারা ডাইনী বিশ্বাস করেন তথাপি উক্ত মিটিং স্থানে জান ও ওঝাকে সঙ্গে নিয়ে আপনারা দলে দলে যোগ দিন।

বাস যোগাযোগ—রাইপুর-বাঁকুড়া, রাইপুর-মেদিনীপুর, রাইপুর-ঝাড়গ্রাম, রাইপুর-ঝিলিমিলি, রায়পুর পুরুলিয়া।

বিঃ দ্রঃ ঞিদাদ যাত্রা উদুগঃ আ পুথি এ তুমুদ—

'জানগুরু ডান বঙ্গা'

অঃ অলিচ মান চুনারাম সরেন।

গ্রাম-গুনিয়াদা, পোঃ-তপ্তদামদি, জেলা-বাঁকুড়া

শ্রীলক্ষীকান্ত মাণ্ডি কর্তৃক প্রকাশিত।

ডাইনী শিকার আজও অবাধে চলছে

আদিবাসীরা অনগ্রসর বিধায় সার্বিক উন্নয়নকল্পে এদের জন্য বিশেষ ব্যবস্থা গ্রহণ সংবিধানেও স্বীকৃতি পেয়ে আসছে। পশ্চিমবঙ্গের অধিবাসী আদিবাসীদের মধ্যে সাঁওতালেরাই সংখ্যাগরিষ্ঠ। কিন্তু যে সমস্ত সামাজিক কুপ্রথা এদের উন্নয়নের পথে বাধাস্বরূপ হয়ে আছে, বরঞ্চ পিছনে টানছে, তন্মধ্যে ডাইনীপ্রথা ১লা নম্বরে স্থান পাবার যোগ্য।

কবে ও কিভাবে সাঁওতালদের মধ্যে ডাইনী প্রথার জন্ম হয়েছিল, তার কোন লিখিত কিংবা অলিখিত প্রমান নেই। যাই হোক স্মরণাতীত কাল থেকে এই প্রথা সাঁওতাল সমাজকে অক্টোপাশের মত আষ্টেপৃষ্ঠে বেঁধে অবাধে রক্ত শোষণ করে চলেছে। এর কুফল হিসাবে সাঁওতাল সমাজ দুর্বল থেকে দুর্বলতর হচ্ছে। বস্তুত ডাইনীপ্রথার মত মানবিকতা বিরোধী, সর্বনাশকারী ও নৃশংস প্রথা সাঁওতালদের মধ্যে আর দ্বিতীয় নেই। এটা অতীতের সতীদাহ প্রথার সঙ্গে তুলনীয়। প্রতি বৎসর এই প্রথার শিকার হয়ে কত নিষ্পাপ, নিরাপরাধ ও নিরীহ ব্যক্তির যে জীবনহানি ঘটছে, কত অসহায় পরিবারকে যে নিঃস্ব ও উদ্বাস্তু হতে হচ্ছে, তার ইয়ত্তা নেই। ভণ্ড জ্ঞানগুরুদের কথায় বিশ্বাস করে কত যে অপরাধ অন্যায়, ও অবিচার সংঘটিত হচ্ছে, তা বলে শেষ করা যায় না। এর কোন বৈজ্ঞানিক ভিত্তি তো নাই-ই, পরোক্ষ কিংবা প্রত্যক্ষভাবে কোন উপকার পাবার প্রশ্নও নেই। এর মূল সমাজের এত ভিতরে প্রবেশ করেছে যে, এক্ষুনি এর অবসান ঘটান সাধারণের ক্ষমতার অতীত। স্বাধীনতাপ্রাপ্তির দীর্ঘদিন পরেও ভারতের মত কল্যান রাষ্ট্রে এধরণের কুপ্রথার অস্তিত্ব বিস্ময়জনক। এই কুপ্রথা উচ্ছেদকল্পে সরকার যদি আইন প্রণয়ন করেন, অন্তত ভণ্ড জ্ঞানগুরুদের বে-আইনি বলে ঘোষণা করেন, তা হলেই এই ক্ষতিকারক প্রথার উচ্ছেদ সাধিত হতে পারে। আমরা এবিষয়ে রাজ্য সরকার ও কেন্দ্রীয় সরকারের সহানুভূতি কামনা করছি এবং আশু ডাইনীপ্রথা বিরোধী আইন প্রণয়নের জন্য অনুরোধ জানাচ্ছি।

সারদাপ্রসাদ কিসকু সভাপতি, সাঁওতালী সাহিত্যপরিষদ, পুরুলিয়া, **মহাদেব হাঁসদা, কলেন্দ্রনাথ মাণ্ডি, গুরুদাস মুর্মু ও বালিশ্বর সরেন** পুরুলিয়া।

পরিশিষ্ট—৬

[ডাইনী বিরোধী আন্দোলনের নেতা জাগরণ সরেন ২০মে ১৯৮৪ খুন হবার পর কলকাতার কলেজস্ট্রীট কফি হাউসের ওপরে র‍্যাডিক্যাল হিউম্যানিস্ট হলে সাংবাদিক নিরঞ্জন হালদার একটি আলোচনা সভার আয়োজন করেন। এর ঠিক দুবছর পর আন্দোলন যখন আরও তীব্র আকার ধারন করে, ডাইনী বিরোধী আন্দোলনকারীরা যখন ক্রমশ ডাইনী মতবাদের পক্ষের লোকের দ্বারা আক্রান্ত হচ্ছেন, প্রাণনাশের আশংকা দেখা দিয়েছে, ঠিক সেই সময় বেঙ্গল সোশ্যাল সার্ভিস লীগের সঙ্গে যোগাযোগ করে আরও একটি বড় সভার আয়োজন করেন। আই-পি-এস অফিসার অসিতবরণ চৌধুরী, গুরুচরণ মুর্মু, নিরঞ্জন হালদার প্রমুখ ডাইনী প্রথা সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করেন। নিচে সেই দুই সভার আমন্ত্রণলিপির নমুনা দেওয়া হল]।

আদিবাসী সমাজের ডাইনী-সমস্যা নিয়ে আলোচনা সভা—

গত কয়েক মাস যাবৎ ডাইনী—বিচারকে কেন্দ্র করে একদল লোক দক্ষিণ পুরুলিয়ার আদিবাসী কবি, লেখক ও বুদ্ধিজীবীদের বিরুদ্ধে জনতাকে উত্তেজিত করে ওই কবি, লেখক ও বুদ্ধিজীবীদের খুন করার চেষ্টা চালাচ্ছে। ইতিমধ্যে পুরুলিয়া জেলা সুসার গাঁওতার সম্পাদক অধুনালুপ্ত 'সুসার ডহার' পত্রিকার সম্পাদক কবি, সমাজসেবী ও শিক্ষক জাগরণ সরেন ২০মে জামতোড়িয়ার নিকটে দিনের বেলায় খুন হন। তার আগে ও পরে সাঁওতাল সমাজে সবচেয়ে সম্মানিত কবি এবং আদর্শ শিক্ষক হিসাবে রাষ্ট্রপতি পুরস্কারপ্রাপ্ত শ্রীসারদা প্রসাদ কিস্কুকে বার বার খুন করার চেষ্টা হয়। আক্রান্ত হন অন্যান্য কবি লেখকরাও।

সাঁওতাল সমাজে শিক্ষিতের সংখ্যা খুবই কম, (লেখক বুদ্ধিজীবীদের সংখ্যা আরও কম। এই স্বল্প সংখাক লেখক-বুদ্ধিজীবীদের খুনের) ষড়যন্ত্র চলছে।

এই মারাত্মক পরিস্থিতির প্রতি সরকার ও আদিবাসী সমাজের দৃষ্টি আকর্ষণের জন্য কলকাতায় কলেজ স্ট্রীটে কফি হাউসের তিন তলায় (১৫ বঙ্কিম চ্যাটার্জী স্ট্রীট) র‍্যাডিক্যাল হিউম্যানিস্ট হলে আগামী ১০ আগষ্ট বিকেল সাড়ে ৫টায় এক আলোচনা সভা ডাকা হয়েছে। সম্প্রতি পুরুলিয়া ঘুরে আসা জি, ভি বিক্রমণ নায়ার (আনন্দ বাজার) লক্ষ্মীন্দ্রকুমার সরকার (আজকাল) নাজেস আফরোজ (আজকাল) প্রমুখ সাংবাদিকেরা তাদের অভিজ্ঞতা ও মতামত ব্যক্ত করবেন।

আপনাদের সকলের উপস্থিতি প্রার্থনীয়